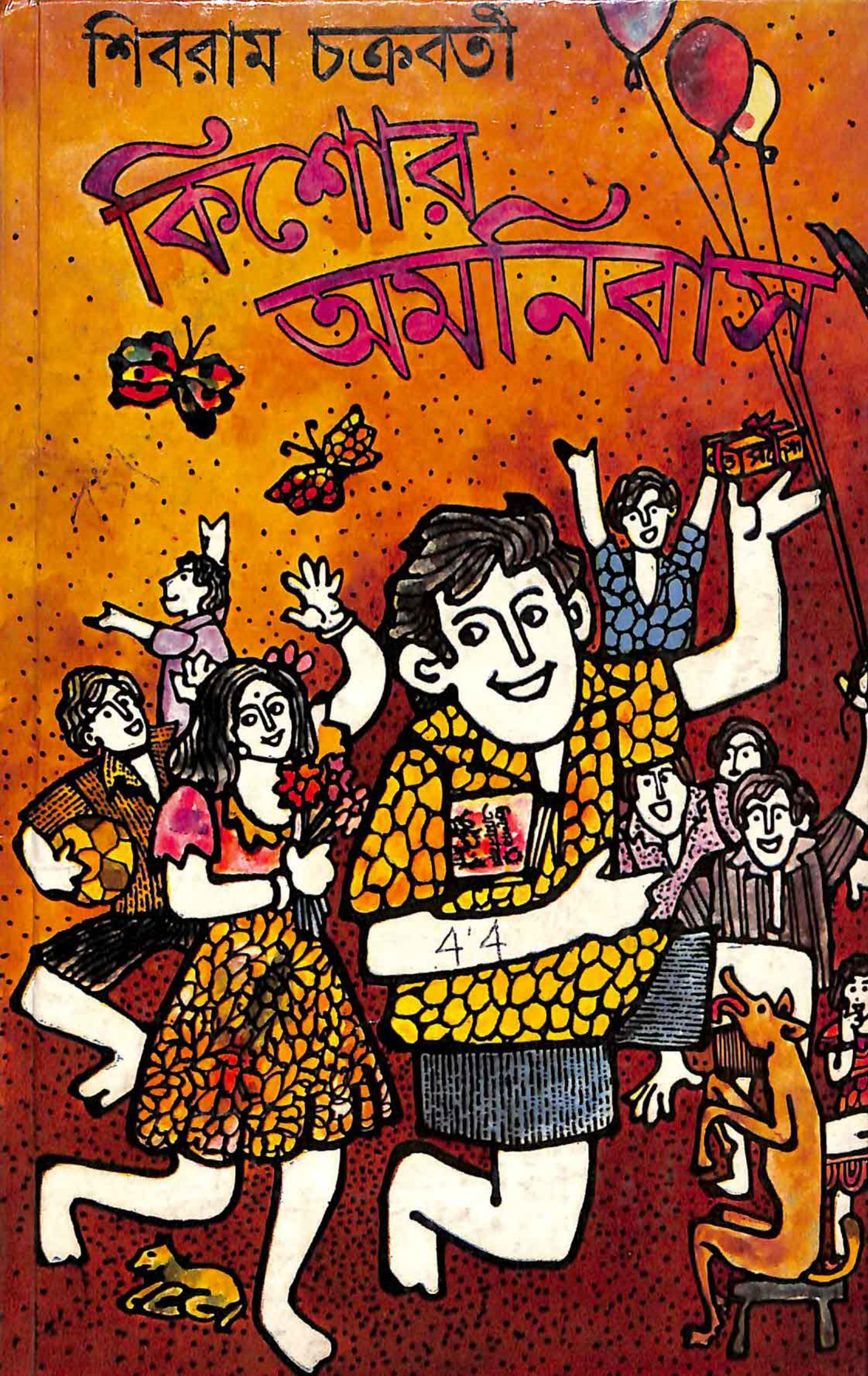
শিবরাম চক্রবর্তী

কিশোর অমনিবাস



কিশোর অমনিবাস

শিবরাম চক্রবর্তী

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৮৭
নভেম্বর ১৯৮০
দ্বিতীয় মুদ্রণ
পৌষ ১৩৯০
ডিসেম্বর ১৯৮৩
তৃতীয় মুদ্রণ
আষাঢ় ১৩৯৫
জুলাই ১৯৮৮
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়
মুদ্রাকর
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

কুড়ি টাকা

কুমারী বিদিশা দত্ত

উপন্যাস

বাড়ি থেকে পালিয়ে	...	৩
কলকাতার হালচাল	...	৬৭

গল্প

শিব্রাম THE ভূপর্যটক	...	১২৯
গোঁফ নিয়ে টানাটানি	...	১৩৫
শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী	...	১৪২
পিয়ানো কেনার ফ্যাসাদ !	...	১৪৯
ধারেও কাটে, ভারেও কাটে !	...	১৫৭

নাটক

বাজার করার হাজার ঠেলা	...	১৬৪
বেতন-নিবারক বিছানা	...	১৭৩

উ প ন্যা স

বাড়ি থেকে পালিয়ে

* *

বিনোদের সঙ্গে কাঞ্চনের কিছুতেই বনত না। বিনোদ তাদের পুরুতের ছেলে, তাদের ঠাকুর শালগ্রামের পুজো সে-ই করে। বোধ করি দেবতার ভোগের ভাগ নিয়েই তাদের বিরোধের সূত্রপাত হবে।

কাঞ্চনের বয়স তেরো-চোদ্দর বেশি নয়, কিন্তু সেই বয়সেই তার মত দুষ্টু—দুর্দান্ত ছেলে পাড়ায় দুটি ছিল না। তার মুহুর্মুহুঃ খিদেও পেত যেমন, তেমনি সেই খিদেকে কাজে লাগাবার উদ্ভাবনী শক্তিও ছিল তার অসাধারণ। ঘরের যা কিছু খাবার বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সে তো আত্মসাৎ করতই, ঠাকুর এবং বিনোদের অংশেও ভাগ বসাতে ছাড়ত না। পুজোর আগে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে যখন তাঁর রাজভোগ থেকে রাজকর সহজেই গ্রহণ করত, তখন পাথরের দেবতা প্রতিবাদ বা সমালোচনা করতেন না বটে, কিন্তু পুজোর শেষে নিজের অংশ থেকে কিছু ছাড়তে রক্ত-মাংসের মানুষ বিনোদের অত্যন্তই আপত্তি ছিল।

সেদিন স্নান করতে গিয়ে কাঞ্চন এর শোধ নিলে। বিনোদকে সাঁতার কাটতে মাঝ-পুকুরে নিয়ে গিয়ে জলের ভেতরে তার মাথা চেপে ধরল। সাঁতার ভাল জানলেও এবং বয়সে কাঞ্চনের চেয়ে কিছু বড় হলেও বিনোদ গায়ের জোরে তাকে আঁটতে পারত না। খানিকক্ষণেই হাঁপিয়ে, একপেট জল খেয়ে বিনোদ যায় আর কি! তখন কাঞ্চন তাকে ছেড়ে দিয়ে বললে—"কেমন জব্দ! আর আমার সঙ্গে লাগবি?"

বিনোদের রাগ ততক্ষণে মাথায় চড়েছে। যতক্ষণ না এক-কোমর জলে এল, ততক্ষণ সে একটিও কথাও বলল না; কিন্তু তীরে পৌঁছেই তার তৈল-জীর্ণ ময়লা পৈতেখানি ছিঁড়ে কাঞ্চনকে এই বলে শাপ দিল যে, ব্রহ্মণ্যদেব যদি সত্যি হন, তবে ককখনো তার বিদ্যে হবে না। ফি-বছরই সে পরীক্ষায় ফেল করবে।

এই সুকঠিন অভিশাপে কাঞ্চনের মুখ এতটুকু হয়ে গেল; ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা সে ভাবে নি, তবুও জোর করে বলল—"তোর শাপে আমার কচু হবে।"

এতে বিনোদ কেঁদে ফেললে—"দে, আমার পৈতে খুঁজে দে!"

"এখন কান্না হচ্ছে! ছিঁড়তে গেলি কেন? আমি যাব খুঁজতে—ভা-রি দায় আমার!"

অনেক খোঁজাখুঁজির পর জলের তলা থেকে উদ্ধার করে বিনোদ গিঁট দিয়ে পৈতে পরল।

"ছিঁড়ে গিঁট দিতে গেলি যে বড়? ভা-রি ব্রহ্মণ্যদেব!"

"বা, আমি পৈতে না পরে যাই, আর বাবা আমাকে ধরে ঠ্যাঙান! তুমি তো ঐ চাও!"

সেইদিনই।

কাঞ্চনের বাড়ি পুজো সেরে আমবাগানের পথে বিনোদ ফিরছে, কাঞ্চন তাকে ধরল—"দাঁড়াও!" একহাতে ক্ষীরের বাটি, অন্যহাতে দইয়ের ভাঁড় নিয়ে ভীতনেত্রে বিনোদ বলল—"কী আবার?"

কাঞ্চন এতক্ষণ তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, বলল—"তোমার শাপ কাটান দাও!"

বিনোদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল—"দ্যাখ্ কাঞ্চন, শাপ আর কাটান যায় না। ব্রহ্মবাক্য—যা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, তা রদ করা ব্রহ্মারও সাধ্যি নয়!"

"হ্যাঁ, নয় আবার! আমি এত পড়ে-শুনে ফি-বছর ফেল হতে থাকব, আর তুমি ফাঁকতালে পাশ করে মজা লুটবে, সে হচ্ছে না! বল আগে—"

"সে হবার নয় কাঞ্চন, আমি ভেবে দেখলাম। শাপ উল্টে গেছে—শাস্ত্রে এমন কোথাও লেখে নি। তাহলে পরীক্ষিৎ—"

"রেখে দাও তোমার পরীক্ষিৎ! শাপ যদি না কাটান দাও, তবে ঐ ক্ষীরের বাটি, আর দইয়ের ভাঁড় দিয়ে যাও!"

বিনোদ এবার গুরুতর সমস্যায় পড়ল। এদিকে শাস্ত্রের নজির, অন্যদিকে ক্ষীরের বাটি। এই উভয়-সঙ্কটে সে মাথা খাটিয়ে বলল—"শাপ তো কাটান যায় না রে! তবে এই বলছি, বিদ্যে তোর না হোক, বুদ্ধি তোর খুব হবে। তাতেই তোর পুষিয়ে যাবে। বুঝলি কাঞ্চন! বামুনের বর, তাও মিথ্যে হবার নয়।"

বিদ্যা ও বুদ্ধির তারতম্য কাঞ্চনের কাছে স্পষ্ট ছিল না। সে এক ঝট্‌কায় দইয়ের ভাঁড় টেনে নিয়ে সমস্ত দই বিনোদের মাথায় ঢেলে দিল ; অবশেষে ক্ষীরের বাটিটা কেড়ে নিয়ে এক আমগাছের ডালে উঠে বসল। বিনোদের দিকে আর দৃষ্টিপাত না করে পা দোলাতে দোলাতে যে আপাত-মধুর বস্তুটি তার হস্তগত হয়েছিল, সেই বিষয়ে একান্ত মনঃসংযোগ করল।

২

বিনোদ কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। খানিক পরেই বাড়ির চাকর কাঞ্চনের খোঁজে দেখা দিল—"ছোটবাবু, বাবা তোমায় ডাকছেন।"

চাপা-গলায় কাঞ্চন জিগ্যেস করল—"কেন রে?"

"বিনোদ ঠাকুর—"

"কী বলেছে সে, শুনি ?"

"তুমি নাকি পূজোর আগে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠাকুরের ভোগ খেয়ে রাখ, তারপরে একদিন নাকি বিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে ঠাকুর-পূজো করতে দাও নি—"

"এই সব বলেছে ! পাজী কোথাকার ! আচ্ছা, দেখব তাকে আমি—"

"আবার আজ নাকি তুমি তার পৈতে ছিঁড়ে দিয়েছ ! মাথায় দই ঢেলে—".

"মিথ্যে কথা ! আমি পৈতে ছিঁড়েছি ! বলুক দিকি সে ? ওর ওই ঠাকুরের মাথায় হাত দিয়ে বলুক ? ও-ই তো আমাকে শাপ দিলে ! আর দই ঢেলেছি ? বেশ করেছি, কাল ঘোল ঢালব । দেখি কী করে ও !"

"বাবু তোমাকে এক্ষুনি ডাকছেন ! মালখানা থেকে সেই রুপো-বাঁধানো চাবুকটাও বের করেছেন ।"

"বা রে ! সে তো আমার চাবুক ! আমার পিঠেই পড়বে নাকি ?"

"তা কী জানি বাবু ! এখন তো চল, তোমাকে নিয়ে যেতে পাঠালেন ।"

"দেখছিস না, আমি খাচ্ছি ! যা তুই, আমি যাব এখন ।—হ্যাঁ রে, মা কোথায় রে ?"

"মা কাঁদছেন । তোমাকে আদর দেন বলে বাবা তাঁকে খুব বকেছেন ।"

"যা যা, এখন যা ! বিরক্ত করিস নে । রাগ হয়ে গেলে এই বাটি তোর মাথায় ছুঁড়ে ভাঙব, তা বলে দিচ্ছি কিন্তু ।"

"আমি তো যাচ্ছি, মা-ঠাকরুন আমাকে চুপি-চুপি বলে দিলেন, কর্তাবাবু খেয়েদেয়ে ঘুমোবার আগে তুমি যেন বাড়ি ঢুকো না, বুঝলে ?"

"যা যা, তোকে আর দাঁত বের করে হাসতে হবে না ।"

চাকর হাসতে হাসতে চলে গেল । কাঞ্চন ভাবতে লাগল, এখন সে কী করে ? বিনোদ যে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তা কি সে কোনদিন ভেবেছিল ! যাই হোক, কাঞ্চন আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল যে, বিনোদ কেমন স্বার্থপর । সামান্য এক বাটি ক্ষীরের জন্যে—! নাঃ, আর কক্‌খনো সে অমন ছেলের সঙ্গে মিশবে না । কিন্তু এখন—এখন কী করা ?

গাছ থেকে নেমে আমবাগানের পাশ দিয়ে যে বাঁধা রাস্তাটা গেছে, তাই দিয়ে সে হাঁটতে শুরু করল—যেদিকে দু'চোখ যায় । কতক্ষণ সে চলেছে, কিন্তু পথ আর ফুরোয় না । অবশেষে যেখানে পথ শেষ হল, সেটা রেল স্টেশন ।

একটু বাদেই একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল । কাঞ্চন একটুক্ষণ কী ভাবলে, তারপর লোকজন কম এই রকম একটা কামরা বেছে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল ।

গাড়ি চলেছে । কোথায় যাচ্ছে, কিছুই সে জানে না । কয়েকটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল । কত লোক উঠল—নামল ; কিন্তু কেউ তাকে একটি প্রশ্নও করল না । অবশেষে

একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড়াতেই একটি ভদ্রলোক তাকে জিগ্যেস করলেন—"খোকা, নামবে না ?"

"এটা কী স্টেশন ?"

"বর্ধমান। এ-গাড়ি এখানেই দাঁড়াবে, আর যাবে না।"

অতএব তাকে নামতে হল। ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন—"কোথায় যাবে তুমি ?"

সে একটু ভেবে বলল—"কলকাতায় যাব।"

"কিন্তু এ গাড়ি তো সেখানে যাবে না। কলকাতার গাড়ি পরেই আসবে ওই ওধারের প্ল্যাটফর্মে। ওভার-ব্রীজ দিয়ে যাবে, লাইন ডিঙিয়ে যেও না যেন—বুঝলে ?" বলে ভদ্রলোক মোট-ঘাট নিয়ে বের হয়ে গেলেন।

"কই হে, তোমার টিকিট কই ?"

কাঞ্চন দমবার ছেলে নয়, সহজভাবে উত্তর দিল—"আমি কি আপনার গাড়িতে চেপেছি নাকি ? আমি তো বেড়াতে এসেছি।"

টিকিট-চেকার বললেন—"স্টেশন হাওয়া খাবার জায়গা নয়।" এই বলে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন ; কাঞ্চনও সেই ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল।

তখন বেলা দুটোর বেশি। তার ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে। সঙ্গে একটিও পয়সা নেই যে, মুড়ি কিনে খায়। কী করবে ভাবতে ভাবতে চলেছে। কিছু দূর যেতেই দ্যাখে, একটা নাদুস-নুদুস ছাগল তাকে গুঁতোতে তাড়া করে আসছে। সে কিছুটা হটে রাস্তা থেকে পাটকেল কুড়িয়ে তাক করে তাকে মারতে যাবে, এমন সময়ে সামনের চালাঘর থেকে একটি ততোধিক মোটা মেয়েমানুষ শশব্যস্তে বের হয়ে আর্তকণ্ঠে বললে—"আহা, মের নি বাবা, মের নি ! বাছা আমার মরে যাবেক।"

"মারছি না ; কিন্তু বাছাকে সামলাও।"

ছাগলকে নিয়ে যেতেই তার নজর পড়ল সেই ঘরটির দোরের ওপর। একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে, তাতে বিচিত্র ছাঁদে ও বানানে লেখা—

পবীত্র হীন্দু-হোটেল—হীন্দু ভদ্রলোকদিগের
আহারের স্থান

সে স্ত্রীলোকটিকে বললে,—"এখনো কি তোমার হোটেলে খাবার-টাবার আছে ?"

"খুব আছে, খাবে তুমি ?"

"নিশ্চয়।"

কাঞ্চন খাওয়া-দাওয়া সেরে বলল—"কত দাম দিতে হবে ?"

"এমন আর কী খাইছ, যা খুশি দাও।"

"তোমরা নাও কত ?"

"চোদ্দ পইসা।"

"আমি তো তার অর্ধেকও খেতে পারি নি—অর্ধেক দেব।"

"তাই দাও।"

মশলা নিয়ে গম্ভীরভাবে চিবুতে চিবুতে কাঞ্চন বলল—"তোমার যা রান্না, আর আমি যা খেয়েছি, তাতে তোমাকে এক পয়সাও দেওয়া উচিত নয়। আমি কিচ্ছু দেব না।"

হোটেলওয়ালী হেসে বলল—"আচ্ছা না দিবেক, তো নাই দিবেক।"

মোটা ছাগলটি এসে এবার আদর করে তার হাত চেটে দিল, বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল—"দূর ছাই! ভাল আপদ দেখছি!" তার পরে হাতটা ছাগলেরই লোমশ গায়ে মুছে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

স্টেশনে ফিরে দেখল, একটা গাড়ি ওধারের প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ছে। সে তৎক্ষণাৎ গিয়ে তাতে উঠে বসল। পাশের ভদ্রলোককে জিগ্যেস করল—"মশাই, এ-গাড়ি যাবে কোথায়?"

তিনি একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন—"কেন, কলকাতায়।"

কলকাতা তখন আর কয়েকটা স্টেশন পরেই। পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বেশ আলাপ জমে উঠেছিল। কলকাতা কেমন জায়গা! সেখানে সে এই প্রথম যাচ্ছে কিনা! হ্যাঁ, মামার বাড়িই। মামা তাকে নিতে স্টেশনে আসবেন; কিন্তু যদি দৈবাৎ স্টেশনে না আসতে পারেন? তা, তাতে কী হয়েছে, ভদ্রলোক না হয় তাকে মামার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবেন।—এই রকম নানান কথাবার্তা। ভদ্রলোকের মুখে শুনে শুনে কল্পনায় সে কলকাতার ছবি আঁকছিল। কলকাতায় দিন রাত নাকি এক সমান, রাত্রে চাঁদের আলো পথে পড়তে পায় না। এত আলো রাস্তায়! সব ইলেকট্রিক! রূপকথার রাজপুরীর মত বড়-বড় বাড়ি! আর কত লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, সেপাইশান্ত্রী—কত কী!

আর দশ মিনিট পরেই তার কত স্বপ্নের—কত সাধের কলকাতা!

কিন্তু একটা ভয় ছিল। সেটা প্রকাশ করে বলতেই ভদ্রলোকটি বললেন—"তাড়াতাড়িতে টিকিট করতে পার নি, তা আর কী হয়েছে? তুমি তো আর ইচ্ছে করে ঠকাচ্ছ না, আমি আগে বেরিয়ে গিয়ে একটা টিকিট কিনে এনে দেব, সেইটা দেখালেই তোমাকে ছেড়ে দেবে।"

হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ঢুকল। গোলমাল—হৈ চৈ—কুলি. চাই?—কত লোক! বিদ্যুতের আলোয় কাঞ্চন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ভদ্রলোকটি তার হাতে ওভারকোট দিয়ে বললেন—"এইটা ধর। আমি এক্ষুনি ফিরছি।"

তিনি চলে গেলেন। কাঞ্চন দেখলে—ওভারকোটের পকেটে সোনার ঘড়ি-চেন, কাগজ-পত্র, আরো কত কী!

দশ মিনিট পরে তিনি ফিরে এসে টিকিটটা কাঞ্চনের হাতে দিলেন। টিকিটখানা নেড়ে চেড়ে কাঞ্চন দেখলে, তাতে লেখা আছে—প্ল্যাটফর্ম টিকিট, চার পয়সা দাম। নিজের শূন্য পকেটে হাত পুরে দিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বললে—"দেখুন—আমার কাছে খুচরো পয়সা তো নেই—"

"আহা থাক! চার পয়সা আর দিতে হবে না। তোমার মামা কই? এসেছেন তিনি?"

"আসবেন নিশ্চয়। দেখি তাঁকে—"

"আমি চললুম, কেমন?"

ভদ্রলোক নিজের পথে চলে গেলেন। কাঞ্চন টিকিটখানা গেটে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন সন্ধ্যে। চারিধারে যেন সমারোহ লেগে রয়েছে। সে শুধু নিষ্পলক নেত্রে চারিদিকে চেয়ে রইল। এই স্বপ্নপুরী কলকাতা!

কাঞ্চন অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে স্টেশনের বিরাট কলেবর দেখল। কতগুলো প্ল্যাটফর্ম! একটাতে গাড়ি লাগে তো আরেকটাতে ছাড়ে। কত যাত্রী মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে—আসছে! টিকিট-ঘরই বা কত! ইউনিফর্ম-পরা একজন লোক, বোধহয় রেলের কর্মচারী, কাঞ্চন সাহস করে তাঁকে ডেকে জিগ্যেস করল—"মশায়, এখানে কটা স্টেশন?"

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে গেলেন—"কটা স্টেশন মানে?"

"এতগুলো বাড়ি কিনা, তাই জিগ্যেস করছি।"

"স্টেশন তো একটাই জানি।" বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

একটা স্টেশন—আর এতগুলো প্ল্যাটফর্ম! কাঞ্চন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এও একটা স্টেশন, তাদের গাঁয়ে—সেও একটা স্টেশন। কত তফাত! এই রকম একটা স্টেশন তাদের গাঁয়ে হয় না? সে যদি খুব—খুবই বড়লোক হয়, তাহলে এই রকম একটা স্টেশন সেখানে তৈরি করবে। এই রকম একটা স্টেশন করতে কত টাকা লাগে, কে জানে!

তারপর ধীরে ধীরে সে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল। কী করবে, কোথায় যাবে, কিছুই তার স্থির নেই। অনেক লোক যেদিকে চলেছে, তারও গন্তব্য যেন সেইদিকে।

বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সে বিচিত্র যানবাহনের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। কত রকমের গাড়ি, কত রঙের—কত ঢঙের! ঘোড়ার গাড়ি—ও আবার কী—মানুষ-টানা গাড়িও আছে আবার! এতগুলোর মধ্যে কেবল গোরুর গাড়িই যেন তার চেনা-চেনা মনে হল।

গাঁয়ের স্টেশন থেকে বাড়ি যেতে লোকে গোরুর গাড়ি ভাড়া করে, এখানে কই গোরুর গাড়িতে কেউ চাপছে না তো? গাড়িগুলোর ছপ্পরও নেই—যেন কী রকম!

পাশে একজন ঝাঁকামুটে দাঁড়িয়ে ছিল, কাঞ্চন তাকে জিগ্যেস করল—"ওই যে মানুষ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ও কোন্ গাড়ি হ্যায় ?"

"উও তো রিকশা হ্যায়। তুম্ কিরায়া করো গে ?"

"কেয়া বোলতা ?"

"ভাড়া লেওগে ?"

"নেহি নেহি। এই রকম জিজ্ঞাসা করতা হ্যায়। আর ওই যে সব গাড়ি, ঘোড়া নেই—আপ্‌সে আপ্‌সে চল্‌তা, ও তো মোটরগাড়ি হ্যায়, নেহি ?"

মুটে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—"হাওয়া-গাড়ি।"

"ঠিক ঠিক, উস্‌কা কথা হাম্ মার কাছে শুনেছি।"

কিন্তু মুটের সঙ্গে সদালাপ আর বেশিদূর অগ্রসর হল না। কেননা মুটেটা এর পর তার দিকে এমন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল যে, কাঞ্চনের তা মোটেই পছন্দ হল না। সে মুটেটাকে পরিত্যাগ করল।

জনতার পিছনে পিছনে অবশেষে সে হাওড়া-পুলের ওপর এসে উঠল। কোথা থেকে হু-হু করে বাতাস এসে চুলের ভেতর দিয়ে শোঁ শোঁ করে বইতে লাগল। কাঞ্চন আপনা-আপনি বলে উঠল—"আরে এ যে একটা নদী !"

তারই মত যে ছেলেটি পাশাপাশি যাচ্ছিল, সে বললে—"নদী কী খোকা! এ যে গঙ্গা, জান না ?"

গঙ্গা ? কাঞ্চনের মনে হল, এই সেই গঙ্গা, যার কথা সে মার কাছে গল্পে শুনেছে। তবু সে ঠকবার ছেলে নয়, পাল্টে প্রশ্ন করল—"গঙ্গা কি নদী নয় ? তুমি তো খুব জান ?"

তার বয়সী একটা ছেলে তাকে 'খোকা' বলে ডাকবে, এ তার বরদাস্ত হবার নয়। ভারি রাগ হল তার ছেলেটার ওপর। যদিও দু-একটা অত্যাবশ্যক প্রশ্ন করবার কাঞ্চনের অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ হচ্ছিল, কিন্তু এই রকম একটা অসভ্য ছেলেকে—? নাঃ, কিছুতেই না।

অত্যাবশ্যক প্রশ্নের একটা হচ্ছে এই যে, বইয়ে সে পড়েছে, এই পুলটা নাকি জলে ভাসছে। সত্যিই কি তাই ? যদি সত্যিই হয়, তাহলে কী করে সম্ভব ? আর যখন ভাসছে, তখন ডুবতেও তো পারে ? আর ডোবে যদি হঠাৎ, তখন এই লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া—এ সবের কী দশা হবে ?

কিন্তু অমন ছেলেকে জিগ্যেস করার চেয়ে—নাঃ, কাজ নেই। একটু যদি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে সে নিজেই পর্যবেক্ষন করে নেবে ; কিন্তু যা লোকের ঠেলা ? ক্রমশ কেবল এগুতেই হচ্ছে—অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

একটা স্টীমার এদিকে আসছিল। বাঁক ঘুরতেই তার ফোকাসের তীব্র আলোক এসে ব্রীজের গায়ে লাগল। কাঞ্চন বিস্মিত চোখে সেইদিকে তাকাতে তাকাতে সহসা আপন মনে বলে উঠল—"ওটা বোধহয় একটা জাহাজ!"

"জাহাজ কি খোকা, ও তো স্টীমার!"

আবার সেই ছেলেটি, আবার সেই 'খোকা'! কিন্তু কাঞ্চন এবার গুম হয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না।

ছেলেটি কাঞ্চনের হাত ধরে বললে—"জাহাজ দেখতে চাও? ওই দেখ—সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও সব বিলিতি জাহাজ—বিলেত থেকে আসে।"

ততক্ষণে ফোকাসের আলো সেই সব অতিকায় জাহাজগুলোর ওপর পড়েছে। কাঞ্চনের বিস্ময় আর ধরে না। এই সব জাহাজের কথা সে গল্পের বইয়ে পড়েছে। তাদের গাঁয়ের জমিদারের ছেলে এই রকম একটা জাহাজে চেপে বিলেত গেছে নাকি!

বিস্ময়ের আতিশয্যে ছেলেটার মুঠোর মধ্যে যে তার হাত আছে, তা সে ভুলেই গিয়েছিল, কিন্তু পুল পেরুতেই তার হুঁশ হল। এক ঝটকায় সে হাত ছাড়িয়ে নিল—"যাও, আমি জাহাজ দেখতে চাই না। ও আমি অনেক দেখেছি।"

"দেখেছ, কিন্তু চাপ নি তো? আমি একদিন লুকিয়ে চেপেছিলাম। খালাসিরা দেখতে পেয়ে নামিয়ে দিলে।"

কাঞ্চন গম্ভীরভাবে বলল—"চাপি নি, কিন্তু চাপব একদিন। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে ঘুরে বেড়াব বড় হয়ে।"

কাঞ্চনের কল্পনা যেন ছেলেটিকে স্পর্শ করল। তারও তো এমনি ইচ্ছা করে। সেও একদিন জাহাজে চেপে পৃথিবী ভ্রমণ করতে চায়—সেই 'আশিদিনে ভূ-প্রদক্ষিণ'-এর লোকটার মত। আজ যেমন এই পথে দেখা হয়েছে, তেমনি কোনদিন হয়ত কোন্ জাহাজে কি কোন্ বিদেশে ওদের আবার দেখা হবে।

ছেলেটি এবার কাঞ্চনকে ভাল করে দেখল, তারপরে জিগ্যেস করল—"তুমি কোথায় যাবে খোকা?"

"যাও, আমি তোমার সঙ্গে যাব না।" বলে রাগ করে কাঞ্চন অন্যদিকে ফিরে দাঁড়াল। ছেলেটি কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে একটু অপেক্ষা করে অবশেষে চলে গেল।

না, আর ছেলেটাকে ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় না। তখন কাঞ্চন আবার চলতে শুরু করল, কিন্তু ছেলেটা থাকলেই ভাল ছিল যেন। বেশ একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যেত।

যাকগে! ভারি অসভ্য কিন্তু! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জানে না আদপেই।

সে হল গিয়ে কাঞ্চন—তাদের পাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, সব ছেলেই তাকে সম্ভ্রম করে চলে, আর তাকেই বলে কিনা খোকা! খোকা তো যারা দুধ খায়, হামাগুড়ি দেয়। মণ্টু, ন্যাপলা—ওরা খোকা।

তবু তার কাছে কলকাতার হালচালটা জানা যেত। যাকগে, সে নিজেই দু'দিনে জেনে নেবে। সেই বা কম কিসে!

ও বাবা, এ কী! এ যে কেবলই দোকান! রাস্তার দু'ধারেই! ফলের, খাবারের, মনোহারি জিনিসের! কী রকম ইলেকট্রিক আলো দিয়েছে! এত দোকান—এত জিনিস-পত্র—এত সব কেনে কে!

কাঞ্চন অবাক হয়ে দোকান দেখতে দেখতে পথ চলল। কোন দোকানী হয়ত জিগ্যেস করল—"কী চাই খোকা?" সেখানে কাঞ্চন মুহূর্তমাত্রও দাঁড়াল না। কেউ যদি জিগ্যেস করল—"কী নেবে বাবু?" কাঞ্চন তাকে অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে নেবার যোগ্য কী কী জিনিস আছে একবার খতিয়ে দেখল, তারপর গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল—"বাঃ, বেশ দোকান তো তোমার!"

অধিকাংশ দোকানদার তাকে গ্রাহ্যই করল না। না করুক। এই রকম দু'একটা ভারি দোকান তাদের গাঁয়ে করতে হবে। বিশেষত ঐ মনোহারি দোকানটার মত।

হঠাৎ কাঞ্চন দেখে কি, ভিড়ের মধ্যে একজন গুণ্ডাগোছের লোক এক ভদ্রলোকের পকেট থেকে মানিব্যাগ তুলে নিচ্ছে। গুণ্ডাটা বিনা বাক্যব্যয়ে সরে পড়ছে দেখে কাঞ্চন ভদ্রলোককে গিয়ে বলল—"ও মশাই, ওই লোকটা আপনার পকেট থেকে কি নিয়ে পালাচ্ছে!"

"অ্যাঁ, তাই নাকি? তাই তো! ধর, ধর—চোর, চোর!"

ভদ্রলোকের আর্তনাদে চারিধার সচকিত হয়ে উঠল—লোকটাও ধরা পড়ল। তারপর মার যা খেল লোকটা! অবশেষে পাহারাওয়ালা এসে পড়ল; লোকটার কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে চলল। কাঞ্চনের ভারি মায়া হতে লাগল। সে-ই তো ধরিয়ে দিলে!

ভদ্রলোক বললেন—"আমার একশ টাকা ছিল ব্যাগে—দেখি!" তারপরে নোট ও টাকা গুনে এক গাল হেসে বললেন—"সব আছে, কিচ্ছু নিতে পারে নি।"

একজন বললে—"ওই ছেলেটির জন্যেই তো পেলেন। ওকে দিন কিছু!" আরো কয়েক-জন তার কথায় সায় দিল। ভদ্রলোক তখন গম্ভীর হয়ে বললেন—"আপনারা যখন বলছেন, তা দেওয়া উচিত বই কি।—এই ট্রাম, রোখো, রোখো—" বলে চলন্ত গাড়িতে তিনি উঠে পড়লেন। যে লোকটি অনুরোধ করেছিল, সে বললে—"বেশ লোক কিন্তু! না দিয়েই চলে গেল!" যে লোকটি সায় দিয়েছিল, সে শুধু বললে—"কলিকাল!" তারপর যে যার কাজে চলে গেল, কাঞ্চন আবার চলতে লাগল।

এক জায়গায় দেখে, নানারকম জিনিস স্তূপাকার, তার পাশে একটি প্যাকিং বাক্সে বসে তারই বয়সী একটি ছেলে বিচিত্র-সুরে ছড়া কাটছে—

"নীলামওয়ালা এক আনা,
জার্মানওয়ালা এক আনা !
সস্তাওয়ালা এক আনা !
সুবিস্তাওয়ালা এক আনা !
লে-যাও বাবু এক আনা।"

এই ছেলেটা এই সব এত জিনিসের মালিক নাকি ? কাঞ্চনের হিংসে হতে লাগল। আঃ, যদি কিছু পয়সা থাকত তার। সব রকম কিছু-কিছু কেনা যেত। এত সস্তায় এত রকমের জিনিস। তাদের গাঁয়ে হলে সবার তাক লেগে যেত।

মনে মনে এক আনার সিরিজের তারিফ করতে করতে কিছুদূর না এগুতেই দেখে, আরেকজন লোক হাত নেড়ে সুর করে হাঁকছে—

"ছুরি-কাঁচি দু পইসা। ঘড়ি-পেন্‌সিল দু পইসা।
তালা-চাবি দু পইসা। রক্কম্-রক্কম্ দু'পইসা।
সাবান-ফিতা দু পইসা ! লে-যাও বাবু, দু'পইসা !"

কাঞ্চন একেবারে তাজ্জব হয়ে গেল। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না—এমন সব চমৎকার জিনিস দু পয়সায় ! ওরই মধ্যে যেটা তার কাছে সবচেয়ে বহুমূল্য মনে হল, সেইটা দেখিয়ে পসারীকে জিগ্যেস করল—"ওর দাম কত ?"

"দু'পইসা। হরেক চীজ দু'পইসা !"

কাঞ্চন ভাবতে লাগল, বাড়ি থেকে পালাবার সময় যদি বুদ্ধি করে কিছু পয়সাও সঙ্গে আনত ! বাবা বলেন—'রাগের মাথায় কাজ করলে পরে পস্তাতে হয়।' কথাটা যে সত্যি, এতদিনে তা বোঝা গেল। রাগের মাথায় বাড়ি ছেড়েই তো সে পয়সা আনতে ভুলে গেছে। কত ভাল-ভাল জিনিস অত সস্তায় যাচ্ছে—এ কি আর বেশিক্ষণ পড়ে থাকবে ? কাল কি আর পাওয়া যাবে ? মণ্টুর জন্যে একটা বাঁশি, ন্যাপলার জন্যে একটা রবারের বল, আর নিজের একটা ফ্যান্সি হাতঘড়ি—অন্তত এগুলো থাকলেও হয়।

ঘুরে ঘুরে সে সেই দ্রব্যসম্ভার পর্যবেক্ষণ করছে, এমন সময় কে যেন তার নড়া ধরে জোরে এক হ্যাঁচকা টান দিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই তার পাশ দিয়ে একটা মোটর হর্ন দিয়ে বেরিয়ে গেল। লোকটা বলল—"আর একটু হলেই গেছলে যে ! ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামে কখনো ?"

কাঞ্চন এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝল, বলল—"আমায় চাপা দিত নাকি ?"

"দিত না আবার !"

"সে কি ! গাড়িতেই তো মানুষ চাপে জানি, গাড়িও আবার মানুষ চাপে ?"

"আক্ছার ! রোজই তো তু'চারটে মোটরের তলায় মরছে। কলকাতার রাস্তায় খুব সাবধানে চলবে, ফুটপাথ ছাড়া চলবে না, আর রাস্তা পেরুবার সময় চারদিক দেখবে। বুঝলে ?"

কাঞ্চন মোচড়ানো হাতটার শুশ্রূষা করতে করতে ঘাড় নাড়ল।

"লেগেছে নাকি হাতে ?"

"খু-উব। আপনি যেমন করে টানলেন !"

"তোমার ভাগ্যি যে, বেঁচে গেছ। আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

কাঞ্চন চুপ করে রইল। ভাবখানা এই যে, ধন্যবাদ সে কিছুর জন্যে কারুকেই দেয় না।

"তোমার বাড়ি কোথা ?"

কাঞ্চন চুপ।

"বুঝতে পেরেছি, তুমি কলকাতার নও। কোথায় দেশ ?"

কাঞ্চন উত্তর দেয় না।

"বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ বুঝি ? বাবা বোধহয় মেরেছিল ? সত্যি করে বল।"

কাঞ্চন এবার ঘাড় নাড়ে।

"কেন ?"

"রোজগার করতে।"

"এই বয়সে ? কার জন্যে রোজগার ?"

"মার জন্যে। আমার মার বড় তুঃখ।"

"তোমার কে আছে আর ?"

"বাবা আছেন। তু'ভাই আছে। তারা ছোট।"

"বাবা আছেন ! তবে তোমার মার তুঃখ কিসের ?"

"বাবা মাকে একটাও পয়সা দেন না কিনা, তাই মা আমাদের কিছু কিনে দিতে পারেন না। তাই মার তুঃখ। আমি রোজগার করে মাকে টাকা দেব। তাই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।"

৪

খানিক থেমে লোকটি বললে—"তা বেশ। তা তুমি কী কাজ পার ?"

"সব কাজ।"

"বটে ? আমার দোকানে বসে বিক্রি করতে পারবে ?"

"খুব। আপনার কিসের দোকান ?"

"সন্দেশের দোকান।"

কাঞ্চন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলল—"নিশ্চয় পারব।"

তার উৎসাহে কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে লোকটা বললে—"বল কী! আমার সন্দেশ সব খেয়ে উড়িয়ে দেবে না তো?"

"না-না। কক্‌খনো না।"

"তুমি খাবে-দাবে, তাছাড়া তোমাকে মাসে পাঁচ টাকা করে দেব। রাজী আছ? সকালে দু' পয়সা করে পাবে জলখাবার; কিন্তু আমার সন্দেশ তুমি খেতে পাবে না, ওর দাম অনেক, চার পয়সার নিচে নেই।"

কাঞ্চন ঈষৎ ম্লান হয়ে বললে—"তা হোক। আমি পারব; সন্দেশের কাছে বসে থাকলেও ভাল লাগে।"

দুজনে কলেজ স্ট্রীটের মোড়-বরাবর এসেছে, এমন সময়ে অপর দিক দিয়ে মহা সমারোহে একটা বিয়ের শোভাযাত্রা চলেছে। কাঞ্চন অত্যন্ত বিস্ময়ে লোকটিকে জিগ্যেস করল—"এত লোক আলো কাঁধে করে যাচ্ছে কেন?"

"কোনো বড়লোকের বিয়ে হচ্ছে, তারই প্রসেশান।"

"ওঃ! কী চমৎকার বাজনা—নাচতে ইচ্ছে করে!"

"নেচো না যেন—তাহলে আবার মোটর চাপা পড়বে।"

"ওটা কী বাজনা? কখনো শুনি নি তো!"

"ও হচ্ছে ব্যাণ্ড। কেল্লার গোরাদের বাজনা; দেখ দেখ—ওই চতুর্দোলায় বর আসছে। দেখছ, দিব্যি বরটি!"

কোন উত্তর না পেয়ে লোকটি ফিরে দেখে কাঞ্চন কাছে নেই। কোথায় গেল? পাশের একজন লোককে জিগ্যেস করল—"মশাই, এখানে একটি ছেলে ছিল, কোন্ ধারে গেল দেখেছেন?" সে প্রশ্ন পাশের লোকটির কানেও গেল না।

কাঞ্চন তখন লোক-লস্কর, ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপ, চতুর্দোলার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—সন্দেশের দোকানের কথা তার মনেও নেই।

৫

শোভাযাত্রা যেখানে গিয়ে শেষ হল, সে এক প্রকাণ্ড বাড়ি। লাল, নীল, সবুজ, নানারকমের আলোকমালায় তাকে সাজানো হয়েছে; বাড়িখানিকে কাঞ্চনের আলাদিনের মায়াপুরী বলে মনে হতে লাগল। এর ভেতরে না জানি কী রহস্যই আছে!

বর অনেকক্ষণ বাড়ির মধ্যে চলে গেছে। অনেক লোক—তাদের অধিকাংশই নিমন্ত্রিত অভ্যাগত, ভেতরে যাচ্ছিলেন। কাঞ্চন ভাবতে লাগল, সেও যাবে কি না। অনেক ছোট-

ছোট ছেলেমেয়েও তো যাওয়া-আসা করছে। কাঞ্চন একবার নিজের বেশভূষার দিকে তাকাল—তুলনা করে দেখল—তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাকের সঙ্গে এ যেন ঠিক খাপ খায় না।

কাঞ্চন মনে-মনে ইতস্তত করতে লাগল ; কিন্তু অবশেষে যখন ভেতর থেকে লুচিভাজার চমৎকার গন্ধ তার নাকে এসে লাগল, তখন আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সে সমীচীন মনে করল না। ভিড়ের মধ্যে মিশে, তাদেরই একজন হয়ে বেশ সপ্রতিভভাবে একেবারে ভিতরে গিয়ে উপস্থিত হল।

ভেতরে গিয়ে দেখে—এক বৃহৎ আসর। নানা আকারের নানাবিধ ভদ্রলোক সেই আসরে শোভা পাচ্ছেন। কতকগুলি লোক অত্যন্ত তটস্থভাবে তাদের আদর-আপ্যায়ন করছে। সে জায়গাটা তার আদপেই ভাল লাগল না। সেখান থেকে সরে আসরের আর এক প্রান্তে গেল, সেখানে তখন গান-বাজনার চক্রান্ত চলছে। কৌতূহলের বশে সেও সেখানে গিয়ে বসল।

খানিক বাদেই গান শুরু হল। খানিকক্ষণ শুনে আর কাঞ্চনের সহ্য হল না, সে উঠে দাঁড়াল। পাশের একজন ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন—"কী খোকা, উঠলে কেন ? বস, বস।"

কাঞ্চন তাঁকে জিগ্যেস করল—"মশাই, লোকটা অমন করে চেঁচাচ্ছে কেন ?"

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন—"চেঁচাচ্ছে ! চমৎকার গাইছে ! ও হচ্ছে ধ্রুপদ, সবাই গাইতে পারে না। উনিই ভূতোবাবু, নমস্য ব্যক্তি।"

কাঞ্চন বললে—"হোকগে—ভূতোবাবু। ও কি গান ! ও যে মারামারি কাণ্ড !"

কাঞ্চন সেখান থেকে উঠে গেল।

"যেন জ্যাঠামশাই !" কাঞ্চনের উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য করে ভদ্রলোক আবার 'ভৌতিক' গানে মনোনিবেশ করলেন।

কাঞ্চন এ-ঘর ও-ঘর ঘুরতে ঘুরতে যেখানে বিয়ে হচ্ছিল সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। বর-কনে পাশাপাশি বসে আছে, তাদের সম্মুখে আগুন জলছে এবং শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কলাপ চলছে। আগুনের দীপ্তিতে চন্দন-চর্চিত কনের আনত মুখখানি কাঞ্চনের ভারি ভাল লাগল। সে দরজার পাশে একধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে প্রায় তারই সমবয়সী সেই ছোট্ট মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। সমস্ত বিবাহ-ব্যাপারটাই তার হঠাৎ ভারি ভাল লেগে গেল।

এর আগে যদি কেউ তাকে ঠাট্টার ছলেও বলেছে—"তুই বিয়ে করবি ?" তখন সে তাকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে ; বরং তার চেয়ে কেউ তাকে প্রাণ দিতে বললে তাতে সে তৎক্ষণাৎ রাজী ছিল। আজ কিন্তু তার মনে হল, মরার তুলনায় বিয়ে করাটা নিতান্ত খারাপ নয়, বরং বিয়ে করাতে বেশ মজা আছে।

ছেলেবেলায় রাম-সীতার ছবি দেখে সে নাকি মাকে বলেছিল—"মা, আমার সীতার মত বউ চাই।" মা প্রতিবেশিনীদের কাছে তার এই দুর্বলতার কাহিনী প্রকাশ করে আজও কৌতুক করেন। এজন্যে মার ওপর তার এক-এক সময়ে এমন রাগ হয়!

সে নাকি বলেছিল—"আমি রামের মত রাজা হয়ে বসব, সীতার মত বউ আমার পাশে বসবে, মণ্টু আমার মাথায় ছাতা ধরবে, ন্যাপলা হনুমানের মত হাতজোড় করে থাকবে।"

মা বলেছিলেন—"কিন্তু ন্যাপলার যে ল্যাজ নেই!"

সে জোরের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল—"ল্যাজ হবে। ল্যাজ হবে, মা। তুমি দেখো, বড় হলে ওর ল্যাজ হবে।"

তার ছোটবেলার এই গবেষণা নিয়ে প্রায়ই হাসাহাসি হয়। এই ল্যাজ হবার কথা ভাবলে তার নিজেরও আজ হাসি পায়, যদিও সে হাসে না। ন্যাপলার ল্যাজ না হয় নাই বেরুল, মণ্টু যদি ছাতা ধরার চেয়ে ঘুড়ি ওড়ানোটাই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করে তাতেও তার আপত্তি নেই, কিন্তু সীতার মত বউ পাবার বাসনাটা তার মনে বহুদিন পরে হঠাৎ জেগে উঠল। একটা বউ না পেলে আর চলছে না। অন্তত সীতা যদি এ-যুগে সুলভ নাও হয়, এই মেয়েটির মত একটি হলেও তার চলবে।

কাঞ্চনের মন যেন উদাস হয়ে গেল। উদাস হবার আর-একটা কারণ, সেই লুচিভাজার গন্ধটা বিয়ের ঘর পর্যন্ত হানা দিয়েছিল। অবশ্য সেটা গৌণ কারণ, কিন্তু ক্রমশ সেইটাই মুখ্য হয়ে উঠতে লাগল। যে ঘরে এই বিবাহোৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ পুঞ্জীভূত হচ্ছে, সেই ঘরটি বের করবার জন্যে কাঞ্চন ব্যস্ত হয়ে উঠল। কাঞ্চন এখন কলম্বাসের মত আবিষ্কার করতে চায়—কিন্তু আমেরিকা নয়, সীতাও নয়,—সেই লুচিভাজার ঘরটা।

কিন্তু সেই ঘরটি বোধহয় অন্দরমহলে। অনেক চেষ্টা করেও কাঞ্চন সেখানে যাবার পথ খুঁজে পেল না। বাড়িটা যেন গোলকধাঁধার মত। অবশেষে বিরক্ত হয়ে বাইরে গিয়ে সে রাস্তার যানবাহনের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে লাগল; কিন্তু তাও বেশিক্ষণ ভাল লাগল না। অতঃপর সে ব্যাণ্ডওয়ালাদের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। তাদের বাঁশির বহর আগেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেগুলোর অদ্ভুত আকার-প্রকারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানবার তার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ব্যাণ্ডওয়ালারা এতই গম্ভীর প্রকৃতির যে, তাদের সঙ্গে কাঞ্চনের ভাব জমল না।

অগত্যা সে আবার বাড়ির ভেতরে গেল। যেখানে বিবাহপর্ব চলছিল, সেই ঘরটির কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেল—সে-অঞ্চলে এবার একটি নতুন মেয়ের আবির্ভাব হয়েছে। মেয়েটি তার চেয়ে বয়সে দু-এক বছরের ছোট হলেও অত বড় মেয়েকে কেবল ফ্রক পরে বেড়াতে এর আগে কখনো ছাখেনি। সেই মেয়েটি একটি ছোট্ট ছেলেকে হাত নেড়ে, মাথা

নেড়ে কি বোঝাচ্ছিল, তার ছোট্ট বেণীটি দুলছিল। সেই মেয়েটি তার কথা বলার ভঙ্গী, তার মাথা-নাড়া, তার বেণীর দোলন—তার সমস্তই কাঞ্চন অবাক হয়ে দেখছিল।

তার বড় কৌতূহল হল মেয়েটির সম্বন্ধে। খানিক বাদে সেই ছেলেটি যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—"ঐ মেয়েটি কে ভাই?"

ছেলেটি একমুহূর্ত তার দিকে একটু আশ্চর্য হয়ে তাকালে। তারপর অত্যন্ত বিরূপ হয়ে জিগ্যেস করলে—"হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?"

কাঞ্চন একটু ধাক্কা খেল, কিন্তু দমল না। সে কি ইংরিজি জানে না? সেও ইংরিজিতে জবাব দিল—"মাই নেম ইজ কাঞ্চন।"

ছেলেটি আবার জিগ্যেস করল—"হোয়াট ক্লাস ডু ইউ রিড ইন?"

কাঞ্চনের কেমন ধারণা ছিল যে, তার বয়সের অনুপাতে সে নিচু ক্লাসে পড়ে, সেইজন্য ক্লাসের পরিচয় দিতে তার স্বভাবতই অনিচ্ছা হল। সে শুধু বললে—"আই ডোণ্ট সে!"

"ইউ মাস্ট সে!"

"নেভার!"

দূর থেকে তাদের এই বিজাতীয় তর্কাতর্কি শুনে এবার সেই মেয়েটি এগিয়ে এল। ছেলেটিকে জিগ্যেস করল—"কী হয়েছে রে ভোম্বল?"

মেয়েটির সামনে কাঞ্চনের বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। এরকম তার কখনো করে না, এমন কি দুর্ধর্ষ মাস্টারমশায়ের সামনেও না। কাঞ্চনের মনে হল, এরকম বিপদে সে কখনো পড়েনি।

ভোম্বল বললে—'মিনি-দি, ছ্যাখ না এই ছেলেটা! আমি জিগ্যেস করছি, কোন্ ক্লাসে পড়? যেন মারতে আসছে! বলছে, আই ডোণ্ট সে—কিছুতেই বলবে না।"

মিনি-দি বললে—"আচ্ছা আমি পরীক্ষা করছি, দাঁড়া। এই, বানান কর দেখি মেনটেন। ভোম্বল, জানিস, এটা ভারি শক্ত বানান, ছোড়দা আমায় ঠকিয়েছিল।"

মেনটেন! হুঁ! ভারি শক্ত! কাঞ্চনের কাছে এ-বানান অতি তুচ্ছ! ডায়ারিয়া, নিউমোনিয়া, থাইসিস কিংবা আরকিপিলেগো হলে বরং কথা ছিল। নাঃ, মেয়েটির কাছে তার বিদ্যার পরিচয় একটু দিতে হল।

"মেনটেন? এম-ই-এন-টি-ই-এন—মেনটেন।"

মুখ টিপে মিনি জিগ্যেস করল—"মানে?"

"মানে? দশজন মানুষ।"

এবার মিনি হেসে ফেলল—"তোমার মাথা!"

কাঞ্চন বললে—"আহা, দশজন মানুষ না হয়ে হল গিয়ে মানুষ দশজন—মেনটেন ; ও একই কথা।"

মিনি বললে—"তোমার মুণ্ডু! মেনটেন হচ্ছে এম-এ-আই-এন-টি-এ-আই-এন। এর মানে প্রতিপালন করা। এও জানো না তুমি ?"

এবার কাঞ্চন মরীয়া হয়ে উঠল। তাকে অপদস্থ করার জন্যে মেয়েটার ওপর ভারি রাগ হল। সে জিগ্যেস করল—"আচ্ছা, তুমি বানান কর দেখি—শূর্পনখা ?"

মেয়েটি একটু ভুরু কুঁচকে ভাবলে। "শূর্পনখা ? ভোম্বল, কী 'স' জানিস ? দন্ত্য 'স', না মধ্যন্য 'ষ' ? ভোম্বল ঘাড় নেড়ে জানাল যে, সে জানে না।

"কী 'উ' ? হ্রস্ব 'উ', না দীর্ঘ 'ঊ' ?" ভোম্বল আবার ঘাড় নাড়ল।

মেয়েটি কাঞ্চনকে বললে—"বলছি, দাঁড়াও। দন্ত্য স-য়ে হ্রস্ব উ, প-য়ে রেফ স্বর্প, ন আর খ-য়ে আকার—স্বর্পনখা।"

কাঞ্চন বললে—"তোমার মাথা! নিজের নামের বানান জান না, আবার এসেছ পরীক্ষা করতে!"

এবার মেয়েটি রেগে গেল। "কী ? আমার নাম শূর্পনখা ? তুমি তবে ঘটোৎকচ! ঘটোৎকচের বানান জান তো ?"

ভোম্বলের এবার ভারি ফুর্তি। সে 'ঘটোৎকচ' বলে হাততালি দিতে লাগল।

কাঞ্চন গম্ভীর হয়ে বললে—"ঘটোৎকচ হতে পারি, কিন্তু সিংহের মামা তো নই! সিংহের মামা তো একটা জানোয়ার।"

মিনি বললে—"সিংহের মামা আবার কে ?"

"কেন, এই যে তোমার পাশে, ভোম্বলদাস!"

এ-কথায় মিনিকে হাসতে দেখে ভোম্বল অত্যন্ত মুষড়ে গেল। সে বলল—"আমার নাম বুঝি ভোম্বল ? আমার নাম তো সুপ্রকাশ। ছোড়দা, ও ছোড়দা!"

একটি বছর কুড়ি-বাইশের ছেলে ওধার দিয়ে যাচ্ছিল। সে দূর থেকেই জবাব দিল—"দাঁড়া দাদার বিয়েটা কতদূর দেখে আসি।"

ভোম্বল হেঁকে বলল—"দ্যাখ না ছোড়দা, এই ছেলেটা আমাদের অপমান করছে!"

৬

অপমানের কথা শুনে ছোড়দা এগিয়ে এল। মিনিকে ডেকে জিগ্যেস করল—"তোরা কী করছিস এর সঙ্গে ?"

ভোম্বল জবাব দিল—"মিনি-দি শুধু ওকে বলেছে—'মেনটেন বানান কর দেখি' ; তা ও যা বলছে! তুমি ওকে একবার এগজামিন কর না, ছোড়দা!"

অপরকে পরীক্ষিত হতে দেখলে ভোম্বলের ভারি আমোদ হয়। তা ছাড়া ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের এগজামিন করায় ছোড়দার কী রকম আগ্রহ, তা সে জানে।

ছোড়দা বললে—"বটে ? তোমার নাম কী বাপু ?"

কাঞ্চন অপ্রসন্ন মুখে জবাব দিল—"কাঞ্চন।"

"কাঞ্চনের ইংরিজি কী ?"

কাঞ্চন গুম হয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না।

"কাঞ্চনের ইংরিজি হচ্ছে গোল্ড্, তাও জানো না ? সাহসীর ইংরিজি বোল্ড্। ঠাণ্ডার ইংরিজি—কোল্ড্। বলিয়াছিল-র ইংরিজি—টোল্ড্। পুরাতনের ইংরিজি—ওল্ড্। তৈরি করার ইংরিজি—মোল্ড্। বিক্রীত-র ইংরিজি—সোল্ড্। ধরে থাকার ইংরিজি—হোল্ড্। নাঃ, তুমি কিচ্ছু জান না।"

কাঞ্চন নীরব।

"আচ্ছা, ট্রান্স্লেট কর তো—'আমার একটা গাধা ছিল। লজ্জা কী ? বলে ফেল।"

কাঞ্চন তবু কিছু বলে না।

"ভয় কিসের ? বলে ফেল। ভয় নেই।"

এবার কাঞ্চনের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। ভয় ? অমন যে অঙ্কের মাস্টারমশাই, অমন যে সেকেণ্ড পণ্ডিতমশাই, তাকেই সে ভয় করে না, আর সে ভয় করবে এই—হুঁঃ !

কাঞ্চন গর্বের সঙ্গে বলল—'ভারি তো ট্রান্স্লেশন ! 'আই ওয়াজ্ এ এ্যাস' !"

ছোড়দা ভারি হাসতে লাগল। কাঞ্চন সংশোধন করে বললে—"আই ওয়াজ এ্যান এ্যাস।"

ছোড়দা তবুও হাসে। কাঞ্চন অপ্রতিভ হয়ে বলল—"কেন, ভুলটা হল কোথায় ? পাস্ট টেন্স্ তো দিয়েছি।"

ছোড়দা শুধু বলল—"ওরে, তোরা কেউ এই গাধাটাকে চিড়িয়াখানায় দিয়ে আয়।" বলে মিনি ও ভোম্বলকে নিয়ে চলে গেল।

ভোম্বল যেতে যেতে বলল—"ও কিন্তু, ছোড়দা, মিনিদির কথা জিগ্যেস করছিল। বলছিল—'ও মেয়েটা কে ?' তাতেই তো আমার রাগ হয়ে গেল।"

ছোড়দা বলল—"তাই নাকি ? মিনির কথা জিগ্যেস করছিল ? তবে বোধহয় মিনিকে আমাদের ওর পছন্দ হয়েছে।"

মিনি শুধু বলল—"দূর !"

ছোড়দা বলল—"তা মন্দ কী ! মিনি, ওকে যদি তোর বাহন করিস, তাহলে তুই শীতলা ঠাকরুণ হবি।"

মিনি দাদার পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিল।

এদিকে কাঞ্চন অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে এক কোণে বসে রইল। এত উৎসব, আনন্দ, কর্ম-কোলাহল—কিছুই তার আর ভাল লাগছিল না। মেয়েটির সামনে! ছি ছি! নাঃ, ইংরিজিটা তাকে ভাল করে শিখতেই হবে। হয়তো দু-পাঁচ বছর বাদে ওই ছোড়দা আবার তার সঙ্গে লাগতে আসবে, কিন্তু তখন সে হেডমাস্টারের মত ইংরিজি জানে; তখন তার কাছে বিদ্যে ফলানো সোজা নয়! তখন সে তাকে আচ্ছা জব্দ করে দেবে—ওই মিনির সামনেই হ্যাঁ!

বেশিক্ষণ কিন্তু মুখ চুন করে থাকবার ছেলে সে নয়। যেমনি ঘোষণা হল যে, বামুনদের পাতা পড়েছে, তৎক্ষণাৎ সে অদম্য উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠল। একবার তার মনে হল, সে তো বামুন নয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মন জবাব দিল—না হোকগে, খাওয়াটাই আসল, বামুনটা নয়।

সে সটান বামুনের পঙ্‌ক্তিতে গিয়ে বসে পড়ল। নানারকম তরিতরকারি পাতে পড়তে লাগল। কাঞ্চন এক-একটু চেখে দেখল। তার পরে লুচি এল। ময়দার ছোট ছোট ফুলকো লুচি—গুটি-ছয়। সে ছখানা তো কাঞ্চনের এক নিশ্বাসে উড়ে গেল। তারপরে আবার প্রত্যেকের পাতে চারখানা করে পড়ল—কাঞ্চনের দ্বিতীয় গ্রাস। তৃতীয় বারে জনপ্রতি জিগ্যেস করে লুচি দিচ্ছিল। অনেকেই বলল—"আর না।" কাঞ্চন চুপ করে রইল, ফলে তার পাতে আর দুখানা পড়ল। সে দুখানা মরুভূমিতে জলবিন্দুর মত তৎক্ষণাৎ শুষে গেল। তারপরেই দই-সন্দেশ এল। তারপর আর লুচি এল না।

কাঞ্চন মনে মনে বলল—"ধুত্তোর! এই কি না কলকাতার ভোজ!" পাশের একজন ভদ্রলোক যখন বললেন—"নাঃ, খাওয়াটা আজ বেজায় হয়ে গেল, অম্বল না হলে বাঁচি, একটা সোডা খেতে হবে,—" তখন কাঞ্চন তার ওপর দস্তুরমত রেগে গেল। ঐ নামমাত্র আহার যেন ঘৃতাহুতি, কাঞ্চনের জঠরানল তার ফলে দ্বিগুণ জ্বলে উঠেছে।

কী করে বেচারা! সকলের সঙ্গে উঠে তাকেও আঁচাতে হল। অবশেষে আবার ঘোষণা হল, "কায়স্থদের জায়গা হয়েছে"। তখন কাঞ্চনের আত্মাপুরুষ বলে উঠল—"আমি তো কায়স্থ! এবার আমার ন্যায্য অধিকার, আমার বার্থ-রাইট!" কাঞ্চন কায়স্থদের দলে গিয়ে দ্বিতীয়বার খেতে বসে গেল।

কাঞ্চন যখন দ্বিতীয়বার আঁচাচ্ছে, ভোম্বল তখন মিনির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল—"দেখছিস, ছেলেটা কী পেটুক, ভাই! একবার বামুনদের সঙ্গে খেয়ে আবার কায়স্থদের দলে—"

মিনি তাকে থামিয়ে দিল—"যাঃ, বকিস নে।"

"কেন? আমি দেখেছি যে—"

"ওর শরীরখানা দেখেছিস? কী রকম মাস্‌কিউলার? তোর মত পটকা নাকি? তোর

মত তিনটেকে পিষে ফেলবে। তোর তিনগুণ না খেলে ওর চলবে কেন? কী রকম চওড়া বুক দেখেছিস?"

কথাটা কাঞ্চনের কানে গেল। শরীরের প্রশংসায় তার চওড়া বুক যেন আরও চওড়া হয়ে উঠল। নিরুৎসাহিত ভোম্বলের মলিন মুখের দিকে বিজয়গর্বে সে একবার কটাক্ষপাত করল। তারপর কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে গম্ভীর মুখে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল— যেন স্বয়ং গামা কি গোবর।

তার কানে গেল ভোম্বলের প্রতিবাদ। সে বলছে—"হ্যাঁ, ভা-রি তো বুক! অমন ঢের দেখেছি। ওকে এমন বক্সিং-এর প্যাঁচ মারব যে, বাছাধন—" বলে বক্সিং-এর একটা প্যাঁচ মিনিকে সে দেখিয়ে দিলে।

মিনি উত্তর দিল—"যাঃ যাঃ, তোকে আর বাজে বড়াই করতে হবে না। তুই তো তুই! ছোড়দাও ওর সঙ্গে পারবে কি না—"

বাকি কথাটা কাঞ্চন শুনতে পেল না। তার আর শোনার দরকারও ছিল না। বিদ্যায় না হোক, অন্তত গায়ের জোরে সে যে ছোড়দার সমকক্ষ, এ কথা ভাবতে তার ভারি আরাম বোধ হল। আর এই ধারণা হচ্ছে মিনির—সেই মেয়েটির—যাকে বিয়েবাড়ির সমস্ত মেয়ের মধ্যে তার পছন্দ হয়েছে।

যে-ঘরে গানের আসর বসেছিল, সেখানে তখনো তুমুল উদ্যমে গীতবাদ্য চলছে। হাত, পা ও গলার একটানা কসরতে ভূতোবাবু তখনো কাহিল হননি। কাঞ্চন মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বড় দেওয়াল-ঘড়িতে দেখলে—বারোটা বেজেছে। ঘড়ির অনুশাসনকে উপেক্ষা করা অনুচিত বলে তার মনে হল। তৎক্ষণাৎ সে সেই বিস্তীর্ণ আসরের একপ্রান্তে লম্বা হয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়ে সে আজ সমস্ত দিনের কথা ভাবতে লাগল। আজ বেলা দুপুরে সে বাড়িতে ছিল, আজ রাত দুপুরে সে এখন কোথায়! সে যে কোথায়, কার বাড়িতে, সে নিজেই জানে না। সমস্ত দিনে কত কাণ্ডই না ঘটল! কিন্তু দৈহিক শক্তি কিছু-বা থাকলেও চিন্তা-শক্তি কাঞ্চনের আদপেই ছিল না। খানিক বাদেই সে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের মহামারি আস্ফালনকে উপেক্ষা করে ও সমস্ত দুর্ভাবনা ভুলে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল—সে সত্যিই রাজা হয়েছে। তবে অযোধ্যার নয়, কলকাতার। সোনার সিংহাসনে সে বসেছে। মণ্টু ঘুড়ি-ওড়ানো মার্বেল-খেলা লাট্টু-ঘোরানো ইত্যাদি যাবতীয় জরুরি কাজ পরিত্যাগ করে তার মাথায় ছাতা ধরেছে; আর ন্যাপলা—ওমা! তাই তো! সত্যিই যে ওর ল্যাজ গজিয়েছে! সে বেচারা যথাসাধ্য গাল ফুলিয়ে তটস্থ হয়ে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পাশে যে বসেছে, কাঞ্চন ভাল করে ঠাহর করে দেখলে, সে মিনি ছাড়া আর কেউ নয়! কাঞ্চনের ভারি আনন্দ হ'ল।

কিন্তু কথায় বলে—অত সুখ সয় না। কোথা থেকে সেখানে তার বাবা এসে হাজির। তাঁর হাতে সেই রুপো-বাঁধানো ছড়ি—মালখানা থেকে সদ্য-বহিষ্কৃত। নাঃ, আর রাজত্ব করা নিরাপদ নয়; একলাফে সিংহাসন, মিনি, মণ্টু, ন্যাপলা—সবাইকে ত্যাগ করে কাঞ্চন দে ছুট! ছুট—ছুট—একছুটে একেবারে নিরুদ্দেশ।

কাঞ্চনের যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেশ একটু বেলা হয়েছে।

বিস্তৃত ফরাস তখন প্রায় জনশূন্য। একজন বুড়ো লোক—সেই বাড়িরই কোন কর্মচারী—এক কোণে বসে একটা মোটা জাবদা খাতা নিয়ে বোধকরি হিসেবপত্র দেখছিলেন, কাঞ্চনকে জাগতে দেখে কাছে ডেকে জিগ্যেস করলেন—"কাদের বাড়ির তুমি?"

কাঞ্চন গম্ভীরভাবে উত্তর দিলে—"আমাদের বাড়ির।"

লোকটি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—"তাতে কী বুঝব? যাই হোক, তুমি কি বাড়ি চিনে যেতে পারবে? তোমার লোকজন বোধহয় ভুলে তোমায় ছেড়ে চলে গেছেন। ঠিকানা বললে তাঁদের খবর দিতে পারতুম।"

কাঞ্চন বললে—"কোন দরকার করে না। আমাকে কি আপনি পাড়াগেঁয়ে ভেবেছেন? কলকাতাতেই এত বড় হলুম, আর কলকাতার পথ-ঘাট চিনিনে! আমি ঠিক যাব।"

কাঞ্চন চলে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক ডেকে বললেন—"ওহে ছোকরা, তোমার চাদরটা ভুলে যাচ্ছ যে!"

কাঞ্চন দেখলে সে যেখানে শুয়ে ছিল, তারই কাছে একটি চমৎকার সিল্কের চাদর পড়ে আছে। কোন ভদ্রলোক হয়তো কাল ফেলে গেছেন। কাঞ্চন বললে—"না, ও চাদর আমার নয়।"

এতক্ষণে ভদ্রলোকের মুখে হাসি দেখা গেল। তিনি বললেন—"তোমার নয়? ভাল! আমিও তাই ভাবছিলুম। তবে ওটা আমারই দাঁড়াল।"

কাঞ্চন ততক্ষণে বের হয়ে গেছে।

৭

বাড়ির বাইরে সদর দরজার ধারেই এঁটো পাতা, গেলাস, খুরিতে স্তূপাকার। সেই স্তূপীকৃত জঞ্জালের পাশে মানুষ ও কুকুরের কোলাহল বেধে গেছে। চার-পাঁচজন ভিখিরি আবর্জনা ঘেঁটে তার ভেতর থেকে ছেঁড়া লুচি, ভাঙা সন্দেশ, ভাজা পাঁপরের টুকরো, ডাল-তরকারির অংশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে সঞ্চয় করছিল, কুকুরদের তাতে প্রবল আপত্তি। তারা এতক্ষণ দূর থেকে সমবেত প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, কিন্তু তাদের সেই আন্দোলনে কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে আক্রমণের উদ্যোগে ছিল, সেই সময়ে ভিখিরিদের একজন কুকুরদের অগ্রগামী নেতাটিকে এক লাঠি বসিয়ে দিয়েছে। তার ফলেই কোলাহল।

কাঞ্চন আহত কুকুরের পক্ষ নিয়ে বললে—"কাহে মার্তা ইস্কো ?"

যাকে সাধুভাষায় বলে রোষকষায়িত নেত্র, ঠিক সেই চোখে ভিখিরিরা কাঞ্চনের দিকে একবার কটাক্ষপাত করল। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট, কাঞ্চনের চেয়ে বয়সে কিছু বড়ই হবে, সে-ই সংক্ষেপে উত্তর দিল—"খানে আতা হায় !"

কাঞ্চন বলল—"খায়েগা নেহি ? কুকুরকা বাস্তে তো ফেক দিয়া।"

এইবার তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়, সে কথা বলল—"আদ্মিকো খানে নেহি মিল্তা, কুত্তা খায়েগা ?"

কাঞ্চন অবাক হয়ে জিগ্যেস করল—"তুম্লোক এ লেকে কেয়া করেগা ?"

সেই ছোট ছেলেটি বললে—"খায়েগা।"

কাঞ্চন স্তব্ধ হয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল—এত বড় শহর, এখানে এত বড়লোক, লোকের এত টাকা, এমন ভোজ, এমন শোভাযাত্রা, আর এখানেই কিনা মানুষকে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খেতে হয় ! কাকে দয়া করবে—কার পক্ষে সে দাঁড়াবে ? কুকুরের, না মানুষের ?

সেই দৃশ্যের সম্মুখে সে আর একটুক্ষণও দাঁড়াতে পারল না। কাল রাত্রের সমস্ত খাওয়া যেন তার গলা দিয়ে ঠেলে আসতে লাগল। সেইসঙ্গে কান্নাও। সে ভাবতে ভাবতে চলল—কুকুরের মুখের গ্রাস কেড়ে এখানে মানুষকে বাঁচতে হয় ! এ কেন—এরকমটা কেন ?

কেন যে এরকমটা, সে কিছুতেই ভেবে স্থির করতে পারল না। শেষে এই স্থির করল—সে বড় হলে কলকাতার সমস্ত ভিখিরিদের একটা বড়রকমের ভোজ দেবে। বড় হলে বড়লোক সে হবে নিশ্চয়ই, কেননা বড়লোক হতে দেরি হয় না, বড় হতেই যা দেরি। ভিখিরিদের কী কী খাওয়াবে, তারও একটা ফর্দ সে মনে মনে ঠিক করে ফেলল।

আঃ, কালকে রাতের সেই ভোজটা ! কম খাওয়াক, কিন্তু কী চমৎকারই খাইয়েছে ! অত সাদা লুচি তাদের পাড়াগাঁয়ে হয় না। আর ক্ষীরটাই বা কী রকম—ক্ষীরের মধ্যে কেবল দুধের সর, সমস্তটার স্বাদই আলাদা ! দইটাই বা কেমন মিষ্টি—তাদের গাঁয়ের দইয়ের মত অমন জোঁদা টক নয়—ওরকম দই সে অনায়াসে একহাঁড়ি মেরে দিতে পারে। আর সন্দেশ ! তাদের গাঁয়ের গাঙ্গুলির দোকানের মণ্ডা—তা দিয়ে আম পাড়া যায় ! দেবী গাঙ্গুলি সাতজন্মেও অমন সন্দেশ করতে পারবে না। আঃ, কী তার সোয়াদ—এখনো যেন জিভে লেগে আছে। হবেই তো। ওর দাম যে অনেক—কোনটাই চার পয়সার নিচে নয়—বোধহয় আরো বেশি !

ভোজের কথা থেকে তার মিনির কথা মনে পড়ল। তার সঙ্গে দেখা করে এলে হত আজ। এখন ফিরে যাবে নাকি ? সেই বুড়ো সরকারকে গিয়ে বলবে—'তোমাদের মিনিকে একবার ডেকে দাও না ?' কিন্তু যা মেয়ে বাবা ! এখুনি এসে হয়তো জিগ্যেস করবে—'ফিলাডেল্-

ফিয়া কোথায় ? স্যাঙোমিঙ্গো কোথায় ? কোথায় মিসিসিপি ?' কিংবা হয়তো বলবে—'হিপো-পটেমাস বানান কর।' তাহলেই তো সে গেছে! মেয়েটির সব ভাল, ওই একটা বড় দোষ।

নাঃ, এখন মিনির সঙ্গে দেখা করাটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। এখন মিনি কিছুতেই তাকে 'রেসপেক্ট' করবে না। নাঃ, সে বড় হয়ে এবং মিনির চেয়ে অনেক বেশি বিদ্বান হয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে। মোটরে চেপে যাবে সে, গায়ে থাকবে সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে রিস্ট-ওয়াচ, বুক-পকেটে ফাউণ্টেন পেন। মিনি তাকে চিনতেই পারবে না। তখন সে বলবে—'তোমার বড়দার বিয়ের রাত্রে আমাকে দেখেছিলে।' তখনও যদি চিনতে না পারে, তাহলে সেই লজ্জার কথাটা বলতে হবে—'তুমি যাকে মেনটেন বানান করতে বলেছিলো গো!' তখন মিনি নিশ্চয়ই চিনবে। সে মিনিকে বলবে 'এখন আমাকে বানান জিগ্যেস করতে চাও? আমি এখন এম্. এ. পড়ি। অনেক মোটা-মোটা শক্ত-শক্ত বই আমাকে পড়তে হয়। তার মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত খবর, সব বিদ্যা আছে। তুমি কী জানতে চাও বল!' মিনি তখন লজ্জায় মুখ নিচু করে থাকবে। আর তার ছোড়দা? সে তখন সাতবার বি. এ, ফেল করে বাড়িতে বসে আছে। আর ভোম্বল? সে তার দাদার দশা দেখে কলেজে ভর্তিই হয় নি।

একটা খবর-কাগজের হকার হেঁকে যাচ্ছিল—"মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—১৯৩১ সনের মধ্যেই স্বরাজ দিব।"

কাঞ্চন ভাবল—স্বরাজ আবার কি? মহাত্মা গান্ধীই বা কে? ডেকে জিগ্যেস করবে? ততক্ষণে হকার অনেক দূর চলে গেছে। স্বরাজ কি একটা বড় রকমের ভোজ-টোজ নাকি? মহাত্মা গান্ধী তাই বুঝি দেবেন? যদি মাসখানেকের মধ্যে পাকে, তাহলে ভোজটা সে খেয়েই বাড়ি ফিরতে পারবে। হকারের কাছে চেয়ে কাগজখানা দেখলে হত, ওতে বোধ হয় সব লেখা আছে।

খানিকদূর গিয়ে কাঞ্চন দেখে—বাঃ, একটা পুকুর যে! পুকুরের চারধারে রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে আবার বেঞ্চি পাতা—সমস্ত জায়গাটা রেলিং দিয়ে ঘেরা। কাঞ্চন পুকুর দেখে ভারি খুশী হয়ে উঠল। এতক্ষণ কেবল বাড়ি-ঘর দেখতে দেখতে চোখ যেন ক্ষয়ে যাচ্ছিল, অবশেষে অনেকখানি কালো জল দেখে চোখদুটো যেন জুড়োল, সে পুকুরের ধারে সিঁড়ির রোয়াকে গিয়ে বসল।

পুকুরের অন্য ধারে কতকগুলো ছেলে ড্রিল করছিল—কাঞ্চনের চেয়ে তারা বয়সে বড়। কুড়ি-বাইশ বছর করে বয়স—এইরকম কাঞ্চনের মনে হল। একজন মাস্টার-গোছের লোক তাদের ড্রিল শেখাচ্ছে।

কাঞ্চনের অদূরে বসে একজন হিন্দুস্থানী দাঁতন করছিল, কাঞ্চন তাকেই জিগ্যেস করল—"এত সকালে ওরা ড্রিল করছে কেন? ওরা কারা?"

হিন্দুস্থানীটা উত্তর দিল—"উ-লোক সব হোল্‌টিয়র হায়।"

হোল্‌টিয়ার কী রে বাবা! ব্যাপারটা কাঞ্চনের কাছে কিছুমাত্র পরিষ্কার হল না। সে জিগ্যেস করলে—"কোন্ ইস্কুলমে পড়তা হায় ও-লোক?"

"ইস্কুলমে? উ-লোক্ পড়াশুনা, ইস্কুল-কালিজ তামাম ছোড় দিয়া।"

পড়াশুনো, স্কুল-কলেজ সব ছেড়ে দিয়েছে? ওদের আর বই মুখস্থ করতে হয় না, অঙ্কও কষতে হয় না! বা রে! এ তো ভারি মজা! কাঞ্চন ভাবতে লাগল—সেও ড্রিলের খাতায় নাম লেখাবে নাকি!

অদূরে জলের মধ্যে হঠাৎ একটা ঘাই মারতে দেখে কাঞ্চন চমকে উঠল—"পুকুরের মধ্যে কী আবার!"

হিন্দুস্থানীটা কাঞ্চনের দিকে কৃপার চক্ষে তাকিয়ে বললে—"মছলি।"

ওমা! তাই তো! ইয়া-ইয়া প্রকাণ্ড মাছ জলের তিন-চার সিঁড়ি নিচে অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে; গিয়ে পাঁজাকোলা করে একটা ধরলেই হয়। এতবড় পুকুরটা কি এমনি মাছে বোঝাই? কেউ কি এদের ধরে খায় না? মাছগুলোর প্রাণে একটুও ভয় নেই তো! এরকম কেন? ইত্যাদির প্রশ্ন কাঞ্চনের মুখে এল, সে হিন্দুস্থানীটাকে জিগ্যেস করতে যাবে, দ্যাখে—সে তখন দাঁতন সমাধা করে চলে যাচ্ছে। কী করে কাঞ্চন! চুপ করে ভাবতে লাগল। মাছগুলো পুকুরের জলের মত কাঞ্চনের মনের তলদেশও যেন আলোড়িত করতে-লাগল।

৮

কাঞ্চন খানিকক্ষণ সেই পুকুরের ধারে বসে হোল্‌টিয়ার ও মাছদের ড্রিল দেখল। তারপর সে ধীরে ধীরে সেখান থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূরেই একটা চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চায়ের গন্ধ এসে কাঞ্চনের নাকে লাগল। বাঃ, চমৎকার তো! কাঞ্চন মুখ তুলে দেখে, সেই দোকানের টেবিলে একখানা খবরের কাগজ পড়ে আছে। এই খবরের কাগজ থেকে তো মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজের ব্যাপারটা জেনে নেওয়া যায়! কাঞ্চন টেবিলের ধারে গিয়ে বসল।

বাঃ, এ যে 'বসুমতী' দেখছি! এত ছোট কেন? তাদের বাড়ি ফি-হপ্তায় যে বসুমতী যায়, সে তো এর চার-ডবল। তার আধখানায় শুয়ে আধখানা চাদরের মত গায়ে ঢাকা দেওয়া যায়। সেই বসুমতী এত ছোট হয়ে গেছে! কাঞ্চন কিঞ্চিৎ দুঃখবোধ করল।

"চা দেব আপনাকে?"

কাঞ্চন মুখ তুলে দেখল, দোকানের একটি চাকর তাকে সম্ভাষণ করছে। 'আপনি' সম্ভাষণে সে অত্যন্ত বিগলিত হয়ে গেল। বললে—"তা, দাও।"

"টোস্ট দেব ?"

"টোস্ট ? তা দিতে পার।"

কাঞ্চন মনে মনে বললে—টোস্ট আবার কী ? কখনো তো কানে শুনিনি ! যাই হোক, খাদ্য নিশ্চয়ই। আর যা-কিছু খাদ্য, তাতে কাঞ্চনের অরুচি নেই।

"দুখানা টোস্ট দিই তবে ? আর মামলেট ?"

"মামলেট ?"

"মামলেটও হতে পারে, পোচও হতে পারে—যা আপনি চান।"

এ বলে কী ! মামলেট, আবার পোচ ! এরকম অদ্ভুত নাম তো কাঞ্চন শোনেনি কখনো ! বলল—"একটা মামলেট আর পোচ।"

কাঞ্চন কাগজের মধ্যে সেই দরকারি খবরটা খুঁজছে, এ-পাতা ও-পাতা ওল্টাচ্ছে, এমন সময়ে সেই লোকটি আবার জিগ্যেস করল—"আপনার টোস্টে কী দেব ? গোলমরিচ, না চিনি ?"

কাঞ্চন গম্ভীরভাবে জবাব দিল—"দুই-ই দাও !"

এতক্ষণে সেই খবরটি পাওয়া গেছে—ভেতরের একটা পাতার মাথাতেই বড় বড় অক্ষরে লেখা—'মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, ১৯২১ সালের মধ্যেই স্বরাজ দিব।' খবরটা আনুপূর্বিক পড়তে যাবে, এমন সময়ে "দেখি ভাই, কাগজখানা," বলে পাশের ভদ্রলোক কাঞ্চনের হাত থেকে কাগজখানা কেড়ে নিলেন।

কাঞ্চন তাঁকে জিগ্যেস করলে—"স্বরাজ হলে কী হবে মশাই ?"

"তখন আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না।"

"স্বরাজ হলে সবার সুখ হবে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"সবাই বেশ ভাল খাবে-দাবে ? ভাল পোশাক পরবে ?"

ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে কাঞ্চনের দিকে তাকালেন, তার পরে জোরের সঙ্গে বললেন—"নিশ্চয়ই।"

"আচ্ছা, গরিব মানুষদেরও স্বরাজ হবে তো ? স্বরাজ হলে তারা ভাল খেতে পাবে, পরতে পাবে ?"

"তার মানে ?"

"গরিবদের আবর্জনা ঘেঁটে আর পথের এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে খেতে হবে না তো ?"

ভদ্রলোক হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারলেন না, তিনি ঈষৎ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

কাঞ্চন পুনরায় প্রশ্ন করল—"তাহলে গরিব লোকেরাও তিনতলা চারতলা বাড়িতে বেশ আরামে বাস করতে পাবে তো ?"

ভদ্রলোক বললেন—"স্বরাজে এসব হবে বলে আমার মনে হয় না। গরিবরা গরিবই থাকবে!"

কাঞ্চন বললে—"মহাত্মা গান্ধী কে?"

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে গেলেন—"সেকি? মহাত্মা গান্ধীর নাম শোনোনি?"

কাঞ্চন লজ্জার সহিত স্বীকার করল—নাম শুনেছে বটে, তবে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে সে ভালমত কিছু জানে না। যে অজ পাড়াগাঁয়ে তাদের বাড়ি, সেখানে কোন খবরই বড়-একটা পৌঁছয় না। হ্যাঁ, একখানা খবর-কাগজ সাতদিন অন্তর তাদের বাড়ি যায় বটে, কিন্তু তার বাবা নিজে পড়ে ফাইল করে রাখেন। কাঞ্চনকে পড়তেও দেন না, সে পড়েও না। একবার তাদের স্কুলের ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেরা গাঁধির হুজুক না কি নিয়ে মেতে উঠেছিল, তারা বলছিল বটে যে স্কুল বয়কট করবে, কিন্তু সব ক্লাসের সব ছেলে জিনিসটা ভাল করে বুঝবার আগেই হেডমাস্টারমশাই একমাসের লম্বা ছুটি দেওয়ায় ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়।

কাঞ্চনের সমস্ত কথা শুনে ভদ্রলোক তখন তাকে গান্ধীজীর জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বোঝাতে লাগলেন। কাঞ্চন অভিভূতের মত শুনতে লাগল।

গান্ধীজী রোজ মাত্র ছ' পয়সার খেয়ে থাকেন শুনে কাঞ্চন অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বলল—"বলেন কী! মোটে ছ'পয়সা? কী খান তিনি?"

"কেবল ছাগলের দুধ। রোজ দেড় সের।"

"তা তো ছ'পয়সায় হবে না! দেড় সের ছাগলের দুধের দাম আমাদের গাঁয়েই তো দেড় টাকা।"

ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—"তাহলে ওটা বোধ হয় বাজে কথাই হবে। আমি কিন্তু ওই রকম শুনেছিলাম।"

কাঞ্চন ঘাড় নেড়ে বললে—"না, বাজে কথা নয়, ঠিক হয়েছে। ছাগলকে বোধ হয় ছ'পয়সার ঘাস খাওয়ান। সেই ঘাসে দুধ হয় তো?"

ভদ্রলোক বললেন—"তাই হবে তাহলে। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।"

গান্ধীজীর গল্প শোনবার অবসরে অজ্ঞাতসারে কাঞ্চন টোস্ট, পোচ, মামলেট ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করছিল। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললে—"আঃ ভারি গরম।"

ভদ্রলোক পেয়ালার গায়ে হাত দিয়ে বললেন—"গরম কোথায়? এ তো জুড়িয়ে গেছে।"

"জুড়োয় নি এখনো, মুখ পুড়ে গেল।"

"তাহলে প্লেটে ঢেলে খাও।"

"খাচ্ছি। আমি শুধু ভাবছি, গান্ধীজী এত কষ্ট করে যে স্বরাজ আনবেন, তা কেবল বড়লোকদেরই স্বরাজ হবে। গরিবদের দুঃখ আর ঘুচবে না।"

"ক্রমশ ঘুচবে, ক্রমশ।"

একটু পরে ভদ্রলোক বললেন—"খাওয়া হয়েছে? চল এবার ওঠা যাক।"

"হ্যাঁ, চলুন।"

ভদ্রলোক ও কাঞ্চন উঠতেই দোকানের লোকটি বললে—"খোকাবাবু, আপনার দামটা দিলেন না?"

কাঞ্চনের এতক্ষণে হুঁশ হল। সে বললে—"দাম? এই যাঃ, আমার কাছে তো একটিও পয়সা নেই! এই গ্যাখ—" বলে সে শূন্য পকেটে হাত পুরে দিল। পকেটের শূন্যতা সম্বন্ধে তার মনে কোন সংশয় ছিল না, কেবল দোকনদারকে নিঃসন্দেহ করার জন্যেই তার এই প্রয়াস।

কিন্তু নিঃসন্দেহ হয়ে দোকানদার নিরস্ত হল না; বরং তার ব্যস্ততা যেন বেড়ে গেল। সে বললে—"সেকি! তুমি যে অনেক খেয়েছ?"

'আপনি' থেকে 'তুমি'! কাঞ্চন ভারি চটে গেল; সে বললে—"তুমি আমাকে খাওয়ালে কেন? আমি তো খেতে চাইনি। আমি তো খবর-কাগজ পড়তে এসেছিলুম।"

"শুনছেন বাবু, শুনছেন ছোঁড়ার কথা? উনি খেতে চাননি! আপনি তো আগাগোড়াই সব দেখেছেন—"

ভদ্রলোকের সাক্ষাতে কাঞ্চন এবার নিজেকে অপমানিত মনে করল। সে বললে—"তা খেয়েছি তো কী হয়েছে? ধার থাকল তবে।"

"ধার থাকল! তোমাকে চিনি না, জানি না, তোমাকে ধার দেয় কে?"

"তা আর কি হবে, পয়সা নেই যখন! লিখে রেখে দাও। দেবী গাঙ্গুলিও লিখে রাখে।

ভদ্রলোক এতক্ষণে কথা বললেন—"কত হয়েছে?"

দোকানদার বললে—"দু'খানা টোস্ট, একটা পোচ, একটা মামলেট, এক কাপ চা চার পয়সা, আর পাঁচ পয়সা—ন পয়সা, আর চার পয়সা, হল গিয়ে তের পয়সা, চায়ের তিন পয়সা—একুনে চার আনা।"

"এই নাও চার আনা। হল তো?" পয়সা চুকিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক কাঞ্চনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাকে বললেন—"কোথায় যাবে তুমি?"

কাঞ্চন বললে—"কোথাও না!"

"এস তবে, এই পার্কে খানিকক্ষণ বসে গল্প করা যাক।"

কাঞ্চন একটু আগে যে পুকুরটা পরিত্যাগ করে এসেছিল তারই ধারে তারা দু'জনে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল।

কাঞ্চন মনে মনে ভারি বিস্ময় বোধ করছিল। একজন অচেনা ছেলের জন্য এতবড় ত্যাগ স্বীকার করতে এর আগে সে কাউকে দ্যাখেনি। ত্যাগীর আসনে ভদ্রলোককে গান্ধীজীর ঠিক পরেই সে স্থান দিল। এক কথায় একেবারে চার আনা! চার আনা তো কম পয়সা নয়! ষোল দিনে জমে! বাবা রোজ একটি করে পয়সা তাকে দেন, সে তাই মার কাছে জমায়। অনেকগুলো জমলে তাই নিয়ে তখন ঘুড়ি-লাটাই কিংবা ছিপ-হুইল ইত্যাদি কেনে।

সে এখন বড় হয়েছে—এই অজুহাত দেখিয়ে সে একবার বাবার কাছে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল যে, এক পয়সায় তার আর চলে না, ওটা দু'পয়সা করা হোক। বাবা তার বড়ত্বে বিশ্বাস করলেন কি না ঠিক বোঝা গেলেও বরাদ্দটা বাড়িয়ে দিতে তাঁর বিশেষ আপত্তি দেখা গেল।

বাবা বললেন—"এইখানে সাতহাত মাটি খোঁড়্ দেখি, পাবি একটা পয়সা? পয়সা কি অমনি আসে?"

পয়সা যে সস্তা নয়, এ-বিষয়ে সে বাবার সঙ্গে একমত হতে পারে না, কেননা পয়সার যা-কিছু দুর্লভতা—সে কেবল তারই তরফেই; তার বাবার বেলায় সেই পয়সাই অজস্র-ভাবে অমনি-অমনি আসে।

সে বাবাকে উত্তর দিয়েছিল—"এখানে মাটি খুঁড়লে পয়সা পাব না বটে, কিন্তু কূপ খুঁড়লে হাতপিছু ছ'আনা করে পাব। অনাদি পরান মণ্ডলের বাড়ি কূপ খোঁড়ে, সে পায়।"

ছেলেকে পরান মণ্ডলের বাড়ি কূপ খুঁড়তে উৎসাহিত করতে বাবা চান না, তাই মাটি-খোঁড়ার উপমাটা আর তিনি দেন না। আজকাল বলেন—"পয়সা কি গাছে ধরে, যে নাড়লেই টুপটাপ করে পড়বে?"

কাঞ্চন হটবার ছেলে নয়। সে জবাব দেয়—"গাছ নাড়লে পয়সা না পড়ুক, ফল তো পড়বে, সেই ফল বেচলে পয়সা।"

বাবা বিরক্ত হয়ে বলেন—"তবে তাই নাড়ো গে।"

কাঞ্চন অগত্যা চলে যায়, কিন্তু কোন গাছের কাছে নয়। কাছাকাছি বিস্তর গাছ থাকলেও তাদের দিকে চেয়ে কোন আশ্বাসই পায় না সে। গাছের বদলে সে মাকে গিয়ে নাড়া দেয়।

পুকুরের অন্যধারে তখনো ড্রিল চলছিল। কাঞ্চন জিগ্যেস করল—"ওরা সব হোল্‌টিয়ার, নয় কি?"

"হোল্‌টিয়ার আবার কী ? ওরা সব সি. আর. দাশের ভলান্টিয়ার।"

একটু ইতস্তত করে কাঞ্চন বললে—"সি. আর. দাশ কে ?"

"সি. আর. দাশকেও জান না বুঝি ?"

কাঞ্চন লজ্জায় চুপ করে রইল। ভদ্রলোক বললেন—"গান্ধীজী যেমন সমস্ত ভারতবর্ষের সি. আর. দাশ তেমনি এই গোটা বাংলাদেশের। তাঁর পুরো নাম হচ্ছে চিত্তরঞ্জন দাশ। খুব বড় ব্যারিস্টার—মাসে ওঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়। দেশের জন্যে সমস্ত ছেড়েছেন। গান্ধীজীর চেয়েও ওঁর ত্যাগ বড়। ওঁর মত বিলাসী লোক বাংলায় ছিল না, বিলেত থেকে ওঁর কাপড় কেচে আসত! দেশের জন্যে সমস্ত ঐশ্বর্য-বিলাস ছেড়েছেন, এখন চটের মত মোটা খদ্দর পরে থাকেন, তাই সবাই ভালবেসে ওঁর নাম দিয়েছে 'দেশবন্ধু'। আর তাঁর নাম শোননি তুমি!"

কাঞ্চন কোন সাড়া দিল না, একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল! মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা! বছরে ছ'লাখ! না জানি সে কত! রাজার ঐশ্বর্য ছেড়ে এক দিনে একেবারে পথের ভিখিরি হয়ে গেলেন দেশের জন্যে! উত্তেজনায় কাঞ্চনের চোখে জল এল। সে শুধু বলল—"আমিও সি. আর. দাশের মত হব।"

"সে তো ভাল কথা। ওদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়ে যাও।"

"ওরা কী করে ?"

"ওরা এই এখন থেকে শুরু করে সমস্ত দিন সারা শহরে প্যারেড করে বেড়াবে। লোককে দেশী জিনিস কিনতে বলবে। চরকায় সুতো কাটে জান তো ?"

"হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ে দু'একজন বুড়ি কাটে।"

"সেই সুতো তাঁতে বুনলে খদ্দর হয়, লোককে সেই খদ্দর পরতে ওরা বলবে।"

"তাহলে তো ভারি মজা!"

"শহরময় ঘোরা আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলা! মজা নয় ?"

"বাঃ, সে তো চমৎকার! আমি খুব ঘুরতে পারি, খুব চেঁচাতে পারি।"

"চেঁচাতেও পার ? তাহলে তো তোমার মধ্যে নেতা হবার লক্ষণ রয়েছে, কালক্রমে হবেও তুমি দেখছি!"

"দেখবেন, আমি সি. আর. দাশের মত বড়লোক হব, আবার তাঁর মত দেশের কাজে সমস্ত ঢেলে দেব।"

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন—"টাকা দেওয়া তো সোজা। দেশবন্ধু শুধু ঐশ্বর্য ছেড়ে বড় হননি, তিনি দেশের জন্য সর্বস্ব দিতেও প্রস্তুত। তুমি দেশের জন্যে সর্বস্ব দিতে পারবে ?"

কাঞ্চন বুক ফুলিয়ে বললে—"নিশ্চয়ই।"

ভদ্রলোক কাঞ্চনের পিঠ চাপড়ে বললেন—"বাঃ, এই তো বাংলাদেশের ছেলে, এই তো চাই! আচ্ছা, আমি চললাম, বেলা হয়েছে। তুমি এই সিকিটা রাখ, তোমার কাছে তো একটিও পয়সা নেই!"

কাঞ্চন মাথা নেড়ে বললে—"কেন আপনি আমার জন্যে খরচ করছেন? আমার পয়সার দরকার নেই।"

"আচ্ছা রাখ তো, বড় হয়ে না-হয় আমাকে শোধ কোরো।"

"তখন কোথায় পাব আপনাকে?"

"আমাকে যদি না পাও, তোমার মত কোন ছোট্ট ছেলেকে সাহায্য কোরো তখন, তাহলেই আমাকে শোধ করা হবে। এই আমার কার্ড, এতে আমার নাম-ঠিকানা আছে। যদি কখনো অসুবিধায় পড়, লোকের কাছে পথ জেনে আমার কাছে এসো। এখান থেকে বেশি দূর নয়। আমি এখন আসি।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন। কাঞ্চন বিস্মিতভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। একবার মনে হল ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়ে তাঁর বাড়ি দেখে আসে। আবার ভাবল, কী জানি, তাহলে হয়ত রাগ করবেন। ভদ্রলোককে তার ভারি ভাল লেগে গেল। দেশের জন্যে সর্বস্ব দেওয়া তো তার পক্ষে কিছুই না, বোধহয় ঐ ভদ্রলোকটির জন্যেও সে সর্বস্ব দিতে পারে। কাঞ্চনও পার্ক থেকে বেরিয়ে প্যারেডের দলে গিয়ে ভিড়ে গেল—তাদের সবার শেষে।

১০

ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে সমস্ত শহরে ঘুরে ঘুরে কাঞ্চনের পা ধরে গেল, আর গলা গেল ভেঙে।

সকালবেলার দিকে যখন প্যারেড শুরু হয়, তখন তার এমন ভাল লাগছিল! লেফট্—রাইট্—লেফট্—তালে তালে পা ফেলে চলতে কী চমৎকার!

কিন্তু এখন মাথার ওপরে সূর্য, রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ—শহরের রাস্তা এমন তেতে উঠেছে যে, পা ফেলা দায়। কাঞ্চনের এখন মনে হচ্ছে—ধুত্তোর! আর কাঁহাতক ঘোরা যায়? এখন একথালা ভাতের সম্মুখে গিয়ে বসতে পারলে হয়! খেয়ে-দেয়ে বিকেলে রোদ্দুর পড়লে আবার না-হয় একচোট লাগা যাবে।

আরো অনেকক্ষণ টহল দিয়ে অবশেষে তারা একটা পার্কের পাশে এসে দাঁড়াল। পার্কের ওপরেই চারতলা প্রকাণ্ড বাড়ি; দেখেই কাঞ্চন বুঝতে পারল, এই বাড়িটাই তাদের আস্তানা। তারই সম্মুখে এসে ক্যাপটেন হুকুম দিলেন—"হল্ট!" তারা দাঁড়াল।

"নাম্বার!"

"ওয়ান্—টু—থ্রি—ফোর—ফাইভ্—সিক্স—সেভেন—এইট—" ভলান্টিয়াররা নম্বর বলে চলল। কাঞ্চনের কোন নম্বর ছিল না, চুপ করে রইল।

ক্যাপটেন প্রশ্ন করলেন—"এ ছেলেটি কে?"

ভলান্টিয়ারদের একজন জবাব দিলে—"ও আমাদের নয়।"

লোহার রেলিং-দেওয়া গেট ঝনাৎ করে খুলে গেল। ক্যাপটেন তাঁর ভলান্টিয়ারদের নিয়ে মার্চ করে ভেতরে চলে গেলেন। গেট আবার ঝনাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল।

কাঞ্চন বাইরে দাঁড়িয়ে গেটের গরাদের ফাঁক দিয়ে ভেতরের লোকজনদের দেখতে লাগল। ভলান্টিয়াররা জুতো-জামা খুলে ফেলে প্রকাণ্ড চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়িয়ে স্নান করছিল। অনেকক্ষণ থেকেই কাঞ্চনের গলা শুকিয়ে এসেছে—এক গেলাস জল কেউ দেয় না? সাহস করে চাইবে? ওদের স্নান করা দেখে তার সমস্ত শরীর যেন তৃষিত হয়ে উঠল।

খানিক বাদে সারি-সারি কলাপাতা পড়ে গেল। ভলান্টিয়াররা খেতে বসল। আঃ, ডালটার কী চমৎকার গন্ধ! ভাত কোনদিনই তার মুখে রোচে না, ভাতের চেয়ে খেজুরগুড়ের পাটালি দিয়ে চিঁড়ে ঢের ভাল; কিন্তু সেই ভাতই যে কত আকর্ষণের বস্তু, আজ তা সে প্রথম অনুভব করল। আঃ, কেউ যদি তাকে একবারটি খেতে বলে! জিজ্ঞাসা করে—'তুমি কি খেয়েছ?' কিংবা 'তুমি কি খাবে?'

কিন্তু সেরকম প্রয়োজনীয় প্রশ্ন কেউই তাকে করল না। একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক ওপর থেকে নেমে এলেন। তৎক্ষণাৎ ওধারের দরজা খুলে একখানা মোটর বেরিয়ে এল। তিনি সেই মোটরে উঠে বসলেন।

ইনি বোধ হয় সি. আর. দাশের দলের একজন হোমরা-চোমরা কেউ হবেন! হয়ত স্বয়ং তিনিই হতে পারেন। এঁরও তো পরনে মোটা খদ্দর। লোকটিকে দেখলে ভক্তি হয়। কাঞ্চন তাঁর কাছে গিয়ে ডাকল—"মশাই, ও মশাই!"

মোটর থেকে মুখ বাড়িয়ে ভদ্রলোক কাঞ্চনকে দেখলেন। কাঞ্চন বললে—"আপনি কি—আপনি কি সি, আর. দাশ?" ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন—"না, না। তুমি কি দাশ-মশাইকে দেখনি? আমি তাঁর দলের একজন। তোমার কী চাই?"

কাঞ্চন বললে—"আমি ভলান্টিয়ার হব!"

ভদ্রলোক কাঞ্চনকে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে বললেন—"আমরা আঠার বছরের নিচে তো ভলান্টিয়ার করি না। তুমি যে বড্ড ছেলেমানুষ!"

"আমি কিন্তু দেশের জন্যে সর্বস্ব দিতে পারি।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন—"বড় হয়ে বরং দিয়ো।" তারপরই মোটর ছেড়ে দিলে।

কাঞ্চন দেখলে, হৃদয়ের দাম ততটা নেই, যতটা দাম বড় হওয়ার। কোনগতিকে এক নিশ্বাসে বড় হওয়া যায় না? কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি দেখে যে,সে হঠাৎ খুব

বড় হয়ে গেছে! ছেলেদের ওপর ভগবানের কী অবিচার দেখ তো! কিছুতেই তাদের তাড়াতাড়ি বড় হতে দেন না! মনে মনে এইরূপ নানারকম দার্শনিক আলোচনা করতে করতে কাঞ্চন পার্কের ভেতরে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল।

পার্কের অন্যধারে টেবিল-চেয়ার সাজানো হচ্ছিল। কাঞ্চন ভাবতে লাগল—মাঠের মধ্যে টেবিল-চেয়ার! ব্যাপার কী? ক্লাস বসবে নাকি? অত্যন্ত ইচ্ছে—ব্যাপারখানা গিয়ে জানে, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এবং পরিশ্রমে সে এতটা অবসন্ন যে, উঠবার উৎসাহ তার আদৌ ছিল না। যাই হোকগে—বসে-বসেই দেখা যাবে এখন।

খানিক বাদে একটা কনস্টেবল এসে তার পাশে বসল। একটু পরেই সে মোটাগলায় গান ছেড়ে দিলে—

"নৌতুন গাসে নৌতুন নৌতুন ফুল ফুটিয়েসে।
আরে—নৌতুন গাসে—"

পাহারাওয়ালায় গান গায়! এই অদ্ভুত দৃশ্যে কাঞ্চনের অত্যন্ত হাসি পেল। হাসি চেপে সে গম্ভীরভাবে বললে—"বাঃ, পাহারাওয়ালা সাহেব, তুমি তো বেশ বাংলা গান গাইছ!"

পাহারাওয়ালা গর্বের সহিত বললে—"হামি আঠ বরেষ বাংলা মুলুকে আসে—বহুৎ বাংলা শিখিয়েসে। হামার হিন্দীমে ভি আচ্ছা গানা আছেন, কিন্তু বাংলা গানাই হামি ভালবাসে।—আরে নৌতুন গাসে নৌতুন নৌতুন—"।

পার্কের দূরবর্তী এক দরজা দিয়ে একদল কনস্টেবল প্রবেশ করল। তাদের আবির্ভাব দেখে এই পাহারাওয়ালার সঙ্গীতচর্চা অকস্মাৎ থেমে গেল।

কাঞ্চনও উঠে পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু নাঃ, তার কিছু খাওয়া দরকার। যা খিদে পেয়েছে! পকেটের সিকিটাকে নাড়তে নাড়তে সে একটা খাবারের দোকানের অন্বেষণে চলল। আহা, সেই লোকটার সন্দেশের দোকান যদি কাছাকাছি কোথাও হয়! কিন্তু চার আনায় কটাই বা হবে? তার সন্দেশের ভারি দাম—কোনটাই চার পয়সার নিচে নয়! আহা, দেবী গাঙ্গুলির দোকানে কী সস্তা! চার আনায় আধসের রসগোল্লা! কেমন বড় বড়, শক্ত—তা খাওয়াও চলে, আবার তা দিয়ে মানুষ মারাও চলে! চার আনার খেলে চারদিন মনে থাকে।

১১

দেবী গাঙ্গুলির রসগোল্লার কথা মনে হতেই কাঞ্চনের জিভে জল এল। বাবা কিন্তু দেবীকে বড় ঠাট্টা করেন। সেবার কালীপুজোর সময় বলেছিলেন—"দেখ দেবী, মাঝে মাঝে একটু রকমফের কোরো। তোমার যা গোল্লা, ও গোলা-বিশেষ—দুর্ভিক্ষে আর রাষ্ট্রবিপ্লবের

কাজে লাগতে পারে ; কিন্তু ভদ্রলোকের পাতে—!" বলে কথাটা শেষ না করেই বাবা যা হেসেছিলেন ! এ কথায় হাসবার কী আছে, কাঞ্চন তা খুঁজে পায় না। বাবার যেমন !

জগদ্ধাত্রী ভোজনাশ্রম

চলতে চলতে আচম্‌কা ওই কথাগুলো দেখে কাঞ্চন থমকে দাঁড়াল। মন দিয়ে সাইন-বোর্ডটা পড়তে লাগল—

"এই যে আসুন। এখানে উৎকৃষ্ট ভাত, ডাল, তরকারি, মাছের ঝোল, ঝাল, অম্বল ইত্যাদি দিবারাত্র পাওয়া যায়।"

বাঃ, এ-ই তো সে খুঁজছিল ! কাঞ্চন আর ক্ষণমাত্র ইতস্তত না করে সটান ভেতরে ঢুকে গেল।

"কত ? তোমাদের এখানে খেতে ক'পয়সা ?"

"তিন আনা। কই, পয়সা দেখি ?"

"দেব, আগে খাই।"

"ও-সব হবেক নাই বাপু—" বলে আশ্রমের মালিক বিড়বিড় করে বকতে শুরু করল ; তার মোদ্দা কথাটা এই যে, ছেলে-ছোকরাদের এইভাবে খাইয়ে অনেকবার সে ঠকেছে, এখন আগে হাতে পয়সা নিয়ে তবে—ধারে সে খাওয়ায় না।

কাঞ্চন তাকে সিকিটা দিয়ে একটা আনি ফেরত নিল। লোকটার বক্তৃতায় সে মনে মনে ভারি বিরক্ত হয়েছিল। আগে তো খেয়ে নিক, তার পরে দেখাবে লোকটাকে ! ঘরের মধ্যে পছন্দমত ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে সে বসে পড়ল। বসতে-না-বসতেই একজন মোটা-সোটা ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন।

"ওহে ছোকরা, ওখানে বসলে যে ? ওটা যে আমার জায়গা !"

কাঞ্চন ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকাল মাত্র, কোন বাঙ্‌-নিষ্পত্তি করল না।

"এ যে নড়েও না, রা-ও কাড়ে না ! ও কিত্তিবাস—কিত্তিবাস !"

আশ্রমের মালিক কৃত্তিবাস উপস্থিত হয়ে সমস্যাটা আগে বুঝে নিল, তার পরে কাঞ্চনকে বললে—"তুমি একটু সরে বস বাপু, ইনি আমাদের বাঁধা খদ্দের—"

"বাঁধা খদ্দের তো অন্য কোথাও বেঁধে রাখগে। আমি নড়ছিনে।"

ততক্ষণে কাঞ্চনের সম্মুখে ভাতের থালা এসে পৌঁছেছে। কৃত্তিবাস চটে বললে—"তুমি থালাটা নিয়ে ওই ধারে বস না কেন ?"

"পয়সার বেলা নগদ, আর বসবার বেলা ধারে ? তা হবে না।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে কাঞ্চন আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে থালার প্রতি মনোনিবেশ করল। অগত্যা ভদ্রলোক কাঞ্চনের দিকে কটমট করে চাইতে চাইতে নিজেই অন্য জায়গায় গিয়ে বসলেন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে কাঞ্চন বেরিয়ে পড়ল। বারটা পয়সা নিয়েছে বটে, তবে নেহাত মন্দ খাওয়ায় নি। যাকগে ব্যাটা, কাঞ্চন ওকে মনে-মনে মার্জনা করে দিল।

ভোজনাশ্রমের পাশেই একটা ওষুধের দোকান—বড় বড় হরফে ইংরিজিতে লেখা **Chemist and Druggist**। দোকানের টেবিলে কাঞ্চন দেখল, সকালবেলার সেই কাগজখানার মত একখানা কাগজ। আজকের খবরটা তো তার পড়া হয় নি! একবার পড়ে দেখলে হত।

সে আস্তে আস্তে দোকানে ঢুকল। টেবিলের ধারে সাহেবি পোশাক-পরা অল্পবয়সী একজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন, তিনি খবর-কাগজ থেকে চোখ তুলে তাকালেন।

কাঞ্চন জিগ্যেস করলে—"আপনি কি ডাক্তার?"

"হ্যাঁ, কী চাই?"

"ওই কাগজখানা একবারটি পড়ব?"

"পড়তে পার।"

"কাগজখানা পড়তে গেলে ওষুধ কিনতে হবে না তো? আমি আগেই বলে দিচ্ছি মশাই, আমার কাছে পয়সা-টয়সা নেই, ওষুধ কিনতে আমি পারব না।"

ডাক্তার বিস্মিতভাবে বললেন—'না-না, ওষুধ কিনতে হবে কেন? কিছু না-কিনেই তুমি পড়তে পার।"

ডাক্তার এতক্ষণ একটু অবাক হয়ে কাঞ্চনকে লক্ষ্য করছিলেন, কাগজখানা তার পড়া শেষ হলে তাকে জিগ্যেস করলেন—"কোন্ স্কুলে পড় তুমি? কোন্ ক্লাসে?"

কাঞ্চন গর্বের সহিত বললে—"আমি পড়ি-টড়ি না।"

"এত বড় ছেলে, স্কুলে পড় না! কী রকম?"

"পড়তুম। স্বরাজের জন্যে ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছি।"

"বটে! মুক্‌খু হয়ে থাকলে স্বরাজ হবে?"

কাঞ্চন প্রশ্নের ধাক্কায় প্রথমটা কাবু হয়ে পড়ল, কী জবাব দেবে ভেবে পেল না; কিন্তু একটু পরেই দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিলে—"নিশ্চয়! মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—বলেছেন—'স্বরাজ মে ওয়েট, বাট—বাট—' কথাটা আমার এখন মনে আসছে না। তার মানেটা এই যে, পড়াশুনার জন্যে অপেক্ষা করা চলবে, কিন্তু স্বরাজের জন্যে আর অপেক্ষা করা চলবে না। বুঝেছেন?"

ডাক্তার হেসে বললেন—"মহাত্মা গান্ধী কোথাও এ-কথা বলেন নি। ওই তো তোমার সুমুখে কাগজ পড়ে আছে, কোথায় বলেছেন, দেখাও দেখি? মহাত্মা গান্ধী নিজে কি মুক্‌খু? সি. আর. দাশ কি মুক্‌খু? ওঁদের মত অতবড় বিদ্বান দেশে খুব কমই আছে, তা জান?"

কাঞ্চন এবার নিরস্ত হয়ে পড়ল।

ডাক্তার বলে চললেন—"মূর্খতার দ্বারা যদি স্বরাজ হত, তাহলে দেশের ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে উনত্রিশ কোটিই তো আকাট, কোন্‌দিন স্বরাজ হয়ে যেত তবে! মুক্‌খু হয়ে থাকলে ভাত আসে, না স্বরাজ আসে?"

কাঞ্চন কি বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে ডাক্তার বললেন—"তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। খবরের কাগজ পড়ে তোমার মাথা বিগড়েছে। যাও, এক্ষুনি ইস্কুলে আবার ভর্তি হওগে, ভর্তি হয়ে তবে অন্য কথা। যাও—এক্ষুনি যাও—যাও!"

ভদ্রলোক যেন কাঞ্চনকে তাড়া করলেন। চমকে উঠে কাঞ্চন চেয়ার ছেড়ে একলাফে একেবারে ফুটপাথে।

কিন্তু ফুটপাথে পড়েই তার মনে হল—ছিঃ! পালানোটা কাপুরুষের লক্ষণ। কাঞ্চনের কোষ্ঠীতে কাপুরুষতা লেখা নেই। সে তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—"পড়ব না আমি! আপনি কী করবেন? আমি ভয় করি নাকি আপনাকে?"

ডাক্তার হো-হো করে হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসিতে অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে কাঞ্চন সে-স্থান পরিত্যাগ করল। পরিত্যাগ করল বটে, কিন্তু ভয় পেয়ে নয়, বীরের মত।

কিন্তু বড় ভাবনায় পড়ে গেল কাঞ্চন। মহাত্মা গান্ধী না-ই বলুন, না-হয় অন্য কেউই বলেছে, তা বলেই তো কথাটা মিথ্যে হতে পারে না! কিন্তু এ ভদ্রলোক যা বললেন, সে কথাগুলোও তো ফ্যাল্‌না নয়! তবে? উল্টো-পাল্টা দু-রকম কথার দুই-ই কি সত্যি হতে পারে কখনো? কোন্‌টা সত্যি তাহলে?

সহসা ফিরিওয়ালার চিৎকারে কাঞ্চনের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল:

"সাবা—ন্‌, তরল আলতা চাই
মাথার কাঁটা, কিলিপ চাই
হেজলিন চাই, পমেটম চাই—"

কাঞ্চন তাকে থামিয়ে জিগ্যেস করলে—"দেখি কী আছে তোমার?"

লোকটা তার বোঁচকা খুলে কাঞ্চনকে দেখাতে লাগল।

"কী চাই আপনার? সব আছে—সাবান, তরল আলতা, কিলিপ, মাথার কাঁটা, সেফটিপিন, মাথার চিরুনি, হেজলিন, হিমানি, প্যাউডার—"

"হ্যাঁ, সমস্তই চাই—আমার মার জন্যে।"

"তা, কোন্‌ বাড়ি বলুন, আমি যাচ্ছি।"

কাঞ্চন গম্ভীরভাবে বললে—"আমাদের বাড়ি? সে আমাদের দেশে।"

লোকটা হতাশ হয়ে বললে—"এখানে বাড়ি নয়? কিনবেন না যদি, তবে কেন আমাকে কষ্ট দিলেন?"

কাঞ্চন আশ্বাস দিয়ে বললে—"কিনব বই কি! মার জন্যে কিনতে হবে—আমাকেই কিনতে হবে, বাবা তো এসব কিনে দেন না কখনো! বাবা বলেন—'এসব বিলাসিতা।' আমি চাই, আমার মা একটু বিলাসিতা করুন। বিলাসিতা করলে মাকে ভাল দেখায়।"

লোকটা কাঞ্চনের কথা শুনে হাসল। বললে—"তুমি তো ছেলেমানুষ! তুমি কী করে কিনবে?"

"কেন? রোজগার করে! আমি তো চাকরি করতেই কলকাতায় এসেছি। তা তুমি তো এই রাস্তা দিয়েই রোজ যাও এই সময়ে—কেমন? প্রথম মাসের মাইনে পেলেই এসব আমি কিনব। কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেব। ডাকে এ জিনিস যাবে না?"

"খুব যাবে। ডাকে কী না যায়! মাশুল বেশি লাগবে কেবল।"

"তা লাগুক। মাশুলের জন্যে আমি কেয়ার করি না! হঠাৎ এসব পেলে মা কীরকম আশ্চর্য হয়ে যাবেন, আমি তাই ভাবছি। সে ভারি মজা হবে।"

লোকটা আবার হাঁকতে হাঁকতে চলে গেল। কাঞ্চন সেই ভারি মজার দৃশ্যটা একবার মানসচক্ষে নিরীক্ষণ করে নিল। পিয়ন ব্যাটা মস্ত এক পার্সেল নিয়ে হাজির হয়েছে তাদের বাড়িতে। কিসের পার্সেল? কার নামে?

বাবা ছুটে বেরিয়েছেন। উঁহু—বাবার নামে তো নয়, মার নামে। মার নামে এত বড় পার্সেল! বাবার মুখ তখন চুন। তাদের বাড়ি এত বড় পার্সেল কখনো আসেনি। আর যদিই বা অবশেষে একদিন এল, তাও এল কিনা মার নামে! মনে মনে ভারি হিংসে হয়েছে বাবার। যেমন হিংসে, তেমনি হয়েছে কৌতূহল!

বাবা পিয়নকে তাড়া দিচ্ছেন—"দাও না আমাকে! আমারই তো বৌ—তারই এসেছে, আমাকে দিতে দোষ কী?" পিয়ন বলছে—"উঁহু, হুকুম নেই। রেজেস্টারি কিনা, মার সই চাই।"

মা তো অবাক! যা কক্‌খনো আসে না, আসার কল্পনাও তাঁর স্বপ্নে নেই, তাই কিনা এল তাঁরে নামে! কী আছে না-জানি ওর মধ্যে! কেই বা পাঠিয়েছে, কে জানে!

সই দিয়ে পার্সেল নিয়ে খুলে দেখেন—ওমা, এ যে সাবান, তরল আলতা, মাথার কাঁটা, কিলিপ, সেফটিপিন, হেজলিন, পাউডার, পমেটম—আরো কত কী! কেবল বিলাসিতা আর বিলাসিতা!

কে পাঠালে? মা যখন ভাববেন—কে পাঠালে! আঃ, তখন কী মজাই না হবে!

নাঃ, একটা চাকরির যোগাড় করতে হল তাকে। তা না হলে কিচ্ছু হচ্ছে না।

ও বাবা! এ আবার কী! এত জল হঠাৎ কোত্থেকে! এ যে দেখি পাইপে করে রাস্তায় জল দিচ্ছে—ভারি চমৎকার তো! কিন্তু আর একটু হলেই তো ভিজে গিয়েছিল আর-কি!

যদি ঘুরিয়ে না নিত, তাহলেই নেয়ে উঠতে হত আর-কি ! একটা লোক রাস্তার মুখে পাইপ এঁটে দিচ্ছে, আর একজন কত কায়দায় জল ছড়িয়ে যাচ্ছে। কাঞ্চন জল দেওয়া দেখতে দেখতে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল।

কাঞ্চনের হঠাৎ মনে হল—এ তো বেশ কাজ! এ-কাজ করলে হয় না ? এ তো কাজ নয়, কাজ-কাজ খেলা।

যদি এ-কাজ পায় সে, খুব কষে রাস্তায় জল দেয়—দিনরাতই জল দেয়—শহরের সব রাস্তায়। পাইপে করে জল ছিটোনোয় নিশ্চয়ই খুব আরাম!

যে লোকটা জল দিচ্ছিল, কাঞ্চন তাকে জিগ্যেস করলে—"তোমার তো বেশ কাজ হে! তুমি কি দিনরাতই রাস্তায় জল দাও ?"

"দু'বার দিতে হয় বাবু, খুব ভোরে আর বিকেলে।"

"বাঃ, বেশ তো! তা ক'টাকা পাও এজন্যে ?"

"বেশি না বাবু, মোটে আঠারো টাকা।"

কাঞ্চন অবাক হয়ে বললে—"আ-ঠা-রো টা-কা! সে যে অনেক !"

"অনেক কী বাবু! ওই ক'টা টাকায় আমাদের কি চলে! আমাদের পোষায় না ওতে।"

"তা, এ-কাজ কোথায় পাওয়া যায় ?"

"মুন্সিপালিতে।"

"সে কোথায় ? আমাকে কাল নিয়ে যাবে ?"

"খুব! কাল এখানে দাঁড়িয়ে থেকো, এমন সময়ে আমরা জল দিতে আসব, সেইখানে নিয়ে যাব।"

"শুধু নিয়ে গেলে হবে না, আমাকেও এই কাজ একটা দিতে হবে। আমিও জল দেব রাস্তায়।"

"কাজ দেবার মালিক কি আমরা বাবু? কাজ দেন বড় সাহেব।"

"বেশ, তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেয়ো, কেমন ?"

"আচ্ছা।"

লোকদুটো জল দিতে দিতে চলল, কাঞ্চন আর তাদের সঙ্গে গেল না। সে পরিশ্রান্ত হয়ে রাস্তার একধারে বসে তার আসন্ন এই চমৎকার চাকরির কথাটা ভাবতে লাগল। আঃ, রাস্তায় জল দিতে কী ফুর্তি। এই বোধহয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ! আঠারো টাকাও কম টাকা নয়, ওতে বোধহয় ওই লোকটার বোঁচকার সমস্ত জিনিস কেনা যায়!

সেখান থেকে সামান্য দূরে বড় রাস্তার মোড়ে একটা পোড়ো জমিতে অনেক লোক জমেছিল—জনতার বৃত্তাকার ক্রমশ বড় হয়ে উঠছিল। কাঞ্চনের দৃষ্টি ও পা সেইদিকে

আকৃষ্ট হল। অতি কৌশলে এবং কষ্টে সে সেই সঙ্ঘবদ্ধ লোকগুলোর ভেতর দিয়ে গলে একটা ভাল জায়গা দখল করে বসল।

বৃত্তাকারের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে মড়ার খুলি, হাড়-গোড় এবং আরো হরেকরকম জিনিস। একজন আলখাল্লাপরা লোক আগড়ম-বাগড়ম মন্ত্র আউড়ে ভেল্কি দেখাচ্ছিল। কাঞ্চন ভাল হয়ে জমে বসল।

যে-সে ভেল্কি নয়—ভানুমতির ভোজবাজি! আলখাল্লাপরা লোকটা বক্তৃতা দিচ্ছিল যে, পেশাদার ম্যাজিকওয়ালাদের সাধ্য নেই যে তার মত খেলা দেখায়। এমন খেলা পৃথিবীতে কেবল একজন মাত্র জানে এবং সেই একজন হচ্ছে সে নিজে। তার কথায় কাঞ্চনের দৃঢ় বিশ্বাস হল।

একটা ছোট ছেলেকে বেঁধে-ছেঁদে একটা বড় চুপড়ির মধ্যে পুরে ডালাটা বন্ধ করা হল, তারপরে চুপড়িটাকে দড়ি দিয়ে ভাল করে বাঁধা হল।

ভেল্কিওয়ালা প্রশ্ন করলে—"ভেতরে আছিস তো?"

ছেলেটা ভেতর থেকে সাড়া দিল। তারপরে ভেল্কিওয়ালা একটা প্রকাণ্ড ছোরা নিয়ে নির্দয়ভাবে ডালাটার ভেতর খোঁচাতে লাগল। কাঞ্চনের সমস্ত আত্মা আঁতকে উঠল—ছেলেটা মারা যাবে যে! তারপরে চুপড়ি খুলে দেখা গেল, ছেলেটা তার মধ্যে নেই, সে জনতার ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল কাঞ্চনের পাশ দিয়ে।

কাঞ্চন তো অবাক! এ-রকম দৃশ্য সে জীবনে কখনো দেখেনি। তখন ভূমিকম্প শুরু হলেও সে টের পেত কি না সন্দেহ।

লোকটা একটা আমের আঁটি পুঁতল, দেখতে দেখতে সেটা হয়ে দাঁড়াল একটা আমের চারা। দেখতে দেখতে তাতে ফল ধরল। একেবারে একটা আস্ত পাকা আম। ভেল্কিওয়ালা আমটা কেটে জনতাকে পরিবেশন করতে গেল, কিন্তু ভেল্কির আম খেতে কারুর সাহস হল না। কাঞ্চন একটুকরো খেয়ে দেখল—সত্যি, একেবারে আসল আম! অবাক কাণ্ড!

১২

তারপরে তাসের ম্যাজিক—আরো কত কী! দেখতে দেখতে অনেক রাত হয়ে গেল। এইবার লোকটা সবার কাছে একটা করে পয়সা চাইতে লাগল। অনেকে দিল, অনেকে দিল না। লোকটা কাঞ্চনের কাছে কিছু চাইল না, চাইলে বোধহয় সে আনিটা দিয়ে দিত।

খেলা ভেঙে গেলে সবাই চলে গেল। ভেল্কিওয়ালা তার জিনিসপত্র গুছোতে লাগল—তার ছেলে তাকে সাহায্য করছিল। কাঞ্চন তাকে গিয়ে জিগ্যেস করলে—"আমাকে নেবে তোমার দলে? আমি ম্যাজিক শিখব।"

ভেল্কিওয়ালা বললে—"বেশ, শেখাব তোমাকে। আমার সঙ্গে যাবে?"

কাঞ্চন উৎসাহিত হয়ে বললে—"এক্ষুনি !"

লোকটা বললে—"তোমাকে এই পোশাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আমাকে পুলিসে পাকড়াবে। তোমায় জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি-পিরান পরতে হবে—পারবে তো ?"

"খুব। দাও না একটা লুঙ্গি, আমি এক্ষুনি পরছি।"

"এখন নয়। এখানে লোকজন তোমাকে পরতে দেখবে। কাল সকালে আমার আস্তানায় যেয়ো। এই রাস্তা ধরে সোজা গেলে সিঁদুরিয়াপটি ; সেখানে ইউসুফ ভেল্কি-ওয়ালার নাম করলেই লোকে দেখিয়ে দেবে। কাল সকালে যেয়ো।"

লোকটা চলে গেল। কাঞ্চন তাকে জানাল যে, কাল ভোরে সে নিশ্চয়ই যাবে।

সামনের দোকানের ঘড়িতে কাঞ্চন দেখল—এগারোটা। ওঃ, অনেক রাত হয়ে গেছে ! এ পর্যন্ত সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছিল। উদরের মধ্যে একটা তীব্র ক্ষুধার প্রেরণা এতক্ষণ পরে সে অনুভব করল। অবিলম্বেই কিছু খাওয়া তার দরকার।

একটা মিঠাইওয়ালার দোকানে গিয়ে সে বললে—"ওগুলো কী তোমার ? লুচি তো ? দাও না চার পয়সার।"

"পুরি নেহি—উ কচৌরি।"

"দাও, কচৌরিই দাও চার পয়সার।"

মিঠাইওয়ালা তাকে একটা ঠোঙায় করে দু'খানা কচুরি আর একটুখানি আলুর তরকারি দিল। তারপর আনিটা হাতে নিয়ে জিগেস করলে—"তুমি হিন্দু ?"

"হ্যাঁ।"

ঠোঙাটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আনিটা ফেরত দিয়ে বললে—"ই আনি নেহি চলেগা। সিসা হায়।"

"বা-রে !" কাঞ্চনের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না।

"ঠক্লানেকো জায়গা নেহি মিলা ?" বলে মিঠাইওয়ালা তাকে অনেক গালমন্দ দিল। একমুহূর্তে চারধারে অনেক লোক জমে গেল। একে দারুণ ক্ষুধা, তার ওপরে এত লোকের সামনে অপমান—কাঞ্চনের চোখ ফেটে জল আসবার মত হল। সে আর সেখানে দাঁড়াল না।

খাওয়া না-হয় না-ই হল, শোয়া তো দরকার ; কিন্তু কোথায় শোবে ? এত রাতে কার বাড়ি আশ্রয় পাবে ? তা ছাড়া খাদ্যই হোক, আর স্থানই হোক—কিছু ভিক্ষে করতে তার ভারি লজ্জা করে। "আমাকে কিছু খেতে দেবে ?"—এ-কথা মুখ ফুটে বলতে তার মাথা কাটা যায়। সে ভাবলে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেই আজ রাতটা কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু ঘোরেই বা আর কতক্ষণ ? আজ সকাল থেকে সমস্ত দিনটাই তো ঘুরছে, তা ছাড়া ঘুমে তার সমস্ত শরীর যেন ঝিমঝিম করছিল।

কাঞ্চন দেখল, দু'ধারের ফুটপাথে বিস্তর লোক শুয়ে আছে। যতদূর সে হাঁটল, দেখল কেবল লোক আর লোক। এদের বোধহয় ঘর-বাড়ি নেই—এরা বোধহয় পথে শুয়েই জীবনটা কাটায়। সেও কেন না ফুটপাথে শোবে ?

কাঞ্চন একটা জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল, কাল রাত্রে বিয়ে বাড়িতে কী আরামেই না কেটেছে! আর আজ এই ফুটপাথে!

"এ কে এখানে ?"

একজন ভদ্রলোক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, কাঞ্চনকে সেখানে শয়ান দেখে বিস্মিত হয়ে এই প্রশ্ন করলেন।

কাঞ্চন ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলে—"আমি।" তার কথোপকথনে বিশেষ উৎসাহ ছিল না।

"তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, এখানে শুয়ে ? এস, আমার সঙ্গে এস।"

অগত্যা কাঞ্চন উঠল। বললে—"কোথায় শোব ? আমার শোবার জায়গা নেই।"

"রাস্তায় যত ছোটলোক শোয়, তাদের সঙ্গে—ছিঃ! তুমি এস আমার সঙ্গে।"

কাঞ্চন ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে চলল। যাক, তাহলে সত্যিই ভগবান আছেন! একটু আগেই ভগবানের ওপর তার যা অভিমান হচ্ছিল! এই তো তিনি আজ রাত্রের মত খাবার ও শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন!

আর কতদূর হাঁটতে হবে ? ভদ্রলোকের বাড়ি কতদূর আর ? কাঞ্চনের পা আর চলে না; তবু গরম ভাত আর উষ্ণ বিছানার লোভে কোনরকমে সে হাঁটছিল। ভদ্রলোক যা তাড়াতাড়ি চলেন! কাঞ্চনকে তাঁর সঙ্গে প্রায় দৌড়োতে হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা পার্কের কাছাকাছি এসে ভদ্রলোক থামলেন। বললেন—"পার্কের গেট যে বন্ধ দেখছি। যাক গে, তুমি টপকে যাও।"

"টপকে! কেন ?" কাঞ্চন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভদ্রলোক আবার বললেন—"ভেতরে যাবে কী করে ? গেট যে বন্ধ! টপকে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওঠ, আমি ধরছি তোমাকে।"

রেলিং-এর ওপর দিয়ে কাঞ্চনকে পার্কের ভেতরে নামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—"ওই যে সব ভেতরে বেঞ্চি দেখছ, ওই বেঞ্চিতে গিয়ে শুয়ে থাক। কোন ভয় নেই, কেউ কিচ্ছু বলবে না।"

ভদ্রলোক চলে গেলেন। কাঞ্চন অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পার্কের ভেতরের পুকুরে গিয়ে একপেট জল খেল। খেয়ে বেঞ্চিতে এসে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল—

কালকের ভোজটা কেমন!

মিনি মেয়েটা বেশ—কিন্তু তার ছোড়দা—
সি. আর. দাশ—সিল্কের চাদর—পকেট-কাটা—
মামলেট—হাওড়া স্টেশন—টিঞ্চার আইডিন—
তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

১৩

"ওহে, ওঠ, ওঠ; এটা ঘুমোবার জায়গা নয়! আরে, এর ঘুম যে ছাই ভাঙেই না, কোথাকার আপদ!"

কাঞ্চন তখন প্রকাণ্ড একটা ভোজে বসে গেছে। লুচি, পোলাও, পায়েস, সন্দেশ—নানাবিধ খাদ্য। পরিবেশন করছে আবার মিনি। কিন্তু খাবারও যেমন ফুরোয় না, তার খাওয়াও তেমনি শেষ হয় না!

কিন্তু প্রচণ্ড তাড়নায় তাকে চোখ খুলতে হল।

"বাব্বাঃ! কী ঘুম তোমার! কুম্ভকর্ণকেও হার মানায়!"

কাঞ্চন দেখল, সকাল হয়ে গেছে, রোদ উঠেছে এবং তার অব্যবহিত সামনে একজন বৃদ্ধ লোক অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকছেন। চোখ রগড়ে উঠে সে বেঞ্চির একধারে বসল।

ভদ্রলোক বলে চলেছেন—"সকালে কি পড়ে পড়ে ঘুমোয়? ভোরে ধীরে হাওয়া বয়, গায়ে লাগলে জোর বাড়ে। আজকালকার ছেলেরা যেন কী! আমার পঁয়ষট্টি বছর বয়স, সেই প্রত্যুষে উঠে বেরিয়েছি, আর এইসব জোয়ান ছোকরা কোথায় মাঠে ছুটোছুটি করবে, না—"

কাঞ্চন তাঁর বকুনি থেকে পরিত্রাণ পেতে সেখান থেকে উঠে পুকুরে মুখ ধুতে গেল।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ঘাটের পইঠা থেকে একদৌড়ে কাঞ্চন একেবারে ফুটপাতে। কাল যাদের সঙ্গে কাঞ্চন প্যারেড করেছিল, সেই দলটাই—কিন্তু এবার তাদের আগে ও পেছনে অনেক কনস্টেবল।

"বাঃ, আজকে যে দেখছি পুলিসরাও ওদের সঙ্গে মার্চ করছে! ওরাও গান্ধীর দলে ভিড়ে গেল নাকি?"

"না হে, না, ওদের ধরে নিয়ে চলেছে থানায়।"

কাঞ্চনের প্রশ্নের জবাব যে দিল, সেও ছেলেমানুষ; তার চেয়ে দু'চার বছরের যদি বড় হয়।

কাঞ্চন তাকে জিগ্যেস করলে—"থানায় নিয়ে চলেছে? তুমি কী করে জানলে?"

"আমি জিগ্যেস করলুম যে। ওর মধ্যে আমার বন্ধু আছে, ওই যে মাঝখানে, গায়ে

লাল খদ্দর, ও-ই। আজ খুব ভোরে কংগ্রেস-আপিসে খানাতল্লাসি হয়ে গেছে, ওদের সবাইকে গ্রেপ্তার করেছে।"

"ওদের থানায় নিয়ে গিয়ে কী করবে?"

"জেলে দেবে।"

"জেলে? তাহলে তো ভারি বিপদ! আমি শুনেছি, জেল ভারি খারাপ জায়গা, ভারি ভয়ের!"

"কেন, আমি তো জেলে ছিলুম, কাল সন্ধ্যায় ছাড়া পেয়েছি।"

কাঞ্চন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল—এ ছেলেটা বলে কী? তারা দুজনে পার্কের মধ্যে এসে নরম ঘাসের ওপর এক জায়গায় বসল। ছেলেটা তার কারাবাসের কাহিনী বলে চলল, কাঞ্চন হাঁ করে শুনতে লাগল। সেই জেলে আগে সব চোর-ডাকাত, খুনে বদমায়েশ থাকত, তাদের সব জেল খালি করে মফঃস্বলের জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে, এখন কেবল কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার—তারাই থাকে।

গল্প চলে, কাঞ্চন আর বিস্ময় চেপে রাখতে পারে না, সে বলে উঠল—"বল কী? একটা গোটা নিমগাছ সবাই মিলে দাঁতন করে ফেলল!"

"ফেলবে না? আমরা চার হাজার লোক আছি যে, তার মধ্যে ছেলে-ছোকরাই বেশি। সকালে ঘুম ভাঙলেই সবাই নিমগাছে উঠে বসি—আমাদের দাঁতন করতে হবে তো!"

"তা বলে—একটা গোটা নিমগাছ?"

"চার হাজার লোক দাঁতন করলে একটা নিমগাছ আর ক'দিন টেঁকে?"

"ভারি আশ্চয্যি তো!"

কাঞ্চন মনে-মনে ভাবে, কিন্তু ভাব-প্রকাশের ঠিক কথাটি খুঁজে পায় না। অনেকক্ষণ পরে কথাটা পেয়ে অন্য গল্পের মাঝখানেই বলে ওঠে—"কিন্তু, তার শাখা-প্রশাখা, সব-সমেত?"

গল্পে বাধা পড়ায় এবার ছেলেটা একটু বিরক্ত হয়। বলে—"বড়-বড় শাখা-প্রশাখা কি আর! গুঁড়িটাও বাদ।"

ছেলেটা বলে চলে—"সমস্ত দিন আমরা হৈ-চৈ আর ফুর্তি করে ঘুরে বেড়াই—অবিশ্যি জেলের মধ্যে। বাইরে তো যেতে দেয় না। আর রাত্রে কেবল ঘরে পুরে রাখে। আমরা থাকি একধারে, আর দাশমশাই থাকেন আরেক ধারে!"

সি. আর. দাশ! তিনিও জেলে? কাঞ্চনের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ছেলেটা চলে গেলে কাঞ্চন নরম ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ তার কথাগুলো ভাবতে থাকে।

কিন্তু চিন্তা করা কাঞ্চনের পোষায় না, বিশেষত পেটের মধ্যে খিদে নিয়ে। কাল রাত্রে

যে খাওয়া হয়নি, এত বড় কথাটা এমন গল্পের মধ্যিখানে এতক্ষণ কাঞ্চনের মনে পড়েনি, কিন্তু সেই কথাটাই এখন তার উদরের মধ্যে একমাত্র কথা হয়ে উঠল।

আচ্ছা, জেলখানায় খেতে দেয় তো? খেতে দেয় নিশ্চয়, নইলে লোকগুলো কেবল নিমগাছের ছোটখাট শাখা-প্রশাখা চিবিয়েই কিছু আর বাঁচে না।

কিন্তু জেল তো পরের কথা, কী খেয়ে আপাতত বাঁচে কাঞ্চন!

কী করে কাঞ্চন—কোথায় যায়? কাল সকালে যে চমৎকার ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার কথা কাঞ্চনের মনে পড়ল।

ভদ্রলোক বলেছিলেন—"এই আমার কার্ড রাখো, এতে আমার নাম ঠিকানা আছে। কখনো অসুবিধায় পড়লে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।"

কাঞ্চন ভেবে দেখল, আজকের এই অবস্থাটাকে অসুবিধাই বিবেচনা করতে হবে। খালি পেটে থাকার চেয়ে মারাত্মক অসুবিধা আর কী হতে পারে? এরকম অসুবিধায় কাঞ্চন এর আগে আর কখনো পড়েনি। বাড়িতে হলে এতক্ষণে তার তিনবার খাওয়া হয়ে যেত।

কিন্তু সেই কার্ডখানা? পকেটেই তো ছিল—কিন্তু কই? যাঃ, হারিয়ে গেছে! তাহলে আর যাবে কী করে? উৎসাহে কাঞ্চন উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার মুহ্যমান হয়ে বসে পড়ল।

পেটের মধ্যে যেন ছুঁচ ফুটছে!

মিনিদের বাড়ি যাবে? সেখানে হয়ত আজ বৌভাত, আজও খুব খাওয়া-দাওয়া। সেখানে গেলেই তো হয়। সেই বেশ। তাদের বাড়ি চিনে যাওয়া বোধহয় খুব শক্ত হবে না।

মিনিদের বাড়ির দোরগোড়ায় সেই এঁটোপাতার জঞ্জাল! ভিখিরিরা তার থেকে লুচি, তরকারি, সন্দেশের টুকরো বেছে জড় করছে। সেই স্তূপীকৃত ভুক্তাবশেষ কাঞ্চন মানসচক্ষে দেখতে লাগল।

আর যদি সেখানে আজ বৌভাত না থাকে? না-ই থাকল কোন ভোজ, সে মিনিকে ডাকবে। ডেকে বলবে তাকে। মিনি তার ছোড়দার মত কি ভোম্বলের মত নয়, সে নিশ্চয় তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াবে। মিনি তার চওড়া বুকের প্রশংসা করে। মিনিকে সে পাঞ্জা কষতে শিখিয়ে দেবে, ছেলেদের জব্দ করার আরো যতরকম প্যাঁচ আছে, সব শিখিয়ে দেবে, হ্যাঁ!

মিনির কাছে গিয়ে যদি তাকে শেখানোর এই প্রস্তাব করে, তাহলে সে নিশ্চয়ই ভারি খুশি হবে। তাকে নিশ্চয়ই বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাবে, তাদের মার কাছে। তাদের মা না-জানি কী রকম! তার মার মত কি? খেতে চাইবে না, কিন্তু না চাইলেও মিনি জোর করে তাকে খাওয়াবে নিশ্চয়।

হ্যাঁ—তাই তো! ঠিকই হয়েছে তবে। আজ সকালেই তো সে স্বপ্ন দেখেছে যে, মিনি তাকে খাওয়াচ্ছে! মা বলেন—ভোরের স্বপ্ন ভারি সত্যি হয়।

কাঞ্চন উঠে দাঁড়ালো, স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে তিলমাত্র বিলম্ব তার আর সইছিল না। সে পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়ল।

১৪

কিন্তু কোথায়? এ-রাস্তা, ও রাস্তা, কত রাস্তা ঘুরল, মিনির বাড়ির মত বাড়িও দু'চারটে তার চোখে পড়ল, কিন্তু সেগুলো মিনির বাড়ি নয়। কলকাতার পথের মত বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে বোধহয় আর দ্বিতীয় নেই। এমনকি, স্বপ্নের প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত তার টলে গেল। কলকাতা জায়গাটা বোধহয় সৃষ্টিছাড়া, এখানে কারুর স্বপ্ন বুঝি ফলে না।

অনেক ঘুরে অবসন্ন হয়ে অবশেষে একটা জলের কলের কাছে দাঁড়িয়ে কাঞ্চন ধুঁকতে লাগল। যা তেষ্টা পেয়েছে, এক বালতি জল এক নিশ্বাসে উড়িয়ে দিতে পারে! রোদে ঘুরে জল খাওয়া মার বারণ, মা বলেন—জিরিয়ে খাবি। কে যেন কবে ভয়ঙ্কর গরম থেকে এসে ঠাণ্ডা জল খেয়ে হঠাৎ সর্দি-গর্মি হয়ে মরেছিল, তাই থেকে মার ভারি ভয়। পাছে কাঞ্চন কোনদিন তাঁর এই নিষেধ অমান্য করে, এইজন্যে তিনি তাকে গা ছুঁইয়ে দিব্যি করিয়ে নিয়েছেন। কাজেই কলের সন্নিকটে রোদে দাঁড়িয়েই কাঞ্চন বিশ্রাম করতে লাগল। দিব্যি না মানলে মা মরে যায় যদি।

কিছুক্ষণ পরে যখন কাঞ্চনের মনে হল যে যথেষ্ট জিরোনো হয়েছে এইবার জল খাওয়া যেতে পারে, তখন সে কল টিপতে গিয়ে দেখে, একি! কল থেকে যে জল পড়েই না! আরো জোরে, আরো প্রাণপণ করে টেপে—নাঃ, একফোঁটাও না! এ কী হল! একজন লোককে ডেকে বললে—"ভাই, কলটা একটু টেপো না!"

সে উত্তর দিলে—"টিপে কী হবে? আর কি জল পড়বে? এগারোটা বেজে গেছে যে! জল আসবে আবার সেই তিনটেয়।"

অ্যাঁ! জলও খেতে পাবে—সেই তিনটেয়?

সেই পার্কের ভেতরে একটা পুকুর আছে বটে, কিন্তু রাস্তা চিনে কি সেই পার্কে পৌঁছতে পারবে? কলকাতার পথকে তার আর বিশ্বাস হয় না। কাঞ্চনের মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে।

দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই, হাঁটতেই হবে। সেই পুকুর—তার আগে, ও তিনটের আগে কোথাও জল নেই।

কিছুদূর গিয়ে দেখে—আঃ, এই তো জল রয়েছে! রাস্তার ধারে লোহার চৌবাচ্চায়

চমৎকার জল। জল খেতে যাবে, এমন সময় একজন পাহারাওয়ালা এসে তাকে বাধা দিলে। মানুষের জন্যে এ জল নয়, ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়ার জন্যে।

লোকটা বলে কী? ঘোড়ার জন্যে জল আছে, আর মানুষের জন্যে নেই?

কাঞ্চন আর দাঁড়াতে পারে না, মাটিতে বসে পড়ে।

সামনে একটা ছোটখাট মুদির দোকান, দোকানদার কাঞ্চনকে ডাকলে—"খোকা, এখানে এসে জল খেয়ে যাও। খুব তেষ্টা পেয়েছে, না? না না, ঘটি নয়; তোমরা কি? কায়স্থ? তা হোক, তোমার হাত ভারি নোংরা! বলছ—আলগোছে খাবে? তা কেন, তুমি হাত পাতো, আমি ঢেলে দিচ্ছি।"

যে নোংরা হাত ঘটিতে দেবার পক্ষে অনুপযুক্ত, সেই নোংরা হাতে আকণ্ঠ জল খেয়ে কাঞ্চন অনেকখানি সুস্থ হল; তার মুখ থেকে কথা বেরুল।

"বাঃ, তোমার দোকানে ছাতুও আছে দেখছি যে!"

"তোমার চাই?"

"হ্যাঁ।"

হ্যাঁ তো বলল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মুখ চুন হয়ে গেল! তার অনুৎসাহ দেখে দোকানী প্রশ্ন করলে—"ক' পয়সার চাই তোমার?"

"পয়সাই যে নেই আমার কাছে! শুধু একটা আনি আছে, তাও আবার অচল।"

"দেখি আনিটা! হ্যাঁ, অচলই বটে, তবে আমার কাছে চলে যাবে। এর বদলে তোমাকে দু'পয়সার ছাতু দিতে পারি।"

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে কাঞ্চন বললে—"তাই দাও।"

একটা শালপাতায় তেল-নুন-লঙ্কা দিয়ে মাখা সেই ছাতু প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারের পর কাঞ্চনের কাছে সে রাত্রের সেই বিয়ে-বাড়ির ভোজের মতই উপাদেয় মনে হতে লাগল।

আহার সমাধা করে আর একঘটি জল খেয়ে কাঞ্চন দোকানীকে জিগ্যেস করলে—"কাছাকাছি কোথাও পার্ক আছে, বলতে পার?"

"হ্যাঁ, এই রাস্তা দিয়ে নাকের সোজা বরাবর চলে যাও, মির্জাপুর পার্ক পাবে। কেন, পার্ক কী জন্যে?"

"খাওয়া তো হল, এইবার একটি তোফা ঘুম দিতে হবে। কাল থেকে বড্ড হাঁটছি কিনা, আজ তার তা নয়।"

"তুমি দেশ-পাড়াগাঁ থেকে এসেছ? একলা বুঝি—"

কাঞ্চন দোকানীর অনধিকার চর্চায় প্রশ্রয় দেওয়া আদৌ সঙ্গত মনে করল না, তার কৌতূহলের কোন জবাব না দিয়ে সে নাকের সোজা চলতে শুরু করে দিল।

পার্কে গিয়ে একটা ছাতওয়ালা পরিষ্কার বেঞ্চি দেখে শুয়ে পড়ল সে।

যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন ভারি শোরগোল। সমস্ত পার্ক লাল-পাগড়িতে ভর্তি। কি ব্যাপার? মিটিং হচ্ছে নাকি? একধার থেকে সব গেরেপ্তার করছে বুঝি? কাঞ্চন তটস্থ হয়ে উঠে বসল। প্রথমেই তার মনে হল পালাবার কথা; কিন্তু পালাতে হল না, পার্কের ভেতর যে লোকজন ছিল, পাহারাওয়ালারা তাদের বের করে দিচ্ছিল। কাঞ্চনকে বেরিয়ে যেতে হল।

পার্কের চারপাশের রাস্তায় বেজায় লোকের ভিড়। চারধারেই লোক জমে গেছে; তাদের কারুর বিস্ময়, কারুর উন্মাদনা, কারুর বা শুধুই কৌতূহল।

একটু পরেই ঘটনাস্থলে ঘোড়ার পিঠে চেপে সার্জেন্টরা এসে পড়ল। এসেই তারা লোক হটাতে আরম্ভ করে দিল। ঘোড়াদের এবং সোয়ারদের দেখেই জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য জেগেছিল, সেই চাঞ্চল্য ক্রমে আন্দোলনে পরিণত হল এবং সেই আন্দোলন অকস্মাৎ বেগবান হয়ে উঠল—অর্থাৎ সোজা কথায় জনতা প্রস্থানোদ্যত হল।

বাবা বলেন—"শতহস্তেন বাজিনঃ।" চাণক্য ঋষি নাকি বলে গেছেন—"ঘোড়া থেকে একশো হাত দূরে থেকো।" চাণক্য ঋষি বোধহয় এইসব ঘোড়াদের মানসচক্ষে দেখেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকবেন—তা না হলে ঘোড়া থেকে একশো হাত কেন একহাত দূরে থাকাও কাঞ্চন কোনদিন প্রয়োজন মনে করেনি; এমনকি ঘোড়া দেখলে তার পিঠের ওপরে থাকাই সে বাঞ্ছনীয় মনে করেছে। কিন্তু তাদের দেশের ঘোড়া আর এইসব হাতির মত উঁচু ঘোড়া—এ তো ঘোড়া নয়, ঘোটক!

মা অবশ্যি শ্লোকটার অন্যরকম ব্যাখ্যা করতেন, বলতেন—"যেখানে বাজি পোড়ানো হবে, সেখান থেকে একশো হাত দূরে থাকবি।" কাঞ্চন চিরদিনই ঘোড়ার সম্মুখে মার ব্যাখ্যাটা, আর বাজির সম্মুখে বাবার ব্যাখ্যাটা বেশি পছন্দ করেছে; কিন্তু আজকের এই সঙ্কট মুহূর্তে সে বাবার ব্যাখ্যাকেই যুক্তিসঙ্গত মনে করল।

কিন্তু, পালাবেই বা কোথায়? একশো হাত ফাঁকা জায়গাই কি আছে? গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি। কাঞ্চন হতাশ চোখে চারদিকে চেয়ে দেখল, মহর্ষি চাণক্যকে অনুসরণ করবার কোন উপায়ই নেই।

কিন্তু ঘোড়ারা এদিকপানে এসে পড়তেই অকস্মাৎ সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, সেই জমাট জনতা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ছুটতে লাগল। কাঞ্চন দেখল, আর সবার বাবাও ছেলেদের চাণক্য ঋষির উপদেশ দিয়ে রেখেছেন, অতএব ভরসা আছে। কাঞ্চনকে আর কষ্ট করে পা-ও চালাতে হল না, আগের এবং পেছনের চাপে মাটিতে পা না ঠেকিয়েও সে অনেকটা পেরিয়ে এল।

আকাশে হাঁটার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। যখন মাটিতে তার পা ঠেকল, তখন সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল—ঘোড়ারা সব ফিরে গেছে এবং জনতাও ছত্রভঙ্গ।

এতদিনে বাবার একটা কথার মানে বুঝল কাঞ্চন। পুজোর সময় হলেই বাবা পাজি দেখতেন, আর মাথা নাড়তেন—"দেবীর এবার ঘোড়ায় আগমন! ফল—ছত্রভঙ্গ! ছত্রভঙ্গস্তরঙ্গমে!" তখন কাঞ্চন ভাবত, এবার পুজোয় তাকে নতুন ছাতা না দেবার মতলব। তাই এত ছাতা-ভাঙার অজুহাত। দেবী ঘোড়ায় এলে তার ছাতা ভাঙে কী করে, এটা কাঞ্চন কিছুতেই বুঝতে পারেনি—কিন্তু এখন সে দেখল যে, ঘোড়ার হাতে পড়লে ছাতা কেন, মাথাও ভাঙা সম্ভব। আর ঘোড়ার হাতও যা, পা-ও তাই—দুটোর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই কাঞ্চনের মতে।

কিন্তু যাই হোক, পালানোটা লজ্জার কথা। আস্তে আস্তে এই কথাটা কাঞ্চনের মনে হল। একলা থাকলে সে হয়ত পালাত না, ঘোড়াদের পাশ কাটাত—বিশেষত হন্তদন্ত হয়ে এতদূর পালিয়ে আসাটা—! ঘোড়াও তাদের ব্যবহার দেখেই বোধহয় লজ্জিত হয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু সে কী করবে? তার ইচ্ছে না থাকলেও না পালিয়ে উপায় ছিল না। যাকগে, সে আবার সেই পার্কের ধারে ফিরে গিয়ে দেখবে, কী হচ্ছে সেখানে; এবার ঘোড়া কেন, হাতি দেখলও সে দৌড়োবে না, বড়জোর পাশ কাটাতে পারে।

সে ফিরতে উদ্যত, এমন সময়ে সেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা, যাঁর ডিস্পেন্সারিতে বসে আগের দিন সে খবরের কাগজ পড়েছিল। তিনি মোটর কারে বসে ছিলেন, লোকজনের ছুটোছুটিতে তাঁর মোটর দাঁড়িয়ে গেছল। তিনি কাঞ্চনকে দেখে জিগ্যেস করলেন—"কী হে ছোকরা, খবর কী, তোমাদের স্বরাজ আর কদ্দূর?"

কাঞ্চন গম্ভীর হয়ে গেল, কোন উত্তর দিল না।

"পালাচ্ছিলে যে? তুমি না বলেছিলে যে, দেশের জন্যে সর্বস্ব দিতে পার?"

এবার কাঞ্চনকে জবাব দিতে হল। সে বিরক্ত হয়ে বললে—"দেশের জন্যে পারি, কিন্তু ঘোড়ার জন্যে তো নয়।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন—"বটে? তা এসো আমার মোটরে। তোমাকে এই গোলমাল থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি।"

"চাই না যেতে। ঘোড়াকে আমি ভয় করি নাকি? অনেক ঘোড়ার পিঠেই চড়েছি।"

বলে কাঞ্চন আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে পার্কের দিকে পা চালাতে শুরু করল।

পার্কের কাছে এসে দেখে, আবার চারধারে ভিড় জমে গেছে। দৌড়োদৌড়ির পরিশ্রমে ঘোড়াদের জিভ বেরিয়ে গেছে, তারা নিরুৎসাহ হয়ে হাঁপাচ্ছে।

কাঞ্চন বিস্ময় প্রকাশ করে বললে—"এইমাত্র এত লোক তাড়াল, আবার লোক জমে গেছে?"

সোনার চশমাপরা একজন লোক বললে—"কলকাতা শহর, এখানে লোক কি কম?"

একজন পিছলে পড়লে ছুশো লোক দাঁড়িয়ে যায়, মোটর-চাপা পড়লে ছ'হাজার। এখানে ভিড় তাড়িয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা কি সোজা কথা ?"

কাঞ্চন জবাব দিলে—

"এই লোক কেহ নাহি দিতে পারে তেড়ে।
যতই করিবে তাড়া, তত যাবে বেড়ে॥"

১৫

কাঞ্চন তখনো সেই অতিকায় অশ্বগুলোর দিকে তাকিয়ে। ঘোড়াগুলোকে তার আন্তরিক পছন্দ হয়েছিল। এদের পিঠে চড়তে না জানি কী আরাম! দেশের বেঁটে-বেঁটে টাট্টু বিস্তর চাপা গেছে, একটু ঢ্যাঙালোকের পক্ষে সে-ঘোড়ায় চেপে যাওয়ার মানে পায়ে হেঁটে যাওয়া। দস্তুরমত মাটিতে পা ঠেকে। কিন্তু এই ঘোড়ায় যদি চাপা যায়, তবে যতই ঢ্যাঙা হোক না কেন, মাটিতে পা ঠেকার আর ভয় নেই। বরং ভয় এই, লোকের মাথায় না ঠেকে যায়।

আচ্ছা, সার্জেণ্টদের চাকরি কি পাওয়া যায় না ? বেশ কাজ ওদের। বেশ আরামের কাজ। সবচেয়ে ভাল কাজ। সে বিবেচনা করে দেখল, রাস্তায় জল ছিটোনোর কাজও ভাল বটে, কিন্তু সার্জেণ্টের চাকরি পেলে সে-কাজ ছেড়ে দিতে এক্ষুনি সে প্রস্তুত। অবশ্য সার্জেণ্টদের বেতন যে কত, তার জানা নেই, যারা জল দেয়, তারা পায় মাসে আ-ঠা-রো টা-কা! সে অনেক টাকা! সার্জেণ্টরা কত পায় কে জানে! বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে। বোধহয় ঘোড়াটাই ওদের বেতন! কিন্তু ভেবে দেখলে ঘোড়ায় চাপতে পাওয়াটাই কি কম হল ? কাঞ্চন বিনা-বেতনেই সার্জেণ্ট হতে রাজী।

ঘোড়ারা লোলুপ নেত্রে জনতার দিকে কটাক্ষ করছিল। তারা জিরিয়ে নিচ্ছে কিংবা আবার তাড়া করবার মতলবে আছে, কাঞ্চন তা ঠিক বুঝতে পারছিল না। যদি আবার তাড়া করে, তাহলে সে ভারি রেগে যাবে! একটু আগেই তাদের তাড়নায় পা না চালিয়ে বেগে চলার অভিজ্ঞতা সে লাভ করেছিল, কিন্তু সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির অভিলাষ তার আদৌ ছিল না। আকাশপথে বেশি চলাচল ভাল নয়, নিরাপদও নয়—বিশেষ করে স্থলচরের পক্ষে। তাতে করে চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে যাবার ভয় আছে। ওখান থেকে সরে পড়াটাই কাঞ্চন সমীচীন মনে করল।

কিন্তু কোথায়ই বা যাবে! ভিড় ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে দেখে একজন ফেরিওয়ালা আলু-কাবলি হেঁকে চলেছে। কলকাতায় পা দিয়ে অবধি এই অপূর্ব খাদ্যটি বহুবার তার চোখে পড়েছে, দেখামাত্র তাকে খাদ্য বলে সনাক্ত করতে তার তিলমাত্র বিলম্ব হয়নি এবং

তার অপূর্বতা সম্বন্ধেও তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না! কিন্তু ট্যাঁকে পয়সা না থাকায় জিনিসটা কেবল চোখে দেখাই হয়েছে, চেখে দেখা হয়নি।

সে মনে মনে প্রশ্ন করলে, সকালে যখন অচল আনিটার বদলে দু'পয়সার ছাতু সে কিনল, তখন এই ফেরিওয়ালা ব্যাটা ছিল কোথায়? কাছাকাছি থাকেনি কেন? তাহলে তো সে ছাতু না কিনে আলু-কাবলিই কিনত—আনিটার বদলে দু'পয়সার না দিক এক পয়সার দিতে কি খুব আপত্তি হত ওর?

এইসব দার্শনিক প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় সে যখন ব্যতিব্যস্ত, সেই সময়ে সকালবেলার আলাপী সেই ছেলেটির সঙ্গে তার দেখা হল। ছেলেটি হন্‌হন্ করে চলেছে, কাঞ্চন তাকে ডাক দিলে—"এমন ছুটে চলেছ কোথায়?"

"মিটিং-এ যাচ্ছি। কেন, মিটিং হচ্ছে না?"

"যেয়ো না, যেয়ো না! সেখানে ভারি ঘোড়ার উপদ্রব!"

"তাই বুঝি পালিয়ে এসেছ তুমি?"

"পালিয়ে আসব কেন? আলু-কাবলি কিনতে এলাম আমি।"

ছেলেটি তাকে ধিক্কার দিলে—"দেশের চেয়ে আলু-কাবলিই তোমার কাছে বড় হল!"

কাঞ্চন অপ্রতিভ হবার ছেলে নয়, বললে—"বাঃ, তোমরা যদি একটা আস্ত নিমগাছ তার সব ছোটখাট শাখা-প্রশাখাসমেত খেয়ে শেষ করতে পার, তাহলে আমার বেলা আলু-কাবলি খেলেই দোষ? নিমের চেয়ে আলু-কাবলিটা কি খারাপ হল?"

কাঞ্চনের যুক্তির বহরে ছেলেটি ধামা খেল। সে আম্‌তা-আম্‌তা করে বললে—"নিম-গাছের চেয়ে ভাল হতে পারে, স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে কি দেশের চেয়েও?"

"বা রে! দেশ সেখানে কোথায়? কেবল মানুষ আর ঘোড়া, ঘোড়া আর মানুষ! দেশ-টেশ সেখানে দেখতে পেলুম না তো!"

ছেলেটি সবিস্ময়ে বললে—"বল কী!"

"তাও আবার মানুষগুলো ঘোড়ার ঠ্যালায় ছুটোছুটি করে মরছিল; কোথায় পালাবে, পথ পাচ্ছিল না। তাই তো আমি বিরক্ত হয়ে চলে এলাম। তাকে যদি মিটিং বল তো বলতে পার; কিন্তু আমার মতে সেটা মিটিং নয়, রানিং—! মানুষ আর ঘোড়ার রানিং!"

ছেলেটি বিরক্তি প্রকাশ করলে—"ওগুলো মানুষ নয়, সব গাধা!"

কাঞ্চন ভারি বিস্মিত হল, ছেলেটা বলে কী? রীতিমত জলজ্যান্ত মানুষ—সেগুলো সব গাধা হয়ে গেল? গাধা তো তার মধ্যে একটাও তার চোখে পড়েনি! অনর্থক দ্বিপদ প্রাণীদের চতুষ্পদে প্রোমোশন দেওয়া সে সঙ্গত মনে করল না; কিন্তু কথা আর না বাড়িয়ে ছেলেটির মতেই সায় দিলে—"তা হবে হয়ত, তুমি যখন বলছ।"

"তা হবে হয়ত কি? নিশ্চয়ই তাই। গাধা থাকতে দেশের কী আশা বল?"

"তা বটে ; কিন্তু ঘোড়া থাকতেও দেশের কোন আশা নেই। তা, মিটিং-এ তুমি কেন যাচ্ছিলে ?"

"বক্তৃতা দিতে।"

"আরে দূর দূর, বক্তৃতা আবার মানুষে দেয় !"

"কেন ? মানুষে দেয় না তো গোরুতে দেয় নাকি বক্তৃতা ?"

"বক্তৃতা দিতে হলে দম আটকে আসে, কথা খুঁজে পাওয়া যায় না, কাপড়-জামা সব ঘামে ভিজে যায়। আমাদের ইস্কুলের মিটিং-এ আমি একবার বক্তৃতা দিয়েছিলাম ; জীবনে আর কক্‌খনো দেব না। বাব্বাঃ, কী নাকাল !"

"আমার কিন্তু ভাল লাগে বেশ।"

"ভারি খারাপ কাজ বক্তৃতা দেওয়া। ওর চেয়ে এস্‌এ লেখা ঢের ভাল। অন্য বই থেকে টোকা যায়, কিন্তু বক্তৃতার বেলা কী মুস্কিল দেখো, তোমাকে হরদম বলে যেতেই হবে, অথচ টোকবার কোন উপায় নেই। তার চেয়ে বক্তৃতার শেষে কষে হাততালি দিতে ভারি মজা। আজকাল আমি বক্তৃতা দিই না, হাততালি দিই।"

ছেলেটি গম্ভীরভাবে বললে—"আমি খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পারি। তোমার মত অমন হাঁপিয়ে উঠি না। অনেক বক্তৃতা দিয়েছি আমি।"

কাঞ্চন ওকে উৎসাহ দিলে—"বেশ তো, তাহলে এখানেই দিয়ে ফেল না কেন একখানা ! আমি খুব জোর হাততালি দেব।"

"একজন হাততালি দিলে কী হবে ? আর শোনার লোক কই ?"

"আরম্ভ করলেই সব এসে জুটবে ; কিন্তু ওই আলু-কাবলিওয়ালাকে শোনানো চাই, তোমার বক্তৃতায় দেশের প্রশংসা তো করবেই, সেইসঙ্গে ওর আলু-কাবলিরও একটু প্রশংসা করে দিয়ো। ও যদি খুশি হয়ে এক পয়সার আলু-কাবলি অমনি আমাদের দিয়ে দেয় !"

ছেলেটিরও এই আইডিয়াটা নেহাত মন্দ লাগল না। সে উৎসাহিত হয়ে বললে—"বেশ হয় তাহলে ! হাততালি আর আলু-কাবলি—দু'দুটো লাভ। বেশ, আমি রাজী—"

তার কথা শেষ হতে-না-হতে কাঞ্চন একছুটে পাশের সরু গলি দিয়ে কোথায় যে ভোঁ দিল, দেখা গেল না। ছেলেটি বিমূঢ় হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দূরে এক অশ্বারোহী সার্জেণ্টের আবির্ভাব লক্ষ্য করল। অশ্বভীত কাপুরুষ কাঞ্চনের ওপর তার অত্যন্ত ঘৃণা হল। ছিঃ, ভারি ভীতু তো ছেলেটা !

কাঞ্চন ফিরতেই সে জিগ্যেস করলে—"পালালে যে হঠাৎ ?"

"বাবার মত একজন লোক ওই ফুটপাথ দিয়ে আসছিল যেন দেখলুম। পরে দেখলুম—বাবা নয়, তাই আবার চলে এলুম।"

"বাবাকে বুঝি তোমার বড্ড ভয় ? আমি ভেবেছিলাম, তুমি ঘোড়ার ভয়ে পালালে।"

"হুঁ! ঘোড়াকে আমি ভয় করি নাকি? দিক না আমায় ছেড়ে, আমি চেপে দেখিয়ে দিচ্ছি!"

ছেলেটি বড়-বড় চোখ করে জিগ্যেস করলে—"ঘোড়ায় তুমি চাপতে জান? চেপেছ কখনো?"

"আক্‌ছার!"

"কিন্তু যদি পিঠে নিয়ে ছুট মারে?"

"ছুটলেই তো মজা! কিন্তু ছোটে কই! যে-সব বেঁটে-বেঁটে ঘোড়া আমাদের দেশের—দশ-ঘা মারলে তবে এক-পা নড়ে।"

"ওঃ, বেঁটে-বেঁটে ঘোড়া! তাই বল! এ-ঘোড়ায় আর তোমায় চড়তে হয় না—কী উঁচু দেখেছ!"

উঁচু হল তো কী! হাতিতে যেমন করে ওঠে, তেমনি করে উঠব।"

"কেমন করে?" ছেলেটির বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। এই পাড়াগাঁর ছেলেটি কলকাতার ছেলের কাছে নতুন মহিমা নিয়ে দেখা দেয়। ঘোড়াতে তো ও চেপেইছে, হাতিতে চাপতেও ওর বাকি নেই। হাতিতে ওঠা দূরে থাক, চিড়িয়াখানায় অমন যে জনপ্রিয় মানুষ-বৎসল হাতি, তার কাছে যেতেও তার ভয় করে। যদি দৈবাৎ ভুলে মাড়িয়ে দেয়, তাহলেই তো সদ্য ছাতুত্ব-প্রাপ্তি!

কাঞ্চন অবলীলায় উত্তর দেয়—"কেন, ল্যাজ ধরে উঠব!" সেই সঙ্গে ছেলেটির দিকে কৃপার চক্ষে তাকায়।

ছেলেটি এবার মরীয়া হয়ে প্রশ্ন করে—"কিন্তু তুমি সাইকেল চালাতে জান না তো! ঘোড়ায় চাপা তো সোজা, সাইকেলে ব্যালান্স রাখতে হয়।"

"ঢের-ঢের সাইকেল চালিয়েছি!" সাইকেল-চালানো যে একটা বাহাদুরি, কাঞ্চন সে কথায় আমলই দিতে চায় না।

"কখনো মোটর চেপেছ?"

ছেলেটি রুদ্ধনিশ্বাসে কাঞ্চনের জবাবের প্রতীক্ষা করে। এরই উত্তরের ওপর যেন তার আত্মসম্মান নির্ভর করছে।

কাঞ্চন এবার দমে যায়, মোটরের ওপর ওর ভীষণ লোভ, কিন্তু এখনো চাপবার সুযোগ হয়নি ওর। সেই ডাক্তার হতভাগা বলছিল বটে তাকে চাপতে, ইচ্ছেও হয়েছিল তার, কিন্তু অমন বিশ্রী লোকের সঙ্গে মোটরে যেতে কেন, স্বর্গে যেতেও তার রুচি নেই—অনেক কষ্টে সে তখন আত্মসংবরণ করেছে। কিন্তু চাপলেই যেন ভাল ছিল, এখন সে তো অনায়াসেই হ্যাঁ বলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করে দিতে পারত! মিথ্যে করে 'হ্যাঁ' বলতে তার নিজের কাছে মাথা কাটা যায়—সে-কথা সে কিছুতেই বলবে না।

ছেলেটির প্রশ্নকে যেন সে গ্রাহ্যই করে না, এমনিভাবে জবাব দেয়—"মোটর তো আমরা খাই। পাবামাত্রই খেয়ে ফেলি।"

যথার্থ উত্তর না পেয়ে ছেলেটি মনে মনে চটে যায়। এরকম বদ্ বাক্যবাগীশদের সঙ্গে কথায় কে পারবে? বিরক্ত হয়ে সে অদূরে পাশের বাড়ির রোয়াকে গিয়ে বসে পড়ে।

১৬

কাঞ্চন আলু-কাবলিওয়ালার কাছে যায়—"তোমার এসব তো বহুৎ রোজের বাসি! নইলে কিনতাম দু'আনার।"

শূন্য-পকেটে হাত ভরে দেয় কাঞ্চন।

আলু-কাবলিওয়ালা জবাব দেয়—"পহলে খাকে তব্ দাম দিজিয়ে।" দু'আনার আলু-কাবলি এপর্যন্ত কোন ছেলে কেনেনি তার কাছে—উৎসাহ এবং সন্দেহের চোখে সে কাঞ্চনকে লক্ষ্য করে, কিন্তু পকেটস্থ হাতকে সে অবজ্ঞা করতে পারে না।

কাঞ্চন বলে—"আরে কিনলে তো দাম দেব নিশ্চয়ই। পহেলা থোড়া চাখ্‌নে তো দাও, দু'আনার কিনেগা।"

আলু-কাবলিওয়ালা কিছুটা শাল পাতায় করে কাঞ্চনকে দেয়। কাঞ্চন ঠোঙাটা নিয়ে রোয়াকে ছেলেটির পাশে গিয়ে বসে। কোন কথা বলে না, শালপাতাসমেত সমান অর্ধেক ভাগ করে ছেলেটির হাতে দেয়। ছেলেটি একবার তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায়, কিন্তু কিছুমাত্র আপত্তি না করে আলু-কাবলির অংশ গ্রহণ করে। নীরবে দুজনের মুখ চলতে থাকে।

শাল পাতাটাকে জিভ দিয়ে সুচারুরূপে মার্জিত করে কাঞ্চন ফেলে দিল, বোধহয় খুব দুঃখের সঙ্গেই। সত্যি ভারি চমৎকার খাবার, চেহারা দেখে যেমন সে কল্পনা করেছিল, ঠিক তাই।

কাঞ্চন বুঝতে পেরেছিল যে, ছেলেটি তার ওপর রেগেছে; আর তার ধারণায় খাবারই হচ্ছে রাগ ভাঙানোর শ্রেষ্ঠ উপায়। যে রাগ কথায় পড়তে চায় না, খাদ্যের মধ্যস্থতায় তা সহজেই অনুরাগে পরিণত হয়। কাঞ্চন তার একটা কারণও আবিষ্কার করেছিল, তা হচ্ছে এই—খাদ্যের দ্বারা দুজনের মধ্যে একটা উদরের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আবার হৃদয় জিনিসটা উদরের খুব কাছাকাছি আছে কিনা, তাই হৃদয়ের সম্বন্ধ হতেও বেশি দেরি হয় না।

কাঞ্চন মনে মনে পর্যালোচনা করতে লাগল—নাঃ, উদরকে ঠিক হৃদয় বলা যায় না, সে কথা সত্যি। মেষশাবক বাঘের উদরে স্থান পায় কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় কি? নাঃ, উদর আর হৃদয় এক জিনিস নয়, তবে উদরকে হৃদয়ের দরজা বলা যেতে পারে। আলু-

কাবলির দ্বারা ছেলেটির হৃদয়দ্বারে করাঘাত করতে পেরেছে বলে তার মনে হল। তাই এতক্ষণ বাদে অত্যন্ত সন্তর্পণে সে কথা কইলে—"তোমার নামটি কী ভাই?"

"কনক।"

"কনক? কনক তো ভারি চমৎকার নাম! বল কী, তোমার নাম কনক? এরকম নাম তো এর আগে আমি শুনিনি! এমন সুন্দর তোমার নাম?"

কাঞ্চনের উচ্ছ্বাস দেখে ছেলেটি বিস্মিত হল। নিজ নামের গুণগানে কে না খুশি হয়? কাঞ্চনকে তার আবার ভাল লাগল; মোটরে না চাপুক, নামের মর্যাদা সে বোঝে।

কাঞ্চন বললে—"এরকম চমৎকার নাম তো পৃথিবীতে আর একটিও নেই, কিংবা আর একটিই আছে কেবল।"

"কার নাম?" কনক জিগ্যেস করল। তার নামের মত চমৎকার নাম আর একটা আছে, সেজন্যে সেই অপরিচিত নামধারীর ওপর মনে মনে তার ঈর্ষা হল।

কাঞ্চন বলে চলল—"কনক! গোল্ড মানে কনক, কোল্ড মানে ঠাণ্ডা, ওল্ড মানে পুরাতন, আর সোল্ড মানে বিক্রয় করিয়াছিল।"

ছেলেটার মাথায় ছিট আছে নাকি! কনক ভাবে।

"কিন্তু আর-একটা নাম আমার মত আছে, তুমি বললে যে?" কনক জিগ্যেস করে।

"হ্যাঁ। সে নামটাও খুব চমৎকার।"

"কার নাম?"

কাঞ্চন বুক ফুলিয়ে জবাব দেয়—"কেন, আমার! আমার নাম কাঞ্চন। কনকও যা, কাঞ্চনও তাই—একই মানে।"

"তোমার নাম বুঝি কাঞ্চন? জানতাম না তো!" কনক একটু ভাবতে থাকে, তারপর বলে—"যখন এক নাম, তখন আমাদের মধ্যে খুব ভাব হবে, না?"

১৭

কাঞ্চন বললে—"চল একটু বেড়াই এধারে-ওধারে। বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে।"

কনক বললে—"আমাদের বাড়ি তো কাছেই, চল না কেন, মা খুব খাওয়াবেন। বাবার সঙ্গেও তোমার আলাপ করিয়ে দেব।"

খাওয়ার কথায় কাঞ্চনের উৎসাহ হলেও বাবার কথায় সে দমে গিয়ে বললে—"বাবাদের সঙ্গে আমি আলাপ করি না।"

"কেন, বাবারা কি খারাপ লোক?"

নিরাসক্তভাবে কাঞ্চন জবাব দিলে—"সচরাচর।"

বাবাদের ওপর কনকের স্বাভাবিক পক্ষপাত ছিল, কেননা পয়সা-কড়ি বাগাতে হলে

বাবার মত বস্তু পৃথিবীতে নেই। এই তো সেদিনই, তাদের বয়েজ-ক্লাব থেকে যা চাঁদা উঠেছিল, তাতে আর ক্রিকেট সেট কেনা হত না—কিন্তু কনক তার বাবাকে গিয়ে ধরতেই "কার এণ্ড মহলানবিশ" থেকে অমন ভাল ক্রিকেট সেটটা চলে এল, আর চেকটা বাবাই কেটে দিলেন।

কাঞ্চনের কথার প্রতিবাদ করল কনক—"বাবাদের তুমি কিচ্ছু জান না।"

অভিজ্ঞ-ব্যক্তি-সুলভ ঔদাস্যভরে কাঞ্চন বললে—"হাড়ে হাড়ে জানি বাবা!"

"আমার বাবার তুমি কিচ্ছু জান না! আমার বাবা তেমন নন!"

"তোমার বাবা তোমাকে ক'দিন অন্তর ঠ্যাঙান?"

"কেন, ঠ্যাঙাবেন কেন?"

"তা না হলে ছেলে মানুষ হয় কখনো? চাণক্য বলে গেছেন কিনা—'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি'—কি-সব সংস্কৃত শ্লোক, ও ছাই আমার মনেও থাকে না; বাবা আওড়ান। মানে তার মোদ্দা এই—পাঁচ বছরের পর থেকেই ছেলে পিটোতে শুরু করবে ষোল বছর পর্যন্ত, তবেই সে ছেলে মানুষ হবে।"

কনক সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—"তা না হলে আর মানুষ হবে না?"

কাঞ্চন মাথা নেড়ে বলে—"কী করে হবে—পিটেই তো সব কিছু হয়; যেমন লোহা পিটে হাতুড়ি হয়, সোনা পিটে গহনা হয়, তেমনি ছেলে পিটলেই মানুষ হয়। মানে, এটা হচ্ছে গিয়ে বাবার মত, আমি কিন্তু এ-কথা বলি না। আমার ছেলের গায়ে আমি মোটেই হাত দেব না, তুমি দেখে নিও।"

"তোমার বাবা তাহলে তোমাকে মারেন?"

"তা কি মারতে দিই? ছেলেবেলায় যা মেরে-ধরে নিয়েছেন। তবে এখনো কয়েক বছর সাবধানে থাকতে হবে আমায়।"

"কেন?"

"এখনো আমার ষোল বছর হয়নি কিনা!"

"ও! তারপর আর বাবার ভয় থাকবে না বুঝি?"

"ভয় আমি করি না কাউকেই। তবে একে বাবা, তায় বয়সে বড়, কী করি বল! কিন্তু বাবার চেয়ে চাণক্য শ্লোককেই আমার বেশি ভয়, ওই শাস্তরটা বাবা মানেন কিনা! তা, তোমার বাবাও তো তোমাকে মারেন নিশ্চয়ই?"

"মোটেই না। আদর করবার সময় ছাড়া গায়ে হাতই দেন না।"

"বল কী! তোমার বাবা চাণক্যকে মানেন না বুঝি? হায় হায়, তুমি আর মানুষ হবে না!

"আমার বাবা বলেন—'গাধা পিটে ঘোড়া তো হয় ছাই, বরং অনেক ঘোড়া পিটুনির চোটে গাধায় গিয়ে দাঁড়ায়'।"

কাঞ্চন বিজ্ঞতার সঙ্গে বললে—"তোমার বাবার দেখছি শাস্তর-টাস্তর পড়া নেই। সমস্‌কৃত উচ্চারণ করা শক্ত কিনা, সেই ভয়েই পড়েননি।"

কনক গর্বের সঙ্গে বললে—"আমার বাবা ইয়া মোটা-মোটা ইংরেজি বই পড়েন।"

হতাশার সহিত কাঞ্চন উত্তর দেয়—"ম্লেচ্ছ হয়ে গেছেন! নাঃ, আর আশা নেই—তোমারও নেই, তোমার বাবারও নেই।"

"না থাকগে, আমার বাবা আমায় কত ভালবাসেন। বায়স্কোপে, ফুটবল-ম্যাচে নিয়ে যান। আমায় কেমন গল্পের বইয়ের লাইব্রেরি করে দিয়েছেন। সাইকেল আছে, ক্যারম্‌বোর্ড আছে আমার। জন্মদিনে কত উপহার দেন—আমার আসছে জন্মদিনে একটা ফাউণ্টেন-পেন দেবেন বলেছেন। পনের—প-নে-র টাকা তার দাম!"

কাঞ্চনের ভারি বিস্ময় লাগে। এরকম বাবাও পৃথিবীতে আছে নাকি! মোটেই চাণক্য শ্লোকের ধার ধারেন না, তার ওপরে কত প্রাইজ দেন আবার! আশ্চর্য তো! তার তো এতদিন মনে হত যে, বাবা-নামক মরুভূমিতে মা-ই একমাত্র ওয়েসিস (অল্পদিন হল বই পড়ে এই উপমাটা কাঞ্চন আয়ত্ত করছে)। এ ছাড়া অন্যবিধ বাবার অস্তিত্ব কোনদিন তার কল্পনাতেও আসেনি। বাবা বলতেই তার মনে হয়—'ওরে বাবা!' আর মা? মা বলতেই যেন গা জুড়িয়ে যায়, মনটা মিষ্টি হয়ে ওঠে, ভাবতেও কেমন ভাল লাগে! কিন্তু কনকের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে—পৃথিবীতে মা'র মত বাবাও আছে, যাকে নিঃসন্দেহে মা'র মধ্যেই গণ্য করা যেতে পারে।

তবু কনকের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তার আর রুচি হল না। একটা বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে পা ঘামিয়ে? মা হলেও বরং কথা ছিল। রাস্তা দিয়ে দু'সারি যত লোক আছে, তাদের মধ্যে ছেলেরা বাদে প্রায় সবাই তো বাবা—কারুর না কারুর। সব বাবাই প্রায় সমান; এদের যে-কোন একজনকে দেখলেই বাবা-দর্শনের প্রয়োজন মিটে যায়। তাদের গ্রামের যে-ক'টি বাবার সঙ্গে তার পরিচয় আছে, প্রত্যেকেই তাঁরা ছেলে মানুষ করতে বদ্ধপরিকর—নিজেদের ছেলের পিঠেই মহৎ প্রয়াসের বিজ্ঞাপন তাঁরা জাহির করেন। কনক যা বলছে, তা সত্যি হলে বুঝতে হবে যে, ওর বাবাটিই হচ্ছে সৃষ্টিছাড়া। সচরাচর বাবারা ওরকম হন না।

"দেখ-দেখ, একটা দড়া দিয়ে ওরা কী করছে"—বলতে বলতে কাঞ্চন লাফিয়ে ওঠে। পাশের খেলার মাঠে কোন অ্যাথলেটিক ক্লাবের স্পোর্টস চলছিল, কাঞ্চন সেইদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে। "একটা দড়ি নিয়ে ওরকম কাড়াকাড়ি করছে কেন। খুব দামি জিনিস নাকি?"

"ওদের স্পোর্টস হচ্ছে।"

"সে আবার কী?"

"কেন, তোমাদের গাঁয়ের ইস্কুলে ছেলেরা খেলা-ধুলো করে না?"

"আমরা ডাণ্ডাগুলি খেলি।"

"বাবা! কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে থাক তুমি?"—এতক্ষণে বাহাদুরি জাহির করবার সুযোগ পেয়ে কনকের মনটা খুশি হয়। স্পোর্টস কাকে বলে জানে না এ ছেলেটা! অদ্ভুত! "ওরা যা করছে, ওর নাম টাগ্-অব্-ওয়ার্—বুঝলে?"

বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে কাঞ্চন বললে—"অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছি। কিন্তু অত টানা-টানি করা কেন? দড়ি তো কম নেই, মাঝখান থেকে দু'ভাগ করে নিলেই তো হয়!"

লোকগুলোর নির্বুদ্ধিতা দেখে বিস্ময়ের আতিশয্যে কাঞ্চন এমনই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল যে, কখন অজ্ঞাতসারে সে একজন মেমসাহেবের ক্ষিপ্রগতির সামনে এসে পড়েছে, তা দেখতেই পায়নি। ধাক্কা খেয়ে কাঞ্চনের হুঁশ হল। তার রাগও হয়ে গেল ভয়ানক। চটে-মটে সে বলে উঠলে—"ডোণ্ট মেম্।"

মেমসাহেব দুঃখ-প্রকাশ করে বললেন—"আই অ্যাম্ সরি।"

কনকের ভারি হাসি পেল, সে বললে—"তুমি দেখছি ইংরিজিও জান না! 'ডোণ্ট মেম্' আবার কী হে! মেমটা কি কোন ভার্ব, যে ডোণ্ট হবে?"

কী! কাঞ্চন ইংরিজি জানে না! এমন কথা বলে এই পুঁচকে ছোঁড়াটা তার মুখের ওপর! কাঞ্চন তখনই মেমটির কাছে দৌড়ে গেল। পেছন থেকে ডাকতে লাগল—"হিয়ার মি, হিয়ার মি স্যার!"

মেমসাহেব দাঁড়িয়ে পড়লেন। কনক ভারি হাসতে লাগল—মেয়েছেলেকে বলছে কিনা স্যার!

কাঞ্চন জানে, কাউকে সম্মান দেখিয়ে কথা কইতে গেলে স্যার বলতে হয়, ইস্কুলের মাস্টারমশাইদের তাই সে বলে। এতে হাসবার কী আছে? কনকের ব্যবহারে কাঞ্চন অত্যন্ত মর্মাহত হল। মেমটির কাছে গিয়ে গম্ভীরভাবে সে বলল—"আমি অ্যাম্ নট্ গ্ল্যাড।"

মেমসাহেব বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন—"হোয়াট?"

কাঞ্চন তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়—"ইউ টেল্ ইউ আর সরি, বাট্ আই টেল্ আই অ্যাম্ অল্সো নট্ গ্ল্যাড্। ডু ইউ নো?"

মেমটি হাসতে হাসতে চলে যায়। কাঞ্চন ভুরু কুঁচকে ফিরে আসে। কনক তখনো হাসছে। তার মুখের ওপর বলে দেয়—"ইউ আর ভেরি ব্যাড্ বয়, আই ডোণ্ট্ টক্ উইথ ইউ।" বলে সটান সে রাস্তা পেরিয়ে সামনে যে-গলি পড়ে, তার মধ্যে ঢুকে হারিয়ে গেল।

কনকের মুখের হাসি মিলিয়ে আসে। একটু আগেই যে-বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হবার কল্পনা তারা করেছে, প্রথম সূত্রপাতেই তা যে এমনি করে হঠাৎ ছিঁড়ে যাবে, তা ভাবতে পারা যায় না। যাকগে—তার বয়েই গেছে! ভারি গুড্ বয় উনি—অমন একটা মুক্খুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে বয়েই গেছে তার! বলে কিনা, 'ডোণ্ট মেম্'!

এ-গলি সে-গলি ঘুরে আবার বড় রাস্তায় পড়ে কাঞ্চন। আনমনে সে চলতে থাকে। ভারি ছোটলোক ওই কনকটা! আদর দিয়ে-দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েছেন ওর বাবা। কোনদিন ও মানুষ হবে না। ইংরিজি ও জানতে পারে—মিনির দাদার মত—কিন্তু মানুষ ও হবে না কোনদিন, এ-কথা কাঞ্চন হলফ করে বলে দেবে। নিয়মিত প্রহারকে ওর নিত্যকার খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত না করে ওর বাবা ভয়ানক ভুল করেছেন। তাতে কাঞ্চনের আর কী এসে যাবে, কনকেরই ক্ষতি! কাঞ্চনের হাত নিস্‌পিস্ করতে থাকে—হঠাৎ তার মনে হয়, একেবারে চলে আসবার আগে কনকের খানিকটা ক্ষতিপূরণ করে দিয়ে এলে মন্দ হত না।

—ভঁক্-ভঁক্-ভোঁ—

ধূসর রঙের প্রকাণ্ড একখানা মোটর তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভেতর থেকে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"আর-একটু হলে চাপা পড়তে যে! নিজেও মরতে, আর আমাকেও মজিয়ে যেতে! রাস্তা চলবার সময় চোখ-কানগুলো থাকে কোথায়?"

আরোহীর আর্তনাদ কানে না তুলে নিষ্পলক নেত্রে সে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরে গম্ভীরভাবে সার্টিফিকেট দেয়—"বাঃ, ভারি চমৎকার তো এই গাড়িটা! কলকাতার সব গাড়ির চেয়ে ভাল!"

তার কথা শুনে ভদ্রলোক ভারি কৌতুক বোধ করলেন। বললেন—"তোমার পছন্দ হয়েছে গাড়িখানা? চাপবে একটু?"

কাঞ্চনের লোভ হয়, প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে কি একবার ভাবে। সন্দেহের চোখে ভদ্রলোককে একবার দেখে নিয়ে সে জিগ্যেস করে—"আপনি ডাক্তারি করেন না তো?"

"না। কেন?"

"ডাক্তারদের আমার মোটেই ভাল লাগে না। তাদের গাড়িতে আমি চাপতে চাই না।"

"না-না—আমার চোদ্দপুরুষে কেউ ডাক্তার নেই।"

আশ্বস্ত হৃদয়ে কাঞ্চন তখন গাড়িতে উঠে বসে। ভদ্রলোক জিগ্যেস করেন—"তুমি ডাক্তারদের ভয় কর নাকি?"

"উহুঁ, ভয় আমি করি না কাউকেই। তবে ভাল লোক নয় ওরা—যারা ডাক্তার, আর যারা চা বিক্রি করে।"

ভদ্রলোক একটু অবাক হন, তারপরে বলেন—"যাকগে। ডাক্তারেরা সব জাহান্নামে যাক, ওইসঙ্গে যত চা-ওয়ালারা। এমনকি চা-বাগানগুলো গেলেও আমার কোন দুঃখ নেই। আমি না-হয় কোকো খেয়েই থাকব। তুমি আমার একটা কাজ কর তো।"

ভদ্রলোক একখানা খবরের কাগজ খুলে কাঞ্চনের সামনে মেলে ধরলেন। গাড়ি চলতে লাগল।

"দেখ, এইগুলো পড়ে দেখ। এগুলো সব ঘোড়ার নাম। এর মধ্যে একটা নাম তুমি পছন্দ কর।"

কাঞ্চন ভারি অবাক হয়। এতক্ষণ তো সে ঘোড়ার সঙ্গেই যুদ্ধ করেছে—আবার এখানেও সেই ঘোড়া! কলকাতার লোকগুলোর কি ঘোড়া ঘোড়া করে মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? সে জিগ্যেস করে—"কেন?"

"বলছি পরে। এই দেখ, দশটা নাম আছে। এর মধ্যে কোন্‌টা তোমার পছন্দ?"

কাঞ্চন মনে মনে ভাবে, ওই ঘোড়াগুলো—যারা তাদের তাড়া করেছিল, তারা তাহলে নেহাত কেউকেটা নয়, ছাপার অক্ষরে ওদের সব নাম বেরিয়ে গেছে! মহাত্মা গান্ধী, সি. আর. দাশের সঙ্গে ওদের নাম ছাপা হয় কাগজে—সামান্য কথা তো নয়! সবিস্ময় কৌতূহলের সঙ্গে নামজাদা ঘোড়াদের মধ্যে একটাকে পছন্দ করার কাজে সে মনোনিবেশ করল। কিন্তু কী অদ্ভুত অদ্ভুত সব নাম! মানে বোঝা দূরে থাক, বানান করাই শক্ত! ভাগ্যিস ভদ্রলোক ওগুলো রিডিং পড়তে বলেননি! অনেক ভেবে-চিন্তে সে একটা নাম দেখাল।

"'মাই মাদার'? মাই মাদার কি জিতবে? আশা কম। আচ্ছা, ধরব আমি কিছু ওতে। যদি জেতে, যা পাব, অর্ধেক তোমার। কেমন?"

১৮

কাঞ্চন অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—"ঘোড়া আবার কী জিতবে?"

"রেস কাকে বলে জান না বুঝি? রেস কয় প্রকার?"

"জানি না তো!"

"দুই প্রকার। হিউম্যান রেস আর হর্স রেস। আমরা হিউম্যান রেসের মধ্যে, কিন্তু হর্স রেস না হলে আমাদের চলে না। বুঝতে পারলে?"

কাঞ্চন ঘাড় নেড়ে বলল—"না।"

"তার মানে হিউম্যান রেস-এ আমাদের বিশ্বাস ক্রমশ কমে আসছে এবং হর্স রেসে বাড়ছে। মানুষ হলেও ঘোড়াকে ফলো করতে আমরা ভালবাসি।"

কাঞ্চন এবার ঘাড় নাড়ে—"বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ কিনা আমরা ঘোড়ার রাজত্বে বাস করছি, এই তো? একটু আগেই তা টের পেয়েছি, যা ছুটতে হয়েছিল, বাব্বা! কিন্তু তখন তো ঘোড়ারাই ফলো করছিল আমাদের!"

"উঁহুঁ, তা নয়, ঘোড়দৌড় কাকে বলে জান না? ঘোড়দৌড়ে বাজি জেতে শোনোনি?"

"ও ঘোড়দৌড়? হ্যাঁ, শুনেছি। বাবা বলেন—'ওতে বাজি ধরে মানুষ ফতুর হয়ে

যায়। ও খেলা ভারি খারাপ!' আমার দাদামশায়রা খুব বড়লোক ছিলেন, কিন্তু ঘোড়দৌড়ে—"

"ফতুর হয়ে গেছেন? বরাত খারাপ থাকলে অমন হয়। আমার কপাল খুব ভাল, আমি তো প্রায়ই জিতি। এই যে এসে পড়েছি। ওই হচ্ছে রেসকোর্স। দেখছ, কীরকম লোকের ভিড়! আমি ভেতরে চললুম, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আসব। তুমি এই গাড়িতেই বসে থাক, চলে যেও না। যা দরকার হয়, শোফারকে বলো।"

চারদিকে লোক, কেবল লোক। অনেকখানি জায়গা ঘিরে গোল হয়ে লোকগুলো যেন অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে। তখনও কত লোক আসছে, লোক আসার আর বিরাম নেই। কাঞ্চনের সম্মুখ দিয়ে অনেকগুলো অতিকায় অশ্ব চলে গেল। এইগুলোই বুঝি রেসের ঘোড়া? শোফারকে তিন-চারবার প্রশ্ন করল, কিন্তু, সে তার একটা কথারও জবাব দিল না। তার দিকে তাকালো না পর্যন্ত, যেন তাকে গ্রাহ্যই করল না। কাঞ্চনের ভারি রাগ হল, কিন্তু রেগে আর কী করে? তার ভারি ইচ্ছে হল ভেতরে গিয়ে ঘোড়দৌড় ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে, কিন্তু কী নিয়ম-কানুন কিছুই জানে না তো! তাকে কি যেতে দেবে? শোফার ব্যাটা যে একেবারে মৌনব্রত নিয়ে বসেছে!

অনেকক্ষণ বাদে ভদ্রলোক ফিরে এলেন। হাতে নোটের তাড়া। মোটরে উঠে প্রথমেই একচোট খুব হেসে নিলেন।

"আজ একেবারে আপসেট। ভারি জিতেছি! তোমার টিপ্ ভারি ফলে গেছে! তুমি মাকে খুব ভালবাস, না? তোমার মাতৃভক্তির জোরেই জিতে গেলাম। 'মাই মাদার' জিতবে, কেউই ভাবেনি। দশ টাকায় চারশ সাতান্ন টাকা—একেবারে রেকর্ড পেমেণ্ট!"

"আমি বললুম বলে জিতল! তা কি হয়? এ তো ভারি আশ্চর্য!"

"আশ্চর্য আবার কী? ছেলেদের মধ্যে ভগবান থাকেন। তাই ছেলেদের কথা ভারি ফলে যায়। তোমার মধ্যে দেবতা আছেন, তা জান? যতদিন ছেলেমানুষ থাকবে, ততদিনই সেই দেবতা থাকবেন—তারপর যত বড় হবে, তত···এই শোফার, বাড়ি—না, বাড়ি নয়, চাঙোয়া!"

"চাঙোয়া কী?"

"রেস্তোরাঁ। মানে, চীনেদের হোটেল—ভারি চমৎকার সব খাবার-দাবার। চপ্—কাটলেট্—ফাউল-কারি—ফ্রায়েডরাইস—আইসক্রীম! তুমি কখনও সে-সব খাওনি।"

"মা বলেন—চীনেরা সব আরশুলা খায়। আর নেংটি ইঁদুর।"

ওসব বাজে কথা, কুসংস্কার। চীনেরা আমাদেরই মত সভ্য জাত। সভ্য লোকে কখনোও ওসব খেতে পারে?"

"চাঙোয়া! নামটা যেন কী রকম!"

"হ্যাঁ, ওদের নামগুলোই খারাপ, আর সব ভাল।"

"আচ্ছা চ্যাংদোলা, এটাও চীনের কথা, নয় কি? আমি তখনই জানতুম। আমি পালিয়ে আসতুম বলে পড়ুয়ারা আমাকে ছোটবেলায় চ্যাংদোলা করে পাঠশালে নিয়ে যেত। আমার যা খারাপ লাগত! এখন বুঝতে পারছি, ওটা চীনদেশের ব্যাপার!"

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন—"ঠিক ধরেছ তুমি। এখন নামো, আমরা এসে পড়েছি।"

সারি সারি কাঠের কামরা চলে গেছে, পাশ দিয়ে যেতে যেতে পর্দার ফাঁকে কাঞ্চন দেখতে পেল—প্রত্যেক কামরায় লোক খাচ্ছে। কোনটাতে বাঙালী ভদ্রলোক, বাঙালী মেয়েছেলে—আবার কোনটাতে সাহেব-মেম। কাঞ্চনরা একটা কামরায় গিয়ে বসল।

ভদ্রলোক ডাকলেন—"বয়!"

একজন উর্দিপরা লোক এল, তাকে খাবারের তালিকায় দাগ দিয়ে দিলেন।

কাঞ্চন জিগ্যেস করল—"ওই লোকটার নাম কি বয়? এরকম নাম কেন? ও কি চিনে? ও তো মনে হল যেন আমাদের—?"

"হোটেলে যারা খাবার পরিবেশন করে, তাদের বয় বলে। যে বয় মানে বালক, ও সে-বয় নয়, ও হচ্ছে সে বয়ের বাবা।"

ছুরি-কাঁটা দিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নানারকম খাদ্যও এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক ছুরি-কাঁটা চালাতে লাগলেন।

কাঞ্চনও হটবার ছেলে নয়, সেও ছুরি-কাঁটা ধরল, কিন্তু খানিক বাদেই দেখল—ও দিয়ে খাবার ধরা যায় না, কিন্তু প্লেট ওল্টাবার পক্ষে ওগুলোই যথেষ্ট। তখন ছুরি-কাঁটা পরিত্যাগ করে হাতকেই এ-বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া সমীচীন মনে করল।

এক-একটা খাবারের এক-এক রকম স্বাদ! আর কেমন সব রহস্যময় নাম! আইসক্রীম জিনিসটাই কী চমৎকার! কাঞ্চনের যেন জন্ম সার্থক হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে আহারাদি সমাধা হলে পর ভদ্রলোক একতাড়া নোট কাঞ্চনের হাতে দিয়ে বললেন—"জিতলে তোমাকে অর্ধেক দেব বলেছিলুম। এগুলো তোমার। চল্লিশখানা একশো টাকার আর একশোখানা দশ টাকার নোট আছে, মোট পাঁচ হাজার। নাও, ধর। এই হ্যাণ্ডব্যাগে রাখ—ব্যাগটা তোমায় দিলুম।"

কাঞ্চন বিস্ময়ে হতবাক।

"কী ভাবছ?"

"বর্ধমান লাইনের গাড়ি হাওড়া থেকে কখন ছাড়ে?"

"বাড়ি যাবে? অনেক গাড়ি আছে, তবে শেষ গাড়ি ছাড়ে বোধহয় রাত এগারোটায়।"

"সেটাতে চাপলে ভোরবেলায় বাড়ি পৌঁছোব। তবে বর্ধমানে গাড়ি বদলাতে হবে।"

"টাকাগুলো দিয়ে কী করবে ?"

"কত কী কিনব ! রিস্টওয়াচ, ফাউণ্টেন-পেন, সাইকেল, জামা, জুতো, কাপড়, পোশাক। মণ্টুর জন্যে বল, হ্যাপলার জন্যে খেলনা, মোটর-গাড়ি—এইসব। আর মা'র জন্যে যত বিলাসিতার জিনিস।"

"এসব কিনেও অনেক টাকা থাকবে। তা দিয়ে কী করবে ?"

"মাকে দেব।"

"বেশ-বেশ, ভাল কথা। তা তুমি তো দোকানে দোকানে ঘুরে এ-সমস্ত কিনতে পারবে না, আমার এক জানা লোক আছে, সে অর্ডার-সাপ্লায়ের কাজ করে। চল, তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই। সে-ই সমস্ত কিনে বেঁধে-ছেঁদে স্টেশনে গিয়ে বুক করে দেবে—তোমাকে টিকিট কেটে গাড়িতেও তুলে দিয়ে আসবে।"

সেদিন রাত এগারোটার সময় কাঞ্চনকে হাওড়া স্টেশনের একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরায় দেখা গেল। তখন গাড়ি ছাড়বার সামান্য মাত্র দেরি।

অর্ডার-সাপ্লায়ের লোকটি মালের রসিদ কাঞ্চনকে দিয়ে বললে—"সাইকেল ইত্যাদি সমস্ত জিনিস এই গাড়িরই লগেজ ভ্যানে চলল, স্টেশনে নেমে এই রসিদ দেখিয়ে খালাস করে নেবেন। মা'র জন্যে কাশ্মীরি শাড়ি, জ্যাকেট, গন্ধতেল, এসেন্স, নতুন গুড়ের সন্দেশ —ইত্যাদি সব-কিছু ওই স্যুটকেসটায় দিয়েছি, ওটা তো আপনি নিজের কাছেই রাখবেন বললেন। সাইকেলটার পার্টস আর খুলিনি—কাঠের ফ্রেমের মধ্যে সাবধানে দিয়েছি। স্টেশনে নেমে কুলিদের দিয়ে ফ্রেম খুলে ফেলে তখনি চালানো যাবে—ফুল পাম্প করা আছে। আর কী ?"

"আর কিছু না। তবে একটা কথা—" কিছুক্ষণ ইতস্তত করে কাঞ্চন দু'খানা একশো টাকার নোট বের করল।

"আপনার কাছে কিছু চাই না, আমার কমিশন আমি দোকানদারের কাছ থেকে পাব।"

"না আপনাকে দিচ্ছি না। আচ্ছা কলকাতা শহরে কতগুলো ভিখিরি আছে, বলতে পারেন ? দুশো ? পাঁচশো ?"—কাঞ্চন আরো তিনখানা নোট বের করল।

"তা হবে, কেন বলুন তো ?"

"এই টাকাগুলো রাখুন। আপনি কাল একটা মোটর ভাড়া করে একটু কষ্ট করে সমস্ত কলকাতা ঘুরবেন। আপনার চোখে যেখানে যে ভিখিরি পড়বে, একটি করে টাকা তাকে দেবেন।"

"টাকা রেখে দিন। এই বাজে খরচ কেন?"

"বেচারারা পেট ভরে খেতে পায় না, রাস্তার পাত কুড়িয়ে খায়—আমার টাকায় তবু একদিন ভাল-মন্দ ইচ্ছেমত খাবে। চিরদিনের দুঃখ তো আর আমি ঘোচাতে পারব না!"

"আচ্ছা দিন তবে। এ অপব্যয় কিন্তু। ছেলেমানুষ আপনি, টাকার মূল্য বোঝেন না। গাড়ি ছেড়ে দিল। নমস্কার। আমার নাম, ঠিকানা তো বলেছি। যখন যা দরকার হয়, দয়া করে আমাকে লিখবেন—খুব সযত্নে পাঠিয়ে দেব।"

"আচ্ছা আচ্ছা। নিশ্চয় লিখব। নমস্কার।"

সুদূর-বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হুস্-হুস্ করে গাড়ি চলেছে—একখানা কামরায় কাঞ্চন একা। জানলায় মাথা রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে কাঞ্চন ভাবছে—মা'র কথা, বাবার কথা, হ্যাপলা ও মণ্টুর কথা, মিনির কথা, কনকের কথা। কোথায় রইল কনক, আর কোথায় বা মিনি! তাদের নাম জানল শুধু, কিন্তু ঠিকানা জানে না। কোন-দিন কি এ জীবনে আর দেখা হবে তাদের সঙ্গে।

ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে, টিকিট-চেকারের ডাকে যখন ঘুম ভাঙল, তখন ভোর।

"এ কি বর্ধমান? এখানে গাড়ি বদলাতে হবে?"

"বর্ধমান অনেকক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছে। টিকিট দেখি। এই স্টেশনে নামতে হবে। একটু পরেই একখানা ডাউন গাড়ি আসবে, সেই গাড়ি বর্ধমান যাবে। গার্ডকে তোমার আগে বলে রাখা উচিত ছিল, তাহলে বর্ধমানে নামিয়ে দিত, ওভ্যার-ক্যারেড হয়ে তাহলে এই অসুবিধে পোহাতে হত না!"

"যাক যা হবার হয়ে গেছে। নরম গদি-আঁটা বিছানায় শুয়ে ভারি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কোথা দিয়ে রাত কেটেছে, টের পাইনি। আচ্ছা, এই ডাউন গাড়িতে চাপলে আমার বাড়ির স্টেশনে কখন পৌছোব?"

"এই দুপুর নাগাদ। বর্ধমানে নিশ্চয়ই করেসপণ্ডিং ট্রেন পাবে, তবে, বোধহয় ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করতে হবে, সেই সময় 'রেস্টুরেণ্টকার'-এ খেয়ে-দেয়ে নিতে পার।"

কাঞ্চন যখন তার বাড়ির স্টেশনে পৌছল, তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। সেদিন গাড়ি একটু লেট ছিল। রসিদ দেখাতেই স্টেশন-মাস্টার বললেন—"এসব মাল তো আজ সকালের গাড়িতেই এসে পড়ে রয়েছে। তুমি বুঝি গাড়ি বদলাবার সময় গাড়ি ধরতে পারনি?"

"প্রায় সেইরকম। দেখুন, আমি শুধু আমার সাইকেলটা এখন নেব। বাকি জিনিস-পত্র পরে লোক এসে নিয়ে যাবে, কিংবা আপনি যদি একটা কুলি দিয়ে পাঠিয়ে দেন—"

"তাই দেব।" বলে স্টেশনমাস্টার তার টিকিটখানি নিয়ে চলে গেলেন।

কাঞ্চন সাইকেলটার প্যাকিং খুলে পিছনের ক্যারিয়ারে স্যুটকেসটাকে শক্ত করে বাঁধল। তারপরে সাইকেলে চেপে কাঞ্চন বোঁ বোঁ করে তার বাড়ির দিকে পাড়ি দিল।

১৯

বাড়ি পৌঁছে কাঞ্চন একবার ভাল করে চারিদিক চেয়ে দেখল। কেউ কোথাও নেই। চাকরটাকেও দেখতে পেল না। সাইকেলটাকে বাইরে রেখে পা টিপে-টিপে ভেতরে গেল। মণ্টু, ন্যাপলা—এরাই-বা গেল কোথায়? হয়ত পাড়ায় কোথাও খেলতে গেছে? মা? ঐ যে মা, একটা বই হাতে নিয়ে—ঘুমুচ্ছেন নাকি?—না, জেগেই আছেন যে।

কাঞ্চনকে দেখে মা আনন্দে চেঁচাতে যাবেন, কাঞ্চন তাঁর মুখ চেপে ধরল—"মা, চুপ। বাবা কোথায়?"

"উনি? খেয়ে-দেয়ে ঘুমুচ্ছেন।"

"বেঁচেছি তাহলে।"

"তোর ওপর ওঁর আর রাগ নেই। তুই চলে যাওয়াতে ওঁর মন খারাপ হয়ে গেছে। এ-ক'দিন ভাল করে খেতে পর্যন্ত পারেননি। আমি তো কেঁদে বাঁচিনে! কোথায় ছিলি তুই? তোর জন্যে আশপাশের গাঁ সব তোলপাড় হয়ে গেছে—তোর ক্লাসের সব ছেলেদের বাড়ি—"

"আমি বুঝি এখানে ছিলুম? আমি যে কলকাতায় গেছলুম।"

"কলকাতায়! অবাক করলি! পয়সা পেলি কোথায়?"

"অমনি। আমার কি কোথাও যেতে পয়সা লাগে? কত টাকা রোজগার করে আনলুম—তোমার জন্যে।"

মা'র যেন বিশ্বাস হয় না। অতটুকু ছেলে কাঞ্চন, সে করবে টাকা রোজগার!

"বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখ সোনার হাত-ঘড়ি। এই দেখ ফাউণ্টেন-পেন—এইটেরই দাম পনের টাকা। কেমন নতুন ফ্যাসানের জুতো দেখ।"

"তাই তো!" মা একেবারে অবাক।

"কিন্তু তোর গায়ে এ কী মনি। চটের মত জামা-কাপড় পরেছিস, এ তোকে মানাচ্ছে না!"

"এ বুঝি চট? তুমি হাসালে মা। এ যে খদ্দর। খদ্দর পরলে ভদ্দর হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন। গান্ধী কে জান? খুব মহৎ লোক, বয়সে খুব বড় তবু যেন ছেলেদের মত মন!"

"তা হোক, তবু এ-কাপড় তোর গায়ে সাজে না। তোর জন্যে আমি সিল্কের জামা, তাঁতের কাপড় আনিয়ে রেখেছি।"

"বা-রে, আমি যে প্রথমে ঐ-সব কিনেছিলুম—কিন্তু ভেবে দেখলুম, ওর চেয়ে খদ্দর ভাল। কনক মোটা খদ্দর পরে, আমিও তাই পরলুম। আমার সে জামা-কাপড়গুলো ট্রাঙ্কে তোলা আছে, বিনোদের জন্যে এনেছি। ওকেই দিয়ে দেব।"

"কনক কে ?"

"আমার বন্ধু। তার কথা তোমায় রাত্রে শুয়ে-শুয়ে গল্প করব। তার কথা, মিনির কথা, কলকাতার ভোজের কথা—হ্যাঁ, তোমার জন্যে আমি চমৎকার সন্দেশ এনেছি, তুমি যে লুচি দিয়ে খেতে ভালবাস! ট্রাঙ্কে আছে। খেয়ে দেখ, গাঙ্গুলির সন্দেশ তার কাছে কোথায় লাগে!"

"আমার জন্যে তো সন্দেশ আনলি, তোর বাবার জন্যে কী এনেছিস ?"

"বাবার জন্যে কী আর আনব? কেবল একটা সোনা-বাঁধানো ছড়ি। জানি, ওটা কোনদিন আমার পিঠেই ভাঙবে, তবু আনলুম।"

"আর মণ্টু, ন্যাপলা ?"

"ওদের জন্যে বল, ব্যাট, ট্রাইসিকেল, কতরকম খেলনা, পুতুল, মোটর-গাড়ি—কত কী! তোমার জন্যে কত গল্পের বই এনেছি! সে-সব ট্রাঙ্কে আছে—তিনটে বড় বড় ট্রাঙ্ক বোঝাই কত জিনিস। স্টেশনমাস্টার কুলি দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।"

"এত টাকা পেলি কোথায় ?"

"সে তোমায় সব রাত্রে বলব। ধরে নাও না কেন, ভগবান আমায় দিয়েছেন। এমন কি হয় না ?"

"তা হয়। কলকাতায় কোথায় বেড়ালি? কী কী দেখলি? চিড়িয়াখানা, পরেশনাথের মন্দির, শিবপুরের বাগান—এসব দেখেছিস ?"

"না, সময় পাইনি। তা ছাড়া কোথায় যে ওগুলো আছে জানতুমও না। এত যে হেঁটেছি, কোনদিন পথের ধারেও পড়েনি। পড়লে কি আর না দেখে ছাড়তাম? তবে, এমন একটা জায়গা দেখে এসেছি, যা কলকাতা গিয়েও লোকে দেখতে পায় না।"

"কী জায়গা রে ?"

"রেসকোর্স, সেখানে ঘোড়দৌড় হয়। সে-সব রাত্রে বলব। ভারি মজার গল্প। এখন একটা কথা শুনবে! তোমার পায়ে পড়ি মা!"

বলে কাঞ্চন স্যুটকেস খুলে শাড়ি, জ্যাকেট ইত্যাদি বের করে বলল—"এইগুলো তোমায় পরতে হবে মা।"

"এখনই ?"

"হ্যাঁ, এখনই আমি দেখব।"

ছেলের আব্দার, কী আর করেন, মাকে পরতে হল। কাঞ্চন বললে—"বাঃ, তোমাকে কী চমৎকার দেখাচ্ছে মা! সত্যি! এইবার এই জিনিসটা মুখে মাখো দেখি! এটার নাম হিমানী—একরকম স্নো। এইবার তুমি কৌচটায় বস। আমি তোমায় পুজো করব, অঞ্জলি দেব।"

কাঞ্চন নোটের তাড়া নিয়ে মা'র দিকে ছুঁড়ে দেয়—বৃষ্টির মত চারিদিকে নোটগুলো ছড়িয়ে পড়ে। মা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ে থাকেন, তাঁর মুখ থেকে কথা বেরোয় না!

"কোত্থেকে এত টাকা পেলুম ভাবছ? সে তোমাকে এক কথায় বোঝাতে পারব না। আগে বল দেখি, রেস কয় প্রকার? দুই প্রকার—কিন্তু সে বোঝাতে অনেকক্ষণ লাগবে। বিশু কাকা যেমন লটারিতে অনেক টাকা পেয়েছিল না, আমি একরকম তাই পেয়েছি। না-না, ওগুলো কুড়িয়ো না, অমনি চারিদিকে ছড়িয়ে থাক। তুমি মাকখানে বসে থাক মা!"

মা হতভম্ব হয়ে বসে থাকেন।

"মা, একটা কথা বলব? তোমার কোলে একটু বসব। আমি বড্ড ভারি হয়ে গেছি, তোমার লাগবে কিন্তু।"

কাঞ্চন গিয়ে মা'র কোলে বসে। মা'র গলা জড়িয়ে ধরে। মা কাঞ্চনের কপালে একটা চুমু খান। কাঞ্চন মা'র বুকে মুখ লুকোয়।

মা'র চোখ দিয়ে জল পড়ে।…

কলকাত্তার হালচাল

* *

প্রথম ধাক্কা

হর্ষবর্ধনের বাস-লীলা

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন দুই ভাই, কাঠের কারবারে বড় মানুষ। কর্ম-সূত্রে আসামের জঙ্গলেই চিরটা কাল কাটিয়ে এসেছেন ; এবার ওঁদের শখ হল কলকাতা শহরটা দেখবার। টাকা তো কামানো কম হয় নি, এবার কিছু কমানো দরকার। তা ছাড়া, তাঁরা কিছু ফেরারি আসামী নন যে সারা জন্মটা আসামেই কাটাতে হবে।

কলকাতা শহরটা চোখে না দেখলেও কানে যে শোনেন নি তা নয়। অনেক কিছুই শুনেছেন—অনেক দিন থেকে এবং অনেক দিক থেকে। মোটর-গাড়ির কথা শুনেছেন, বড় বড় গাড়ির কথা শুনেছেন, বায়োস্কোপের কথা শুনেছেন, এমনকি ছবিতে আজ-কাল কথা কইছে এমন কথাও ওঁদের কানে গেছে।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে কলকাতার লোকেরা নাকি মিশুক নয়—পাশের বাড়ির খবর রাখে না, পাড়ার লোককে চিনতে পারে না। রাস্তায় বেরুলে কেবল মানুষ আর মানুষ—কিন্তু আশ্চর্য এই, কেউ কারু সঙ্গে কথা কয় না, উপরন্তু গায়ে প'ড়ে ভাব করতে গেলে বিরক্ত হয়। এমনকি অচেনা কেউ যদি তোমার গায়ে এসে পড়ে, পরমুহূর্তেই দেখবে তোমার পকেট বেশ হালকা হয়ে গেছে। আলাপ না করলেও বিলাপ—কোন-দিকেই রক্ষা নেই।

বাস্তবিক, তাঁদের কলকাতা ব্র্যাঞ্চের কর্মচারী দীর্ঘছন্দে চিঠি লিখে শহরের যা হালচাল জানিয়েছে তাতে ভয়ের কথাই বটে। সবচেয়ে ভাবনার কথা ভাব না করার কথায়—তাঁরা দুই ভাই-ই ভাব করতে মজবুত—চেনা, অচেনা অর্ধ-চেনার সঙ্গে আড্ডা জমাতে তাঁদের জোড়া নেই—সকালে, বিকেলে, দুপুরে এবং অনেক সময়ে গভীর রাত্রে অনর্গল কথা না বললে তাঁদের ভাত হজম হয় না। গল্প করতে তাঁদের ভারি ভাল লাগে—সেজন্য কাজ পণ্ড করতেও তাঁদের দ্বিধা নেই। কথা বলবার জন্য আহার-নিদ্রা ভুলতে প্রস্তুত, অপরকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে প্রস্তুত, এমনকি তার সঙ্গে ঝগড়া করতে পর্যন্ত প্রস্তুত। কিন্তু কলকাতার লোকেরা মিশুক নয় এ খবরে তাঁরা ভারি দমে গেছেন।

কিন্তু দুই ভাই মরিয়া হয়ে উঠেছেন—শহরটা একবার ঘুরে আসবেনই, যা থাকে কপালে।

বড় ভাই বলেছেন—'যদি কলকাতাই না দেখলাম, তবে এসে করলাম কী ? কেবল কাঠ—কাঠ—আর কাঠ, কাঠ কি সঙ্গে যাবে ?'

কাঠের প্রতি নেহাত অবিচার হচ্ছে দেখে ছোট ভাই মৃদু আপত্তি জানিয়েছে—'না দাদা, কাঠ সঙ্গে না গেলেও অন্তিমে কাজে লাগবে।'

বড় ভাই প্রবলভাবে ঘাড় নেড়েছেন—'আমি না-হয় কবরেই যাব, তবু কলকাতাকে একবার দেখে নেব।'

এর পর আর কথা চলে না, কিংবা কথা চললেও কথা বাড়ানোর চেয়ে কলকাতা বেড়ানোর ইচ্ছা ছোট ভাইয়ের মনে তীব্রতর ছিল ব'লে এ ক্ষেত্রে সে চেপে যায়। অতএব একদা অতি প্রত্যূষে আসামের বিখ্যাত বর্ধন অ্যাণ্ড বর্ধন কোম্পানির দুই বড়-কর্তাকে শিয়ালদা স্টেশনে এসে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।

সমস্ত প্ল্যাটফর্মটা এধার থেকে ওধার দু-দু'বার টহল দিলেন, কিন্তু নাঃ, কর্মচারীটার দেখা নেই। কাল দু-দুটো জরুরি তার করে জানানো হয়েছে তবু হতভাগা—

গোবর্ধন বলল—'এমন তো হতে পারে সমস্ত রাত জেগে বেচারাকে হিসেব মেলাতে হয়েছে, ভোরবেলার দিকটায় তাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা যে নিতান্তই এসে পড়ব এজন্য হয়ত সে প্রস্তুত ছিল না—'

হর্ষবর্ধন বললেন—'উঁহু!'

গোবর্ধন ভ্রু কুঁচকে, যেন গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছে এইভাবে, সবচেয়ে শোকাবহ দুর্ঘটনার ইঙ্গিত করল—'কিংবা এমনও হতে পারে যে ব্যাটা কিছুতেই তহবিল না মেলাতে পেরে অবশেষে বাকি যা ছিল মেরে নিয়ে আমরা যখন শিয়ালদায় নামছি তখন হাওড়া দিয়ে সট্‌কে পড়ল ?

হর্ষবর্ধন তথাপি নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন—'উঁ হুঁ হুঁ !'

বড়-বড় গবেষণা এইভাবে পুনঃ-পুনঃ ব্যর্থ হওয়ায় মনে মনে চটে গিয়ে গোবর্ধন বললে—'তবে তুমি কী ভাবছ ?'

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করেন—'কিছু না, কলকাতার হালচালই এই। লোকটা নেহাত মিছে কথা লেখে নি !'

গোবর্ধন বলে—'স্বীকার করি লোকটা কলকাতার, কিন্তু তা ব'লে নিজের মনিবের সঙ্গে মিশবে না—এ কখনও হতে পারে ?'

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের বোকামি দেখে অবাক হন—'কেন, স্পষ্টই তো লোকটাকে এখানে দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে লোকটার কথা সত্যি। এ তো হাতে-হাতেই প্রমাণ। চল্‌, বেরিয়ে একটা মোটর ভাড়া করি।'

দাদার 'লজিকে'র বহর দেখে ভাইও কম অবাক হল না, কিন্তু নির্বাক হবার কথা

তার না হলেও, কথা-কাটাকাটিতে না কাটিয়ে সময়টা মোটরে কাটালেই কাজ দেবে ভেবে আপাতত সে নিজেকে দমন ক'রে ফেলে।

হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন—'চিঠিখানা কাছে আছে তো? বাড়ির ঠিকানা আছে তাতে।'

গোবর্ধন ঘাড় নেড়ে জানায়—'চিঠি নেই, তবে মনে হচ্ছে ১৩/১২ চষা রোড, ভবানীপুর।'

হর্ষবর্ধন অত্যন্ত ভাবিত হন—'কেমন বাড়ি ভাড়া করেছে কে জানে! লোকটা নিজে তো মিশুক নয়ই, হয়ত এমন পাড়ায় বাড়ি দেখেছে যেখানে কথা কইতে গেলে লোকে তেড়ে মারতে আসে!'

গোবর্ধন সায় দেয়—'কিংবা মেশবার ভয়ে তাও আসে না!'

'সেইটাই তো আরো ভাবনার কথা—' কিন্তু হর্ষবর্ধনের ভাবনায় বাধা পড়ে, একজন ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে—'ট্যাক্সি চাই বাবু, ট্যাক্সি?'

'যদি মোটরেই চাপি তাহলে তোমার ওই পুঁচকে গাড়িতে যাব কেন হে? গোবরা, ওই যে ভারি গাড়িখানা খুব ধুমধাড়াক্কা ক'রে আসছে ওইটাকে দাঁড় করা।' হর্ষবর্ধন এক বৃহদাকার অম্‌নিবাসের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেন, 'বড় গাড়িতে বেশি ভাড়া লাগবে, এই তো? কলকাতায় ফুর্তি করতে আসা, টাকার মায়া করলে চলবে কেন?'

শীতের প্রত্যুষের জনবিরল পথে যাত্রীহীন বাসখানা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুটছিল, গোবর্ধনের সঙ্কেতমাত্র দাঁড়িয়ে পড়ল। হর্ষবর্ধন উঠেই হুকুম দিলেন—'চালাও তেরোর বারো চষা রোড। কোথায় জানা আছে তো?'

কণ্ডাক্টর জবাব দেয়—'আমাদের তিন নম্বর বাস ওইদিকেই তো যায়।'

মনিব্যাগ থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের ক'রে হর্ষবর্ধন তার হাতে দেন। কণ্ডাক্টর জানায়—'কিন্তু এর চেঞ্জ তো নেই!'

হর্ষবর্ধন বলেন—'দরকার নেই চেঞ্জ দেবার; সমস্তটাই ওর ভাড়া ধ'রে নাও। চিরকাল মোটর-গাড়ির গল্প শুনে আসছি, আজ সুযোগ হয়েছে, শখ মিটিয়ে চাপব। যত টাকাই লাগুক, কেয়ার করি না আমরা!'

এতক্ষণে গোবর্ধন কথা বলবার ফুরসত পায়—'দিব্যি গাড়ি দাদা, দেখছ কতগুলো সীট, তার ওপরে গদিমোড়া! আবার হাওয়া খেলবার জন্য এতগুলো জানলা! একটা আয়নাও আছে! এমনি একটা মোটর দেশে নিয়ে যাব, কী বল দাদা? মোটর-গাড়ি আর মোটর-বাড়ি একসঙ্গে!'

'আলবত! দেশে নিয়ে যেতে হবে বই কি! যদি চেনা লোকের চোখেই না পড়লাম তবে মোটরে চেপে লাভ কী?'

'এখন যে-কদিন কলকাতায় আছি এই গাড়িখানায় চাপা যাবে, কী বল দাদা ?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়—সে কথা বলতে ? সাত দিনের জন্য এটাকে ভাড়া ক'রে ফেলছি !'

হঠাৎ বাস দাঁড়াল এবং একটি তরুণী ভদ্রমহিলা উঠলেন। হর্ষবর্ধন একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপর ফিস্‌ফিস ক'রে গোবর্ধনকে বললেন—'উঠেছে উঠুক, কিছু ব'লো না যেন। যদি খানিকটা মোটরের হাওয়া খেতে চায় খাক না, ক্ষতি কী ! জায়গা যথেষ্টই আছে।'

মেয়েটি একটি সিকি বের ক'রে কণ্ডাক্টরের হাতে দিতে গেল। হর্ষবর্ধন বাধা দিলেন—'পয়সা কিসের ?'

'খিদিরপুরের ভাড়া।'

'আপনার সিকি আপনি নিজের কাছে রেখে দিন, ওটি আমরা হ'তে দিচ্ছি না ! আপনি আমাদের গাড়িতে উঠেছেন, আমাদের সৌভাগ্য, সেজন্য কোন পয়সা নিতে আমরা অক্ষম।' ব'লে হর্ষবর্ধন গম্ভীরভাবে গোঁফে একবার চাড়া দিয়ে নিলেন।

মেয়েটির বিস্ময় কমতে না কমতেই আবার বাস দাঁড়াল এবং একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি উঠলেন। যেমনি না তিনি মনিব্যাগের মুখ খুলছেন অমনি গোবর্ধন গিয়ে করজোড়ে নিবেদন করল—'মাপ করবেন, পয়সা নিতে পারব না। আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে বসুন, আরামে হাওয়া খান—কিন্তু তার জন্য ভাড়া দিতে দেব না আপনাকে। মনে করুন এটা আপনার নিজের গাড়ি।'

গোবর্ধনের নিজের গোঁফ ছিল না, চাড়া দেবার জন্য দাদার গোঁফ ধার নেবে কিনা সে ভাবতে লাগল।

দু' মিনিটের মধ্যে আরো তিনজন ভদ্রলোক, দুটি অত্যন্ত মোটা মেয়েছেলে এবং আধডজন ফচ্‌কে চ্যাংড়া গাড়িতে প্রবেশ করল। এবার হর্ষবর্ধনের কপালে রেখা দেখা দিল এবং গোবর্ধনের ভ্রূ কুঞ্চিত হল ; বড় ভাই ছোট ভাইকে চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন—'কে বলছিল যে কলকাতার লোকেরা মিশুক নয় ?'

কিছুক্ষণেই বাস বোঝাই হয়ে গেল, হর্ষবর্ধন প্রত্যেক অভ্যাগতকেই সমাদরে অভ্যর্থনা করছিলেন এবং তাদের ভাড়া দিতে নিরস্ত করতে তাঁর কম পরিশ্রম হচ্ছিল না। লোকগুলোর অপব্যয়-প্রবৃত্তি দেখে গোবর্ধন আর বিস্ময় দমন করতে না পেরে দাদাকে তার অভিমত জানাল—'কলকাতার লোকগুলো ভারি খরচে কিন্তু !'

'চলে আসুন। জায়গা যথেষ্টই রয়েছে। আরামে হাওয়া খান। একটি পয়সা দিতে হবে না কাউকে। আমাদের সৌভাগ্য যে আপনারা অনুগ্রহ ক'রে আসছেন।' হর্ষবর্ধন থামবার ফুরসত পান না।

আরও প্যাসেঞ্জার উঠতে লাগল, বাসের দু' ধারের সীট ভর্তি হয়ে গেল, এমনকি

মাঝ-পথে দু' থাক লোক গাদাগাদি দাঁড়িয়ে গেল,—দরজা, ফুটবোর্ড পর্যন্ত ভর্তি হবার দাখিল। অবশেষে একজন চীনাম্যান ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়তেই গোবর্ধন সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল—'দাদা, দাদা, দেখ একজন চীনাম্যান!'

দাদা অদৃষ্টপূর্ব এবং ইতিহাসবিশ্রুত হুয়েন-সাং ফা-হিয়েনের বংশধরটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন—'হুঁ, ওদের দাড়ি হয় না বটে!'

গোবর্ধন যোগ করে—'হ্যাঁ দাদা! কামাবার হাঙ্গামা নেই—ওরাই পৃথিবীতে সুখী!'

এমন সময় কণ্ডাক্টর জানাল যে চষা রোড এসে পড়েছে। দুই ভাই ব্যস্ত হয়ে ঠেলে-ঠুলে কোন রকমে নেমে পড়লেন, নামবার আগে ঘোষণা করলেন—'ওহে, যতক্ষণ এঁরা চাপতে চান চাপুন, যেখানে এঁরা যেতে চান এঁদের নিয়ে যাও। আরও যে টাকা লাগে আমাদের ঠিকানায় এসে নিয়ে যেয়ো—তেরোর বারো চষা রোড, বুঝলে? আর আপনারা, বন্ধুগণ, বিদায়! আরামে ঘুরুন সমস্ত দিন, যত খুশি, যতক্ষণ খুশি! কারুর একটি পাই পয়সা লাগবে না।'

বাস থেকে নেমেই গোবর্ধন প্রশ্ন করল—'কলকাতার হালচাল কী রকম বুঝলে দাদা?'

'হ্যাঁঃ। কে বলে কলকাতার লোকেরা মিশুক নয়? একেবারে মিথ্যে কথা, বাজে কথা, ভুয়ো কথা। মেশার ধাক্কায় আমার দম আটকে যাবার যোগাড় হয়েছিল! শেষকালে একটা চীনাম্যান পর্যন্ত—! আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়ত সাহেব-সুবোরাও এসে উঠত! বাপ রে বাপ! এ রকম গায়ে-পড়া মিশুক লোক আমি দুনিয়ায় দেখি নি! কিন্তু একটা সর্বনাশ হয়েছে—'

গোবর্ধন ব্যস্ত হয়ে ওঠে—'কী? কী? পকেট মেরেছে নাকি?'

'উহু। আমাদের ঠিকানাটা দিয়ে ফেলেছি ওদের! ভারি মুশকিল করেছি। থপ ক'রে বাড়ি ঢুকেই খিল এঁটে দিতে হবে, আর যদি সম্ভব হয় বাড়ির চারধারে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে দেওয়া ভাল। তাতে অনেকটা নিরাপদ। কলকাতার লোক যে-রকম মিশুক দেখছি, বাড়ি চড়াও হয়ে আমাদের সঙ্গে খেতে-শুতে না চেয়ে বসে, কী জানি।'

দ্বিতীয় ধাক্কা

গোবর্ধনের গৃহারোহণ

চওড়া ফুটপাথে উঠেই হর্ষবর্ধন প্রশ্ন করেন—'কাকে জিজ্ঞাসা করি?'

এইমাত্র তিনি গোবর্ধনকে যে দারুণ দুর্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন, তার চেয়েও গুরুতর ভাবনা তাঁর কাঁধে ভর করে—কলকাতার মত শহরে এত ঘর-বাড়ির মধ্যে নিজের 'থাকৃতব্য' জায়গার খোঁজ করা কী ভীষণ ঝকমারি! এই সমস্ত নিদারুণ মিশুক লোকদের মাঝখানে কি ফুটপাথেই শেষে সমস্ত দিনরাত কাটাতে হবে?

গোবর্ধন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়।

'বাড়ির ঠিকানা বাগাবার কী হবে ?' হর্ষবর্ধনের প্রশ্ন হয়।

গোবর্ধন জবাব দেয়—'কেন, বাড়ির ঠিকানা তো পাওয়াই গেছে, এখন ঠিকানার বাড়ি বল !'

'ওই একই কথা, একই কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কাকে ?'

গোবর্ধন যোগ দেয়—'নিরাপদও তো নয় জিজ্ঞাসা করা ! যদি এখন খুড়ো, জ্যাঠা, মাসি, পিসি, মামা, মাস-শাশুড়ি সব নিয়ে এসে হাজির করে আমাদের বাড়ি ? যে রকম সব মিশুক !'

'হুঁ,' হর্ষবর্ধন মাথা চালেন—'বাড়িতে ভারি গোলমাল হবে তাহলে।'

গোবর্ধন আরো বেশি মাথা নাড়ে—'নিজেরা সমস্ত ভাড়া গুনে শেষে চৌকির তলাতেও শোবার জায়গা পাব কি না সন্দেহ !'

'তবে ?' হর্ষবর্ধন মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

গোবর্ধন দাদার দিকে তাকায়—'ফুটপাথে লাট্টু ঘোরাচ্ছে, ওই ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করব ?'

'নিরাপদ তো ?'

'না-হয় যত-রাজ্যের ছেলে—ওর বন্ধুদের সব জুটিয়ে আনবে, এই তো ? তা আসুক গে। ছেলেরা বাড়ির মধ্যে থাকতে খুব কমই ভালবাসে। একবার বাইরে ছাড়া পেলে হয়—তারপর গড়ের মাঠ ব'লে কি একটা দেদার ফাঁকা জায়গা আছে না কলকাতায় ? তুমিই তো বলছিলে ?'

'সনাতনখুড়োর কাছে শুনেছিলাম বটে ! কিন্তু কোন্‌দিকে জানি নে তো।'

'সেইটা জেনে নিয়ে একটা খেলার ছুতো ক'রে ছেলেদের সব ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে গড়ের মাঠে সেইখানে ছেড়ে দিয়ে এলেই হবে।'

হর্ষবর্ধন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আদেশ দেন—'তবে ওকেই বল্ তাহলে।'

দুজনে লাট্টু-নিরত খোকার দিকে অগ্রসর হন—গোবর্ধনই সাহস সঞ্চয় করে—'ওহে খোকা, শোন তো এদিকে !'

খোকার দিক থেকে তীক্ষ্ণ জবাব আসে—'খোকা বললে আমি সাড়া দিই না !'

গোবর্ধন ভড়কে যায়, কিন্তু দাদা পাশে থাকতে ভয়ের কী আছে, এই ভেবে মরিয়া হয়ে ওঠে, তার কম্পিত কণ্ঠ শোনা যায়—'তবে কী ললে তুমি সাড়া দাও শুনি ?'

'খোকা বললে আমি সাড়া দিই না। দেব কেন ? আমি কি খোকা ? খোকা তো যারা দুধ খায় !' ছেলেটি নিজের স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ ক'রে দেয়।

ব্যাপার সহজ নয় বিবেচনা ক'রে এবার হর্ষবর্ধন নিজেই অগ্রসর হন—'ওহে বালক !

খোকা বলা তোমাকে খারাপ হয়েছে আমরা মেনে নিচ্ছি, এখন বল তো এখানে এসব বাড়ির মধ্যে তেরোর বারো কোন্‌টি ?'

হর্ষবর্ধনের গুরু-গম্ভীর আওয়াজে বালকের 'লাট্টুশীলতা' তৎক্ষণাৎ থেমে যায়—'কী বললেন, তেরোর বারো ?'

'হ্যাঁ। তেরোর বারো কিংবা ত্রয়োদশের দ্বাদশ—যেটা তোমার বুঝবার পক্ষে সুবিধে।'

ছেলেটি আর বিস্ময় দমন করতে পারে না—'কী করে জানলেন ? আমিই তো ! আমারই বয়স তেরো, ইস্কুলে বারো লিখিয়েছে !'

এমন সময়ে পাশ দিয়ে একটা পরিচিত সাইকেল যেতে দেখে ছেলেটি হর্ষবর্ধনের প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই মুহূর্তমধ্যে তার পেছনের ক্যারিয়ারে চেপে বসে এবং পরমুহূর্তে বালক ও সাইকেলচালক দুজনেরই টিকি এত দূরে দেখা যায় যে উচ্চৈঃস্বরে জবাব দেবার কোন সঙ্গত কারণ হর্ষবর্ধন খুঁজে পান না।

'গোবরা, বুঝলি কিছু ?'

'উঁহুঁ।'

'তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু নেই দেখছি !'

গোবর্ধন এবার চটে—'বুঝব না কেন ? অনেক আগেই বুঝেছি, বুঝবার এতে এমন কী আছে ? কলকাতার সাইকেলের পেছনগুলো সব ছেলেদের জন্যে রিজার্ভ করা, এই তো ? যে-কোন ছেলে যখন খুশি চাপলেই হল।'

হর্ষবর্ধন বলেন—'তা হতে পারে। কিন্তু ছেলেটারও নম্বর তেরোর বারো—তা কিছু বুঝিছিস ? যেমন ঘর-বাড়ির, তেমনি কলকাতার প্রত্যেক ছেলেরই একটা ক'রে নম্বর আছে—সব মার্কামারা ছেলে !'

ব'লে হর্ষবর্ধন গোঁফে চাড়া দেন। অনন্যোপায় গোবর্ধন, দাদার সঙ্গে সমানে পাল্লা দেবার প্রয়াসে একবার দাড়ি চুলকে নেয়—'থাকবেই তো নম্বর ! কেন, কলকাতার ছেলের কি কিছু কমতি ? এই যত লোক দেখছ তাদের প্রত্যেকের গড়-পড়তা চারটে-পাচটা ক'রে ছেলে—আবার কারু-কারু চোদ্দ পনেরটাও আছে। এত লাখ-লাখ ছেলের মধ্যে পাছে হারিয়ে যায় কি গুলিয়ে যায় সেইজন্যেই তো নম্বর দেওয়া ! এ আর আমি বুঝি নি ? তোমার আগেই বুঝেছি !'

'আমার আগেই বুঝেছিস ?' হর্ষবর্ধনের গোঁফ হস্তচ্যুত হয়—'বটে ? তাহলে তুই আমার আগেই জন্মেছিস, তাই বল্ ? আরে মুখ্যু, আগে না জন্মালে কখনো আগে বোঝা যায় ? তাহলে আমার ইয়া গোঁফ—তোর গোঁফ নেই কেন ?'

এমন জাজ্বল্যমান উদাহরণের বিপক্ষে গোবর্ধনের বাক্‌বিতণ্ডা অগ্রসর হবার পথ পায়

না। কিন্তু হর্ষবর্ধন কি থামবার!—'বড় শক্ত জায়গায় এসে পড়েছিস গোবরা, বুদ্ধি একদম না খেলাতে পারলে কোন্‌দিন মারা পড়বি এখানে। চাই কি, তোকেও নম্বর দেগে দিতে পারে—এখনো তুই ছেলেমানুষ তো! কিন্তু আমার আর ভয় নেই।'

হর্ষবর্ধন পুনরায় গোঁফে হস্তক্ষেপ করেন। গোবর্ধন প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা করে—'ম্যানেজারের চিঠিটার মানে বুঝেছ? বালক লিখতে ভুলে লোক লিখে ফেলেছে। কলকাতার বালকরাই মিশুক নয়। দেখলেই তো—সাইকেল চেপে সটকান দিল!'

হর্ষবর্ধন বলেন—'তোরও যেমন বুদ্ধি তারও তেমনি! আমরা কি এত পয়সা খরচ ক'রে বালকদের সঙ্গে মিশবার জন্যই কলকাতায় এসেছি? এ রকম ভয় দেখাবার মানে? ব্যাটাকে দেখতে পেলেই ডিসমিস করব! আমরা প্রবীণ; প্রাজ্ঞ, প্রাপ্তবয়স্ক লোক—বালকদের সঙ্গে মিশতে যাবই বা কেন? দূর দূর!'

হঠাৎ গোবর্ধন দাদার পিলে চমকে দেয়—'ঐ যে দাদা! আমাদের পাশেই যে তেরোর বারো!'

হর্ষবর্ধন পাশে তাকিয়ে দেখেন, সত্যিই তো, তেরোর বারোই তো বটে! বাঁ-হাতি সম্মুখের বাড়িটার গায়ে পরিষ্কার নম্বর দাগা—১৩/১২, বারোটাকে স্পষ্ট করবার জন্যই মাকে দাঁড়ি দিয়ে দু' ভাগ ক'রে দিয়েছে, তাতে হর্ষবর্ধনের সন্দেহ হয় না। হঠাৎ তার মনে এত পুলকের সঞ্চার হয় যে তিনি ভাইয়ের সমস্ত বোকামি মার্জনা ক'রে ফেলেন। বুদ্ধিহীনতা যতই থাক, দৃষ্টিক্ষীণতা নেই গোবরার।

'ও বাবা! এ যে প্রকাণ্ড বাড়ি! দুজনে এত ঘরে শোবই বা কী করে?'

'আজ এ-ঘরে, কাল ও-ঘরে এই করলেই হবে।' গোবরা যেন সমস্যার সমাধান করে—'সব ঘরগুলোই চাখতে হবে তো একে-একে! তুমি একটায় শুয়ো, আমি একটায় শোবো।'

'উঁহু!' হর্ষবর্ধন প্রবল প্রতিবাদ করেন—'সেটি হচ্ছে না, আমার ভূতের ভয় করবে তাহলে। তোকে আমার কাছে-কাছে থাকতে হবে। এত বড় বাড়িতে রাত্রে একলা থাকা আমার কম্ম না!'

সাহসী গোবর্ধন দাদার দুর্বলতার সুযোগে একটু মৃদু হাস্য করে নেয়—'বেশ, তোমার কাছেই থাকব আমি। কিন্তু তুমি আমায় যখন-তখন বোকা বলতে পাবে না।'

'দূর, তুই বোকা হতে যাবি কেন? আমার ভাই কখনো বোকা হয়!' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের পিঠে চাপড় দেন—'ছেলেটা যেমন বোকা নয়, তুইও তেমনি বোকা নয়।'

দাদার বিরাট পৃষ্ঠপোষকতায় পড়তে পড়তে টাল সামলে নেয় গোবর্ধন—'হ্যাঁ, মনে থাকে যেন। ফের আমাকে বলেছ কি আমি অন্য ঘরে গিয়ে শুয়েছি। কি ছাতেই শুয়ে থাকব গিয়ে, দেখো!'

হর্ষবর্ধনের কণ্ঠ করুণ হয়—'বিদেশে বিভুঁয়ে এসে অমন করিস নে গোবরা। ভূতের

ভাড়ায় কোন্‌দিন হয়ত জানলা টপ্‌কে রাস্তাতেই লাফিয়ে পড়তে হবে আমায়! বিদেশে এসে বেঘোরে প্রাণটা যাবে তাহলে। আচ্ছা, এই কথা রইল, তুই যদি এক গুন বোকা হোস আমি একশো গুন বোকা। তাহলে হবে তো?'

'না, তুমি তাহলে হাজার গুণ।' গোবরা গম্ভীরভাবে বলে।

'বেশ, তাই।' হর্ষবর্ধনের মুখ ম্লান হয়ে আসে।

দাদার ম্রিয়মাণতায় গোবর্ধনের দুঃখ হয়—'আমি হলে তবে তো তুমি হবে। আমি এক গুণও না, তুমি হাজার গুণও না।'

অতঃপর দুই ভাই দরজার সম্মুখে সমাগত হন। দরজায় প্রকাণ্ড ভারি তালা লাগানো। এত কষ্ট ক'রে কলকাতায় এসে গৃহদ্বারে যে এভাবে অভ্যর্থনা লাভ করবেন হর্ষবর্ধন এ রকম আশঙ্কা কোনদিন করেন নি। তিনি অত্যন্ত মুষড়ে পড়েন।

গোবরা বলে—'ভেঙে ফেলব? কী বল দাদা? যখন ভাড়া দেব তখন তো আমাদেরই বাড়ি এখন।'

হর্ষবর্ধন বলেন—'ভেঙে ফেলবি, চৌকিদারে কিছু বলবে না তো?'

গোবরা জবাব দেয়—'কলকাতায় আবার চৌকিদার আছে নাকি?' তবু একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নেয়ঃ 'তিনতলা বাড়ির যদি ভাড়া গুনতে পারি তাহলে সামান্য এক তালা ভাড়ার দাম দিতে পারি না কি?'

'তবে ভেঙেই ফ্যাল্‌।' হর্ষবর্ধন হুকুম দিয়ে দেন।

গোবর্ধন প্রবল পরাক্রমে তালার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে, কিন্তু অল্পক্ষণেই তার বোধগম্য হয়, অসামান্য তালাকে সামান্য জ্ঞান করা তার অন্যায় হয়েছে। মোটা তালাটা যে-দুটি কড়াকে স্বীকার ক'রে রয়েছে সে-দুটি অতি ক্ষীণকায়, অগত্যা গোবর্ধন তালাকে তালাক দিয়ে কড়া ধ'রেই কাড়াকাড়ি শুরু ক'রে দেয়। কিন্তু কেউ ছাড়বার পাত্র নয়। গোবর্ধন ঘেমে, নেয়ে, হাঁপিয়ে ব'সে পড়ে।

হর্ষবর্ধন এবার দরজার ওপর নিজেই পদাঘাত আরম্ভ করেন। দরজা প্রবল প্রতিবাদ জানায় কিন্তু এক ইঞ্চি পিছু হটে না—হটবার কোন মতলব করে না। কাঠের কী কঠোর দুর্ব্যবহার!

তাঁর বিরক্ত কণ্ঠ থেকে বহির্গত হয়—'দূর ছাই! এ কি ভাঙবার দরজা! কলকাতায় ভাল কাঠ রপ্তানি করার ফল দ্যাখ্‌ গোবরা, আমাদের কাঠ আমাদের সঙ্গেই শত্রুতা করছে! ছ্যা ছ্যা!'

গোবরা গুম্‌ হয়ে থাকে।

হর্ষবর্ধন বলতে থাকেন—'এবার থেকে কাঠ পচিয়ে ঘুণ ধরিয়ে পাঠাব তেমনি! আমাদের ম্যানেজার কি আর সাধে বার-বার ক'রে লিখে পাঠায় যে কলকাতায় ভালো

কাঠ পাঠাবেন না, পাঠাবেন না, এখানে ভালো কাঠ চালিয়ে তেমন লাভ নেই, খেলো কাঠ পাঠালে ভালো হয়! এখন তার মানে বুঝছি! হুঁ, হাড়ে হাড়ে বুঝছি! হর্ষবর্ধন পাদচারণা শুরু ক'রে দেন।

গোবর্ধনের প্রাণে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়—'আচ্ছা দাদা, বাড়ির গা দিয়ে একটা লোহার পাইপ দেখলাম না—সটান গিয়ে ছাদে উঠেছে?'

'হ্যাঁ, দেখলাম তো।'

'আমি ওই ধরে ছাদে উঠি গিয়ে, তারপর নেমে এসে ভেতর থেকে একটা জানলা খুলে দেবো, তুমি তখন ঢুকো, কেমন?'

'পারবি উঠতে?'

'আমার তালগাছে ওঠা অভ্যাস, নারকোল গাছেও উঠেছি; খেজুর গাছেই কেবল উঠি নি কখনো।'

তখন দুই ভাই বাড়ির পাশে এসে দাঁড়ান। হর্ষবর্ধন পাইপের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ ক'রে নেন—'হ্যাঁ, ছাদ পর্যন্তই গেছে বটে, কিন্তু পাইপ বেয়ে ওঠা কি সোজা? পারবি তো?'

গোবর্ধন বলে—'ওঠার চেয়ে নামাই সুবিধে বোধহয়। সর্‌সরিয়ে নেমে গেলেই হল।'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'তা বটে। কিন্তু না উঠলে নামবি কী ক'রে?'

'তাই করি, কী বল দাদা? বারকতক উঠি আর নামি, কেমন? বেশ মজা হবে!'

'হুঁ, খুব ভালো একসাইজ। ওতে তোর সাইজও বাড়বে। কাল থেকে ওটা করিস, আজ একবার উঠেই চট্ করে জানলাটা খুলে দে বরং। কেবল রেলে চেপে তখন থেকে গা ঝিম্-ঝিম্ করছে। ভেতরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক ততক্ষণ। কিন্তু দেখিস, সাবধান, পা ফসকে পড়ে যাস না যেন।'

গোবর্ধন পাইপস্থ হয়। যুগপৎ তার হস্তক্ষেপ আর পদক্ষেপ চলতে থাকে। হর্ষবর্ধন হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকেন।

তৃতীয় ধাক্কা

গৃহপ্রবেশ ও শেষরক্ষা

পাইপ-পথে গোবর্ধন ঊর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হয়, হর্ষবর্ধন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন—কখন জানলা-যোগে গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যায়, তবু গোবর্ধনের দেখা নেই। হর্ষবর্ধনের ভয় হয়, অত বড় বাড়িতে হারিয়ে গেল না তো! ভাবতে থাকেন, কী সর্বনাশ দেখ দেখি! ঐ প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করা কী সোজা কথা! আর তাছাড়া খুঁজবেই বা কে! অত বড় ভুঁড়ি নিয়ে খাড়া পাইপ বেয়ে ওঠা

হর্ষবর্ধনের কর্ম নয়। শেষটা কি ভাই খুইয়ে আসামীর মত তাঁকে আসামে ফিরে যেতে হবে! তাঁর চোখ-মুখ কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে আসে।

কিন্তু না—একটু পরে একতলার একটা জানলার ছিটকিনি খুলে যায়। গোবর্ধন বত্রিশ পাটি দাঁত বহিষ্কৃত ক'রে দাদাকে অভ্যর্থনা জানায়। হর্ষবর্ধনের ধড়ে প্রাণ আসে, কিন্তু গোবর্ধনের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে যায়—'তোমার পেছনে ও কী দাদা?'

হর্ষবর্ধন পেছনে তাকিয়ে দেখেন, বিরাট জনতা। তারা যে গোবর্ধনের পাইপ-লীলা দেখবার জন্যেই দাঁড়িয়েছে এ কথা তাঁর মনে হয় না—মুহূর্তমাত্রের মস্তিষ্ক-চালনায় যে বিপজ্জনক আশঙ্কার আভাস তাঁর চিত্তলোকে চমকে যায় তারই আতঙ্কের ধাক্কায় তিনি পড়ি-কি-মরি হয়ে জানলার দিকে হন্যে হন। ছুটে গিয়ে জানলার অভিমুখে দুই হাত বাড়িয়ে দেন, আঁকড়ে উঠবার চেষ্টা করেন—কিন্তু কেবল হাতাহাতি করাই সার হয়, জানলা তাঁকে আদপেই আমল দিতে চায় না। জানোয়ার ব'লে এতদিন যাদের ঘৃণা ক'রে এসেছেন, মনুষ্য-পদ-বাচ্য হর্ষবর্ধন এখন তাদের প্রতিই ঈর্ষান্বিত হন—হাতকে পায়ের মত ব্যবহার করার দুর্লভ কায়দা কেবল তারাই করতলগত করেছে!

গোবর্ধন দাদার সাহায্যে অগ্রসর হয়—দাদার করমর্দন করে। গোবর্ধনের চেষ্টা থাকে দাদাকে টেনে তুলতে, দাদারও চেষ্টা থাকে ঠেলে উঠতে কিন্তু পৃথিবীর দুশ্চেষ্টা থাকে হর্ষবর্ধনকে ধরাশায়ী করবার। গোবর্ধন এবং মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে তুমুল পাল্লা চলে—হর্ষবর্ধন বেচারার প্রাণান্ত হয়। তিনি বাঁচলেও তাঁর ভুঁড়ি বোধহয় আর বাঁচে না এ-যাত্রা! এ রকম অবস্থায় মরিয়া হয়ে উঠতে মানুষের কতক্ষণ? জলে পড়লে হর্ষবর্ধন যেমন কুটোকে অবলম্বন করতে দ্বিধা করতেন না, স্থলে পড়ায় এখন তেমনি গোবর্ধনকে কুটো জ্ঞান করে ঝুলে পড়েন। গোবর্ধন দাদার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসাৎ হয়।

হর্ষবর্ধন বলেন—'পড়লি তো? এই ভয়ই করছিলাম আমি। গায়ে যদি হতভাগার একটু জোর থাকে।'

গোবর্ধন সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

'আবার তো সেই পাইপ বেয়ে উঠতে হবে? সে কি চারটিখানি কথা?'

গোবর্ধন বলে—'আচ্ছা, আমি না হয় পাইপ বেয়েই উঠব, তুমি কিন্তু এক কাজ কর। আমি কুঁজো হচ্ছি, তুমি আমার পিঠে চড়ে উঠে পড় না কেন?'

'পারবি তো? হর্ষবর্ধন দ্বিধা বোধ করেন—'দেখিস, পৃষ্ঠ-ভঙ্গ না হয়ে যায়। বাড়ি গেলে বাড়ি পাব, দাড়ি গেলে দাড়িও পাওয়া যায় কিন্তু তুই গেলে আর তোকে পাব না!' হর্ষবর্ধনের মুখের ভাব ভারি হয়ে আসে।

'তুমি ওঠ না দাদা!' গোবর্ধন দাদাকে উৎসাহিত করে, 'এ কুঁজো কি সহজে ভাঙবার? এ তোমার মাটির কুঁজো নয়।'

'তাহলে উঠছি কিন্তু। উঠি ?' হর্ষবর্ধন বারংবার পুনরুক্তি করেন—গোবরা বারংবার অনুমতি দেয়। অবশেষে আর কোন উপায় না দেখে পিঠের উপর একটা পা রাখেন, তখনই নামিয়ে নেন ; আবার পদক্ষেপ করেন, কেবল মায়া হয়, আবার নামিয়ে নেন।

'তাড়াতাড়ি কর দাদা।' গোবর্ধন ফিস্‌ফিস্ করে—'দেখছ না, কত লোক দাঁড়িয়ে গেছে।'

'ওদের মতলব বুঝেছি।' হর্ষবর্ধন জবাব দেন।

'বিনে পয়সায় সার্কাস দেখে নিচ্ছে।'

'উঁহু, তা নয়। বাড়ির ভেতরে যাই, তারপর বলছি।'

'দাদা, ভারি দেরি করছ তুমি। লোকগুলো তেড়ে না আসে শেষে!' গোবরা অনুচ্চ কণ্ঠে ভয় দেখায়।

লোকগুলো তাড়া করতে পারে এ রকম দুঃসম্ভাবনা হর্ষবর্ধনেরও মনে হয়েছে। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব করেন না, গোবর্ধনের পিঠের উপর চেপে বসে পড়েন, তারপর আর দাঁড়াতে বড় দেরি হয় না—জানলাও সহজে তাঁর নাগাল পায়। হর্ষবর্ধন-ভারে গোবর্ধন যেন আরো ঝুঁকে পড়ে—হয়ত না-মাটির কুঁজোও ভাঙবার মত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রুখে ওঠবার তরফে চেষ্টা থাকায় কোন রকমে ভারসাম্য হয়ে যায়।

জানলার অন্তরালে দাদার মহাপ্রস্থানের পথে গোবর্ধন একটা ঝোঝুল্যমান ঠ্যাং ধরে ফেলে। হর্ষবর্ধন ঠ্যাং নিয়েই ওঠেন, মানে, অতগ্যা তাঁকে উঠতে হয়, তখন আর অন্য উপায় কী ? গোবরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায়—অবলীলাক্রমে।

'দেখলে, কেমন দুজনারই ওঠা হল!' গোবরা বলে : 'পা দিয়েই পাইপের কাজ সারলাম।'

হর্ষবর্ধন সে কথার উত্তর দেন না, অনাহত ভুঁড়ি এবং আহত পায়ের শুশ্রূষা করতে থাকেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে হয়—'কী সর্বনাশ! এখনও খুলে রেখেছিস ? বন্ধ ক'রে দে জানলা!'

গোবর্ধন ক্ষিপ্রগতিতে গিয়ে জানলা বন্ধ করে : 'কেন ? লাফিয়ে আসবার ভয় করছ ?'

'করছিই তো! কারা, এখনো বুঝতে পারিস নি ?'

'না তো!' গোবর্ধন মূঢ়ের মত তাকায়।

'সেই বাসের সব লোক!'

'অ্যাঁ ?' গোবর্ধন তাড়াতাড়ি একটা খড়খড়ি ফাঁক ক'রে দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেয়—'সত্যিই তো! সেই চীনেম্যানটা পর্যন্ত দাদা! দলে বেশ ভারি হয়ে এসেছে এখন!'

'এখানে থাকবার মতলবে।' হর্ষবর্ধন রহস্যটা প্রকাশ ক'রে দেন : 'বুঝেছিস ? সব বিনে ভাড়ায়।'

গোবর্ধন অসন্তোষ উন্মুক্ত করে—'গাড়ি চড়লি অমনি-অমনি, হাওয়া খেলি—হল। তার ওপর আবার বাড়ি চড়াও। আবদার কম না তো এদের।'

হর্ষবর্ধন জানলার খিল এঁটে দেন—'আর ভয় নেই।'

গোবর্ধন যোগ করে—'থাক দাঁড়িয়ে। কতক্ষণ আর থাকবে?'

'পাইপ বেয়ে উঠবে না তো?' হর্ষবর্ধনের আশঙ্কা হয়: 'কী মনে করিস তুই?'

'উঠুক গে।' গোবরা দাদাকে ভরসা দেয়—'চল আগে থেকে ছাদের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আসি। থাকতে চায় থাকুক গে ছাদে। বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছি না তো—হ্যাঁ!'

দুই ভাই তড়িৎগতিতে সিঁড়ি অতিক্রম করতে থাকেন। সর্বোচ্চ দরজাটি অর্গলিত ক'রে তবে দুজনের দুশ্চিন্তা দূর হয়।

গোবরা ব'লে চলে—'এখন পাইপ বেয়ে ওঠ আর পাইপ বেয়ে নামো। বাড়িতে ঢোকার ফাঁক রাখি নি বাপু! চীনেম্যান নিয়ে এসে ভয় দেখানো হচ্ছে আমাদের। বটে? এবার চীনেম্যানগিরি বেরিয়ে যাবে।'

হর্ষবর্ধন কিছু বলেন না, নীরবে হাঁপান।

অনন্তর দুই ভাই বিভিন্ন ঘর পরিদর্শনে বহির্গত হন। প্রত্যেক কামরাতেই খাট, পালঙ্ক, দেরাজ, ডেস্ক, আয়না ও আলমারি, নানা প্যাটার্নের টেবিল চেয়ার ইত্যাদি নানান ফার্নিচারের ছড়াছড়ি।

'আমাদের দামি দামি কাঠ কিনে এনে ভেঙেচুরে ট্যারা-বাঁকা ক'রে কী সব করেছে দেখছিস?' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের অভিমত আকর্ষণ করেন।

গোবর্ধন ঠোঁট বাঁকায়—'কেবল কাঠের শ্রাদ্ধ।'

'সোজাসুজি চৌকি করলি, টুল করলি, চারকোণা টেবিল করলি, ফুরিয়ে গেল—এত মারপ্যাঁচ কেন রে বাপু।'

'দরকার তো শোবার, বসবার আর কখনও কদাচ দু-এক কলম লেখবার। কাজ চলে গেলেই হল!'

'হ্যাঁ, কাজ চলা নিয়েই কথা। কিন্তু এসব কী।' অকস্মাৎ যেন তাঁর পিলে চমকে যায়। 'কাঠগুলোর কী সর্বনাশ করেছে রে গোবরা। ঐ দ্যাখ্ একটা গোল টেবিল—মোটে তিনটে পা!'

গোবরা বিরক্তি প্রকাশ করে—'তিন পায়া তো পদে আছে, ঐ কোণেরটা দেখেছ?'

হর্ষবর্ধন সবিস্ময়ে দেখেন, একটা টেবিলের মোটে একখানা পা—তাও আবার ঠিক মধ্যিখানে—তারই সাহায্যে বেচারা কোন রকমে কায়ক্লেশে দাঁড়িয়ে আছে।

গোবর্ধন বলে—'ও টেবিল কোন্ কাজে লাগবে? ওতে কি বসা যাবে?'

হর্ষবর্ধনও সহানুভূতি জানান—'হুঁ, বসেছ কি কাৎ, আর চিৎপাৎ!'

হঠাৎ হর্ষবর্ধনের আকস্মিক উল্লাস হয়—'দেখলি, দেখলি—কেমন পদ্য হয়ে গেল! বসেছ কি কাৎ, আর চিৎপাৎ!'

হর্ষবর্ধন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে কবিতাটা আবৃত্তি করেন, গোবর্ধনও করে। তারপর দুই ভায়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়তে থাকেন।

গোবর্ধন বলে—'আবার মিলেও গেছে কেমন! কোনো খবর-কাগজে ছাপতে দাও! বেশ পদ্য!'

দুই ভাইয়ের মনে বাল্মীকি-সুলভ আনন্দের সূচনা হয়—বাল্মীকির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হবার পরই যে রকম আনন্দ হয়েছিল ব'লে শোনা গেছে।

তারপর দু'ভাই একটা বড় ঘরে আসে। হর্ষবর্ধন বলেন—'একটু বসা যাক।'

দুটো চার-পায়া টেবিল—যাদের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই—এখন পাশাপাশি টানা হয়। একটা হর্ষবর্ধন অধিকার করেন, আর একটাতে গোবরা বসে।

'চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসা কি আমাদের পোষায় বাপু? ছড়িয়ে না বসলে বসার আরাম।'

'নিশ্চয়ই তো। এমন আসনে বসতে হবে যে যখন খুশি ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়াও শক্ত নয়।'

'খাবার দরকারের মত ঘুমোনোর দরকারও তো মানুষের প্রতি পদেই। গোবরা, ঐ গদি-আঁটা কিম্ভূতকিমাকার চেয়ারদুটো নিয়ে আয় তো। পা রাখার অসুবিধা হচ্ছে।'

পা রাখার সুবিধার জন্য চেয়ার আসে। দুই ভাই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকেন। সামনের প্রকাণ্ড আয়নায় হর্ষবর্ধনের প্রতিচ্ছায়া পড়ে—আয়নার ভেতরের আর বাহিরের হর্ষবর্ধনেরা পরস্পরের দিকে তাকান আর নিজের নিজের গোঁফে চাড়া দেন। গোবর্ধন দাদাদের কাণ্ড দেখে।

অদূরদেশে থেকে জুতোর আওয়াজ আসে। হর্ষবর্ধন অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেন—'তারাই! বুঝতে পেরেছিস?'

'তালা ভেঙে ঢুকেছে তাহলে! কী হবে এখন?'

হর্ষবর্ধন হাল ছেড়ে দেন—'কী আর হবে! থাকতে দিতে হবে! তোদের কলকাতার যেমন হালচাল তাই তো হবে!'

গোবর্ধন প্রতিবাদ করে—'আমাদের কলকাতা! এমন কথাও বোলো না! আসামের খাসা জঙ্গল থাকতে এমন জায়গায় আবার মানুষ আসে! ছ্যা ছ্যা!' গোবর্ধন যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত হয়।

গোবরা দরজার ফাঁক দিয়ে সন্তর্পণে মুখ বাড়িয়ে দেখে, আগন্তুক মোটে একটি লোক এবং একমাত্র। তার সাহস হয়, হাঁক ছাড়ে—'কে?'

লোকটা চম্‌কে যায়, পালাবে কি দাঁড়াবে ইতস্তত করে—বিড়-বিড় ক'রে কি যে বলে কিছুই বোঝা যায় না।

হর্ষবর্ধন সম্মুখীন হন—'অমন হাঁ করে আমাদের দেখবার কী আছে? ভয় পাবারই বা কী আছে? কলকাতার লোক ভারি অসভ্য বাপু তোমরা!'

ভূত নয় অদ্ভুত কিছু, এইরকম একটা আঁচ ক'রে এতক্ষণে লোকটার ভয় কমে, তার কম্পিত অভ্যন্তর থেকে অস্পষ্ট ধ্বনি বিনির্গত হয় —'কে আপনারা?'

'পরিচয়টা দিয়ে দাও না দাদা!'

'বর্ধন কোম্পানির বড় কর্তা আর ছোট কর্তা। আমি শ্রীহর্ষবর্ধন আর ও গোবরা—।'

'উঁহু, শ্রীযুক্ত গোবর্ধন। এখন বল তো বাপু, তুমি কে? কড়িকাঠ থেকে নেমেছ বলেই মনে হচ্ছে যেন! ভূত-পেরেত নও তো?'

ভদ্রলোকটি আমতা আমতা করে—'না, আমি কর্মচারী।'

'অ্যাঁ? কর্মচারী!' হর্ষবর্ধন লাফিয়ে ওঠেন—'বলি বাপু, এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল? শিয়ালদহে সকালে যাওয়া হয় নি কেন? মনিব আমি, আর আমার সঙ্গেই মিশতে চাও না এতদূর তোমার আস্পর্ধা—তারপরে তুমি তবিল মেরে সটকেছ—'

'হুঁ, আমরা যখন শিয়ালদয়ে নামছি তখন হাওড়া দিয়ে সটকানো হয়েছে।' গোবর্ধনেরও রোখ চেপে যায়।

'যাও, তোমাকে ডিসমিস করলুম!' হর্ষবর্ধন হুকুম পাশ করেন—'তবিল যা মেরেছ তা মেরেছ, তা আর ফেরত চাই না। টাকা ওড়াবার জন্যেই আমাদের কলকাতায় আসা—ওটা এখানকার বাজে খরচের মধ্যেই ধরে নেব।'

'হ্যাঁ, মেরে থাকো ভালোই করেছ, কিন্তু জবাব হয়ে গেল তোমার। ব্যস, খতম।' গোবর্ধনও রায় দিয়ে দেয়।

এতক্ষণে লোকটা কথা বলবার ফাঁক পায়—'আজ্ঞে আপনারা ভুল করেছেন, আমি আপনাদের লোক নই। এই বাড়ির মালিকের কর্মচারী আমি।'

হর্ষবর্ধন হতভম্ব হয়ে যান, উনি ছাড়াও পৃথিবীতে আরো লোক কর্মচারী রাখে—এও কি সম্ভব? কিন্তু ক্রমশ এ কথাটাও তাঁর বিশ্বাস হতে থাকে। তিনি নিজেকে সামলে নেন, কিন্তু গোঁ ছাড়েন না—'তাহলেও বলি বাপু, তোমার এ কী রকম আক্কেল! আমরা হলুম ভাড়াটে—আর আমাদের তালাবন্ধ ক'রে পালিয়েছ?'

'এটা কি উচিত?' গোবরাও কৈফিয়ত চায়।

লোকটা নমস্কার করে—'ও! আপনিই বুঝি মিস্টার নন্দী?'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'উঁহু, নন্দী নই।'

গোবর্ধন যোগ করে—'ভৃঙ্গীও নই, আমরা হচ্ছি বর্ধন। আসামী, কিন্তু ফৌজদারী আসামী নই। আসামের লোক বলেই আসামী।'

লোকটা বলে—'জমিদার গোঁয়ারগোবিন্দ সিং এ বাড়ি ভাড়া করেছেন—আপনি তাঁরই ম্যানেজার তো?' একটু থামে—'কিংবা আপনিই বাবু গোঁয়ারগোবিন্দ সিং কি না কে জানে!'

'অত শিং নাড়ছ কেন বল তো হে! আসামের হাতির দাঁত ধরে ঝুলি, শিং দেখে ভয় খাবার ছেলে নই আমরা!' গোবরা দাদার সঙ্গে যোগ দেয়—'তেরোর বারো নম্বরের এই বাড়ি আমাদের ম্যানেজার ভাড়া করে গেছে।'

লোকটা গোবরার মন্তব্যের প্রতিবাদ করে—'তাহলে আপনারা ভুল বাড়িতে এসেছেন মশাই! এ তো ও নম্বর নয়!'

'আলবত ওই নম্বর! নিজের চোখে দেখা, বললেই হবে?'

'তুমি তো ভারি মিথ্যেবাদী হে।' গোবরা বলে—'তোমার আর দোষ কী দেব, তোমাদের দেশেরই এই স্বভাব। একজন তো চিঠি লিখেছেন যে কলকাতার লোকেরা মিশুক নয়। কী রকম যে মিশুক নয় তা হাড়ে হাড়ে জেনেছি!'

'তুমি বলছ ভাড়া করি নি, বেশ, ভাড়া করছি। এখনই ক'রে ফেলছি, এই দণ্ডে। গোবরা, নোটের তাড়াটা বের কর তো? কত ভাড়া তোমার?'

'কী করে আপনাকে এ বাড়ি দেব মশাই? মিঃ সিং যে বায়না করে গেছেন।'

হর্ষবর্ধন অবাক হন—'সিং-এর বয়স কত?'

'মিঃ সিং দাঁড়াশের জমিদার, শুনেছি খুব বুড়ো মানুষ।'

'ছেলেরাই তো বায়না করে শুনে আসছি চিরদিন—কলকাতার বুড়ো মানুষরাও আবার,—অ্যাঁ, এ বলে কী গোবরা?'

গোবরাও বিস্মিত হয়—'বুড়ো মানুষের বায়না! আজব শহরে এসে পড়া গেছে দাদা!'

'সে বায়না নয় মশাই, এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দাদন দিয়ে গেছেন। দুশো বত্রিশ টাকা।'

'বেশ, আমরাও না হয় দাদন দিচ্ছি। ডবল দাদন। দিয়ে দে তো গোবরা চারশো বাহাত্তর টাকা!'

গোবরা গুণে গুণে নোট দেয়—'গেল এ মাসের দাদন। আবার আসছে মাসে দেব—অবশ্য যদি থাকা হয়। মাসকাবারি এসে নিয়ে যেয়ো তোমার দাদন।'

নোটের গাদা দেখে লোকটার মুখ সাদা হয়ে যায়, সহজে কথা বেরোয় না। অনেক কষ্টে বহুক্ষণ পরে বলে—'বেশ, মিঃ সিং-এর জন্য অন্য বাড়ি দেখতে হবে তাহলে। তিনি আজই দাঁড়াশ থেকে রওনা হবেন কিনা! কাল এখানে পৌঁছনোর ঠিক আছে।'

হর্ষবর্ধন কি যেন চিন্তা করেন—'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব বাপু? কিছু মনে কোরো না। তোমাদের এই শহরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা কী রকম? একটা ব্যবস্থা আছেই, না খেয়ে কেউ বাঁচে না নিশ্চয়ই?'

গোবর্ধন বলে—'না খেয়ে আবার নাকি বাঁচা যায়! তুমি কী যে বল দাদা! খেতে না পেলে লোকে বাঁচতে চাইবেই বা কেন? খাবার জন্যই তো বেঁচে থাকা!'

লোকটি জবাব দেয়—'হ্যাঁ, আছে বৈকি! ভালো ভালো পাইস হোটেল আছে। সেখানে এক পয়সার ভাত, এক পয়সায় ডাল, ঝাল, ঝোল, অম্বল, তরকারি, চচ্চড়ি, শুক্ত পল্‌তা, মাছের ঘণ্ট, কপির তরকারি—যা চাই সব এক-এক পয়সায় পাবেন।'

'কলকাতার লোক সব সেখানেই গিয়ে খায় বুঝি? বাঃ, বেশ তো!'

গোবরা ঘাড় নাড়ে—'অনেক পয়সা খরচ হয় কিন্তু!'

'যার যেমন খুশি,' লোকটা ভরসা দিতে চায়—'কেউ ইচ্ছে করলে তিন পয়সার খেয়েও চলে আসতে পারে, কেবল ভাত আর ডাল।'

'কতদূর সেই হোটেল?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন।

'একটু দূর আছে, জগুবাবুর বাজারের কাছটায়।'

'দেখ, আমরা আজ অনেক খেটে-খুটে আসছি দেশ থেকে—গোবরাকে তার ওপরে আবার বাড়িতে চড়তেও হয়েছে। আমাদের আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। তুমি যদি বাপু দয়া ক'রে এখানে আমাদের কিনে এনে দিয়ে যাও তাহলে বড়ই বাধিত হই। তোমাকে টাকা দিচ্ছি অবশ্য।'

গোবরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'যতরকম খাবার সব এক-এক পয়সার এনো—দুশো পাঁচশো যতরকম আছে। সকাল থেকে ভারি খিদেও পেয়েছে দাদা।'

'গোটা-পাঁচেক টাকা দিলে কুলোবে? দে তো গোবরা টাকাটা।'

'খুচরো তো নেই দাদা! খুচরো নেই বলেই তো ওকে চারশো বাহাত্তরের জায়গায় চারশো আশি দিতে হয়েছে।'

'তবে তো ঐখানেই আটটা আছে।' হর্ষবর্ধন উল্লাসিত হন—'সত্যি গোবরা, তুই নিজের খেয়ালে কাজ করিস বটে কিন্তু এক-এক সময়ে এমন বাঁচিয়ে দিস যে তোকে কোলাকুলি করতে ইচ্ছে হয়ে যায়!'

কোলাকুলির প্রস্তাবে গোবর্ধন ভীত হয়; এত হাঙ্গামার পর যদি বিরাট ভুঁড়ির ধাক্কা সামলাতে হয় তাহলেই ও কাবার! তার উপর আবার খিদে পেটে!

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে সে—'তাহলে বাপু, একটু চট্ ক'রেই আন গে। টাকা পাঁচেকের সব পাইস খাবার, আর যে তিন টাকা বাঁচল তুমি নিয়ো। কেমন?'

এ রকম কষ্ট স্বীকারে লোকটার বিশেষ আপত্তি দেখা যায় না। 'বেশ, আপনারা ততক্ষণ

নেয়ে-টেয়ে নিন, আমি এসে পড়লুম বলে।' সে চ'লে যায়—তার পুলকিত পদধ্বনি হর্ষবর্ধনকে বিস্মিত করে।

'এখানকার লোকগুলো অদ্ভুত, একটুতেই খুশি। যা করতে বলবি তাতেই রাজী হয়ে রয়েছে, কেবল বলবার অপেক্ষা!'

'তার উপর ইংরিজি বিদ্যে একফোঁটাও নেই পেটে। নাইস হোটেলকে বলছে পাইস হোটেল। নাইস মানে ফাস্‌কেলাস,—জান তো দাদা?'

'তোর জন্মাবার আগে থেকে জানি!' বলতে বলতে হর্ষবর্ধন টেবিলের ওপর লম্বা হন—তাঁর হাই উঠতে থাকে।

চতুর্থ ধাক্কা

বাইশকোপে—মানে, বাইশজনের কোপে শ্রীহর্ষবর্ধন!

সেদিন বিকালের কাহিনী। দুই ভাই গভীর পরামর্শে বসেছেন। আলোচ্য বিষয়, এবার কী করা যায়? নিশ্চয়ই এখনও কলকাতায় আরো অনেক কিছু দেখবার, শোনবার, যাবার এবং চাপবার বস্তু রয়েছে, কিন্তু সে সবের সদ্ব্যবহার করবেন কী করে? জীবনে এই প্রথম তাঁদের কলকাতায় আসা এবং এই হচ্ছে প্রথম দিন। এরই মধ্যে কলকাতার হালচাল যা তাঁরা টের পেয়েছেন সেই সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়েই দুই ভাইয়ের আলোচনা চলছিল।

বাস্তবিক, তাঁরা তো নিতান্ত কেউকেটা লোক নন! আসামের বিখ্যাত বর্ধন অ্যাণ্ড বর্ধন কোম্পানির বড় দুই অংশীদার। কলকাতায় এসেছেন ফুর্তি করতে—টাকা ওড়াতে। হ্যাঁ, এ পর্যন্ত জীবনে অনেক টাকা তাঁরা কামিয়েছেন, এবার কিছু কমিয়ে যাবেন, এই ওঁদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এজন্য কলকাতার যত কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, গন্তব্য এবং চাপ্‌তব্য বিষয় আছে সব তাঁরা দেখবেন, শুনবেন, যাবেন এবং চাপবেন—সেজন্য যত টাকা লাগে দুঃখ নেই। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ওঁদের স্থির সঙ্কল্প।

কিন্তু টাকা ওড়াবার জো কী! টাকা এমন চীজই নয় যে উড়িয়ে দিলেই উড়ে যাবে। গোবর্ধন একবার দুশ্চেষ্টা করেছিল দেখতে, টাকা আকাশে ছুঁড়ে দিলে উড়ে যায় কি না—কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখা গেল তা হাতেই এসে পড়ে, কিংবা হাতের নিতান্ত কাছাকাছি। তা ছাড়া কলকাতার মত জায়গায় টাকা ওড়ানো ভারি কঠিন, হর্ষবর্ধন তাঁর ভাইকে এই কথা বোঝাতে চাচ্ছিলেন: 'দেখলি না সকালে, আমরা দশ টাকা দিয়ে মোটর ভাড়া ক'রে অমনি হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছি কিন্তু লোকগুলো গায়ে প'ড়ে সেধে পয়সা দিতে আসে?'

গোবর্ধন ঘাড় নেড়ে জানায়—'হুঁ, টাকা জিনিসটা উপায় করা সহজ, কিন্তু ওড়ানোই দেখছি কঠিন!'

'বিশেষত কলকাতার মত জায়গায়। এখানকার বোকাদের ঠকিয়ে বেশ দু' পয়সা করা যায়! লোকে যে বলে কলকাতার পথে-ঘাটে পয়সা ছড়ানো আছে—নেহাত মিথ্যে নয়!'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু আমাদের পয়সারই যে অভাব নেই, এই হচ্ছে দুঃখের বিষয়।'

'হুঁ, হঠাৎ কোনগতিকে গরিব হয়ে যেতে পারলে আবার ব্যবসা ফেঁদে এখানে বেশ বড়লোক হওয়া যেত। কিন্তু যা টাকা জমেছে, আর কি গরিব হওয়া সম্ভব?' হর্ষবর্ধন উৎসুকচিত্তে গোবর্ধনকে প্রশ্ন করেন।

ছোট ভাই দীর্ঘনিশ্বাস মোচন ক'রে বলে—'এ জন্মে তো নয়!'

হতাশ হ'য়ে বড় ভাই চুপ ক'রে থাকেন। খানিক বাদে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—'তা ব'লে কি এমনি করেই হাত-পা গুটিয়ে হাল ছেড়ে ব'সে থাকতে হবে? চেষ্টা করতে হবে না? চেষ্টার অসাধ্য কী আছে? কিন্তু আজ কলকাতায় এসেছি—সমস্ত দিনে আর কতই বা খরচ হয়েছে এ পর্যন্ত! এত কম খরচ হলে চলবে কেন? এইজন্যেই কলকাতায় আসা? নতুন নতুন উপায় করতে হবে না টাকা ওড়াবার? মানিব্যাগটায় দু-পাঁচশো যা ধরে নিয়ে নে, চল্ বেরিয়ে পড়ি। দিনটা কি এমনি নষ্ট হবে?'

হর্ষবর্ধনবাবু ভ্রাতা এবং মানিব্যাগ সমভিব্যাহারে বেরিয়ে পড়লেন, অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে। বাস্তবিক, অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়া গেছে, টাকা খরচ করবার একটা পন্থা নেই গো! টাকা ওড়াবার নিত্য নতুন ফন্দি বাৎলাতে পারে এমন একজন লোক ভয়ানক বেশি মাইনে দিয়ে রাখতেও তিনি প্রস্তুত,—হ্যাঁ, এই মুহূর্তেই! এক হাজার—দু'হাজার—যা বেতন চায় নিক।

রাস্তায় বেরিয়েই দেখলেন, একজন লোক মইয়ে উঠে তাঁদের বাড়ির দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড় একটা ছবি সাঁটছে। ছবিটা হনুমানের—না, হনুমানের নয়, দুই ভাই ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন—ছবিটা একটা অতিকায় জাম্ববানের। বড় বড় অক্ষরে ছবির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে—ছবির মাথায়, নিচে, জাম্ববানের বগলের মধ্যে—'কিঙ-কঙ্—অত্যন্ত চমকপ্রদ রোমাঞ্চকর চিত্র, রাওনক্-মহলে।'

'হুঁ, যা বলেছে! এটি যে চমকপ্রদ জাম্বুবান সে বিষয়ে ভুল নেই!'

গোবর্ধন সায় দেয়—'খুব রোমাঞ্চকরও! কী বল দাদা?'

হর্ষবর্ধন লোকটিকে ডাকেন—'ওহে ব্যক্তি, শোন শোন।' মই আর ময়দার বালতি হাতে লোকটি এগিয়ে আসে। 'বেশ, বেশ ছবি তোমার। ভারি খুশি হলাম। একটা আমাদের বাড়ির ভেতরে গিয়ে লাগিয়ে দাও গে।'

লোকটি জানায় এসব বায়োস্কোপের পোস্টার, বাড়ির ভেতরে লাগিয়ে বরবাদ করা তার সাধ্য নয়।

হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে ফিস্-ফিস্ ক'রে বলেন—'না লাগায় নাই লাগাবে। রাত্রে এসে তখন চুপি-চুপি খুলে নিয়ে গেলেই হল—কী বলিস ? বেশ ছবিখানা! কত বড় হাঁ করেছে ভ্যাখ্! একটা বড় কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেশে নিয়ে যাব।'

গোবর্ধনও কানে কানে জবাব দেয়—'হ্যাঁ দাদা! আর যদি এখানে বাঁধাতে বেশি খরচ পড়ে, ছবিটার আন্দাজের একটা বড় কাঁচ কিনে নিয়ে গেলেই হবে। দেশে তো আর কাঠের দুঃখ নেই! কারিগরকে দিয়ে ফ্রেম বানাতে কতক্ষণ!'

হর্ষবর্ধন দিল্দরিয়া হয়ে ওঠেন—'না, না, এখানেই বাঁধাব। লাগুক না কত টাকা লাগবে! কোথায় বৈঠকখানা লেন জানি না, কিন্তু খুঁজে নেব; সেখানে আমাদেরই কাঠের দোকান রয়েছে তো, কত চড়া দামে তারা আমাদের কাঠ আমাদেরকেই বিক্রি করে দেখাই যাক! ম্যানেজারটার কাজের বহর জানা যাবে।' তারপরে গোঁফ মুচড়ে নেন—'আরে হাঁদা, আসল কথাটা কী জানিস। তোর বৌদি আসবার সময়ে বলেছিল আমার একটা ফটো তুলিয়ে নিয়ে যেতে। কোথায় ফটো তোলে জানি নে তো, এই বিরাট শহরে কোথায় ফটোর কারখানা কে খুঁজে পাবে? তার বদলে যদি এই ছবিখানা বাঁধিয়ে নিয়ে যাই খুশি হবে না কি?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে বিচার করে, একবার দাদার দিকে একবার কিঙ্ কঙের দিকে তাকায়, তুলনা ক'রে দেখে বৌদির চোখে কে অধিকতর পছন্দনীয় হবে, তারপরে ঘাড় নেড়ে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানায়।

হর্ষবর্ধন লোকটিকে ডাকেন—'আর একখানা যদি না দিতে পার নাই দেবে। আমরা বাঁধাতাম কিনা! তার দরকারও নেই বড়—গোবরা হতভাগা তো বিয়েই করে নি। কিন্তু কী জান, আমরা বড়লোক কিনা, চিত্রকলার সমঝদার আর পৃষ্ঠপোষক হতে হয় আমাদের। বড়লোক হওয়ার অনেক হ্যাপা, বুঝলে হে? যাক, আমরা দুঃখিত নই সেজন্য। তা, ছবিখানা আমাদের বাড়িতে লাগিয়েছ তার জন্য কত দিতে হবে তোমায়? যা চাও বল, লজ্জা ক'রো না—কোন দাম দিতেই কুণ্ঠিত নই আমরা।' চাপা গলায় গোবর্ধনের মত নেন—'একশো টাকার একখানা নোট ওকে দিই, কেমন? খুব কম হবে না তো, ভ্যাখ্! কলকাতা শহরে এসে মান-মর্যাদা খোয়ানো চলবে না তো!'

গোবর্ধন 'সেফসাইডে' থাকে, বলে—'তাহলে দু'খানাই দাও।'

পোস্টারওয়ালা বোধহয় ঘাবড়ে গিয়েছিল, সে জবাব দেয়—'টাকা নিতে পারব না বাবু, এই হল আমাদের কাজ।'

দুই ভাই যে মর্মাহত হয়েছেন তা মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়। লোকটা সান্ত্বনা দিয়ে জানায়—'আচ্ছা, আসছে হপ্তায় আর একখানা ছবি লাগিয়ে যাব, সেটা এর চেয়ে বাচ্চা-গোছের—সান্ অব কঙ্।'

হর্ষবর্ধনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—'বেশ বেশ'! সেই ভালো। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ব্রাদার অব কঙ্-ও আনতে পার না? এখনও আমার ছেলেপুলে হয় নি তো, তবে শ্রীমান…' গোবর্ধনের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে কথাটা সেরে নিতে চান।

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের দুঃখ সহ্য করতে অপারগ। তিনি কিঙ্ কঙ্ নিয়ে অম্লানবদনে বাড়ি ফিরবেন আর ভাই খালি হাতে বিষণ্ণবদনে যাবে—এক যাত্রায় পৃথক ফল—এ চিন্তাও তাঁর অসহ্য।

লোকটা বলে—'আচ্ছা, পুছব কর্তাদের। বোধহয় ব্রাদার অব কঙ্ও বেরিয়েছে অ্যাদ্দিনে।'

হর্ষবর্ধন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে মানিব্যাগের মুখ বন্ধ করেন—'সেদিন তোমায় টাকা নিতে হবে কিন্তু।'

গোবর্ধনও মনে করিয়ে দেয়—'হ্যাঁ, সেদিন আর 'না' বললে শুনছি না!'

দেয়াল-শিল্পী চলে গেলে পথে হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন—'ছবিটার মধ্যে কি সব লিখেছে পড়ে দ্যাখ্ তো—ব্যাপারটা কী বলে!'

গোবর্ধন সমস্তটা প'ড়ে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে—'ধর্মতলায় রাওনাক্-মহলে একটা বাইশকোপ হচ্ছে, সেইখানে যেতে ডাকছে সবাইকে।'

'চল্, যাই সেখানে। অমনি নাকি?'

'উঁহু! ঐ যে লিখেছে, "বিলম্বে আসিলে টিকিট পাইবে না!" টিকিট লাগবে।'

'লাগুক না! টাকা খরচ হবে তো! বলছে যখন, তখন আর বিলম্ব ক'রে কাজ নেই, চল্'।

হনুমানের ভাই জাম্বুবান—রামায়ণে পড় নি দাদা? তারই সব কীর্তি-কলাপ, বুঝেছ?'

'অনেকক্ষণ। সমস্কৃত ছবি—নাম দেখে বুঝতে পারছিস না? কিং কিং, ততঃ কিম্—এসবই হচ্ছে সমস্কৃত।'

গোবর্ধন উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'রামায়ণ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। সেই যে তিন বছর আগে দেখেছিলাম মনে নেই তোমার? কিন্তু এ তো রামযাত্রা নয়, এ হল গিয়ে রামবাইশকোপ! তার চেয়ে ভালো নিশ্চয়।'

'মনে আছে বৈকি। সে ছিল হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড, এ বোধহয় জাম্বুবানের কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড-টাণ্ড হবে। ধর্মতলাটা কোন্ দিকে রে, জিজ্ঞাসা কর্ না কাউকে।'

'জিজ্ঞাসা করে কী হবে, ভাববে পাড়াগেঁয়ে, তার চেয়ে একেবারে মোটরে চেপে বসা যাক।' গোবর্ধনের মোটরে চাপার শখ কম নয়ঃ 'সকালে তো একটা একতালা মোটরে চেপেছিলাম, এবেলা কত দোতলা মোটর ছুটোছুটি করছে দেখ না দাদা! ডাকব একটাকে?'

'উঁহু, মোটরে হুস্ ক'রে নিয়ে যায়, শহর দেখা হয় না। যদি কলকাতাই না দেখলাম তো কলকাতায় এসে করলাম কী ? এবেলা দোতলা মোটর বেরিয়েছে, কাল সকালে দেখবি তিনতলা, কাল বিকেলে চারতলা—কত কি দেখবি, দুদিন থাক্ না, আস্তে আস্তে বেরুবে। ভাড়াও হবে তেমনি নিশ্চয় ডবল, তিনগুণ, চারগুণ—তা চল্লিশ কেন, একশো টাকা হোক না, আমরা বাপু পিছ-পা নই !

সগর্বে পদক্ষেপ করতে করতে হর্ষবর্ধন অগ্রসর হলেন, অগত্যা ব্রাদার অব্ হর্ষবর্ধনকেও মোটর না চাপতে পারার দুঃখ হজম করে দাদার অনুসরণ করতে হল।

চলতে চলতে হর্ষবর্ধনের দৈবাৎ কিসে যেন পা পড়ল, তিনি সহসা পিছলে দুশো হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিছলে সাধারণত লোকে পড়েই যায়, কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে দাঁড়িয়ে গেলেন। অকস্মাৎ তীব্রবেগে অগ্রসর হবার সময় ধারণা হয়েছিল হয়ত কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটছে, কিন্তু অবশেষে যখন দণ্ডায়মান অবস্থাতেই থাকলেন তখন তাঁর মনে হল, এ তো বেশ মজা !

নিঃশব্দ-চলমান দাদার সমকক্ষতা বজায় রাখতে গোবর্ধনকে সশব্দে দৌড়তে হল। হর্ষবর্ধন পায়ের তলায় তাকিয়ে দেখেন, এই দুর্নিবার গতিবেগের মূলে সামান্য একটা কলার খোসা। এরই পিঠে চেপে তিনি এক মুহূর্তে এতখানি পথ অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কলকাতায় কলার খোসাও একটা চাপ্‌তব্য ব্যাপার তাহলে !

হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে গতিরহস্যটা বুঝিয়ে দেন—'ওঃ, এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, চারিদিকেই কলার খোসা ছড়ানো রয়েছে যে ! এগুলো কেন ছড়িয়েছে জানিস ? চলবার সুবিধের জন্য। দেখলি না—না-হেঁটে না-দৌড়ে না-লাফিয়ে দুশো হাত এগিয়ে এলাম ! এক লহমায় দুশো হাত আগানো কম কথা নয় !'

গোবর্ধন মাথা নাড়ে—'যা বলেছ ! যারা মোটরে যেতে পারে না তাদের জন্যেই বোধহয় রেখেছে। মোটরের মতনই বেগে যায় অথচ ভাড়া নেই এক পয়সাও ! কলকাতার হালচালই অদ্ভুত !'

'আমার ভারি চমৎকার লেগেছে। এখন থেকে আমি কলার খোসা চেপেই যাব, কী বলিস ! কেন অনর্থক হেঁটে মরি ! দেরিও হয় তাতে !'

'না না, পড়ে যেতে পার দৈবাৎ !' গোবর্ধন আপত্তি জানায়।

'পাগল, আমি পড়ি কখনও ! কখনও পড়তে দেখেছিস আমায় ? কোনও জন্মে ?'

'আমি তা ব'লে অত দৌড়তে পারব না তোমার সঙ্গে !'

'সেই কথা বল্ !' হর্ষবর্ধন হাসতে থাকেন।

এসপ্লানেডের মোড়ে এসে হর্ষবর্ধন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন—'এবার কোন্ দিকে যাব ? চারদিকেই তো রাস্তা !'

গোবর্ধন সংশোধন করে দেয়—'উঁহু, পাঁচদিকে।'

সামনেই একটা কমলালেবুর খোসা পড়ে ছিল, হর্ষবর্ধন সেদিকে ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—'এবার একটু রকমফের করা যাক। ঐটায় চেপে যাই খানিক!' ব'লে যেমন না 'খোসারোহণ' করতে যাবেন, অমনি তিনি চিৎপটাং। তৎক্ষণাৎ উঠে প'ড়ে হর্ষবর্ধন অপ্রতিভ হ'য়ে চারিদিকে তাকিয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে থাকেন, যেন পড়েন নি এমনি ভাবে পাশের একজনকে প্রশ্ন করেন—'জায়গাটার নাম কী মশাই?'

লোকটা খোট্টা, এক কথায় জবাব দেয়—'ধরম্‌তল্লা—জানতা নেহি?'

'ধড়াম্‌তলা—তাই বল! না পড়ে কি উপায় আছে? ঠিক হয়েছে তবে।'

গোবর্ধনের কৌতূহল হয়, দাদার সিদ্ধান্তের কারণ জিজ্ঞাসা করে।

'সবাই এখানে ধড়াম্ করে পড়ে যায়। তাই জায়গাটার নাম ধড়াম্‌তলা হয়েছে, বুঝছিস না? পড়তেই হবে যে এখানে!'

'আর কদ্দূর বাপু, তোমার জাম্বুবানের বাইশ্‌কোপ! হেঁটে-হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল!' গোবর্ধন বিরক্তি প্রকাশ করে।

হর্ষবর্ধন বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়েন—'আবার এদিকে খোসায় চাপাও নিরাপদ নয়!'

'এখানে এত ভিড় কিসের দাদা!'

'আরে, এই যে রাওনাক্-মহল! দেখছিস না লেখা রয়েছে—ঐ যে সেই ছবিখানা রে! এখানে দেখছি একটা বড় রকমের রঙচঙে সেঁটেছে!'

গোবর্ধন এবার সাহসী হ'য়ে একজনকে প্রশ্ন ক'রে বসে—'ওই ঘুলঘুলিটার কাছে এত ভিড় কেন মশাই?'

'এখুনি টিকিট কাটা শুরু হবে কিনা!' লোকটি উত্তর দেয়।

'ক' টাকার টিকিট কাটবে?' গোবর্ধন দাদাকে প্রশ্ন করে।

'একেবারে সবচেয়ে সামনের সীট, তা য-টাকাই লাগুক!' হর্ষবর্ধন বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গি করেন—'সেবার সনাতন খুড়ো কলকাতা থেকে দেশে ফিরল, তার কাছ থেকে সব আমার জানা। খুড়ো বলে কিনা ঠ্যাটরের সব-আগের সীটের দাম সবচেয়ে বেশি—পাঁচ টাকা করে। "ঠ্যাটর" কী বুঝেছিস?'

'না তো!'

'ঠ্যাটর হচ্ছে ঠিয়েটার—বুঝলি! খুড়ো কী মুখ্যু ভাখ্! তবে, খুড়োরই বা দোষ দেব কী? ইংরেজি উচ্চারণ করা কি সোজা রে দাদা!'

গোবর্ধন আবার সেই লোকটিকে প্রশ্ন করে—'মশাই, সব-সামনের টিকিট কোথায় দিচ্ছে?'

লোকটি এবার বিরক্ত হয়—'দেখছেন না ?' ভিড়ের দিকে আঙুল নির্দেশ করে—'ঐ তো ফোর্থ ক্লাসের টিকিট-ঘর।'

হর্ষবর্ধন তু'খানা দশ টাকার নোট বের করে নিয়ে ভাইয়ের হাতে মানিব্যাগ দেন—'ধর্ এটা, টিকিট কেটে আনি। থিয়েটারের পাঁচ টাকা হলে বাইশকোপের না-হয় দশ টাকাই হোক! এর বেশি আর কী হবে? ভিড়ের মধ্যে সেঁধুই যে, উপায় কী? সব থেকে দামী সীটের জন্য সবচেয়ে বেশি ভিড় হবে জানা কথা।'

গোবর্ধন বলে—'হুঁ! কলকাতায় লোকের টাকার অভাব!'

নোট তু'খানা দাঁতে চেপে তু' হাতে ভিড় ঠেলে হর্ষবর্ধন ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। মুহূর্তপরেই টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলি খুলে গেল—খোলামাত্রই তুমুল কাণ্ড! কথা নেই বার্তা নেই, জমাট জনতা সহসা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত উত্তাল হয়ে উঠল—চারিদিকে যেন প্রলয় নাচন শুরু হয়ে গেল! হঠাৎ হর্ষবর্ধন দেখেন তাঁদের মাথার উপরে জন-তুই লোক সাঁতার কাটছে এবং তাদেরই একজন, ডুবন্ত লোক যেমন করে কুটোটাকে আশ্রয় করে, তেমনি করে তাঁর চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরেছে। গতিক সুবিধের নয় দেখে হর্ষবর্ধন নোট তু'খানা মুখের মধ্যে পুরলেন—কী জানি চুল ছেড়ে যদি নোট চেপে ধরে! সেই দারুণ ধস্তাধস্তির মধ্যে হর্ষবর্ধন একবার ডুব-সাঁতার দিতে চেষ্টা করলেন, তু'বার শূন্যে উঠলেন, তিনবার কাৎ হলেন, অবশেষে চারবার ঘুরপাক খেয়ে, নিজের বিনা চেষ্টায় ছিটকে বেরিয়ে এলেন; তখন তাঁর খেয়াল হল, নোট তু'খানা গোলমালে কখন গিলে ফেলেছেন।

'দেখেছিস গোবরা, আমার দশা! ফর্দাফাঁই! আরো তুখানা নোট দে তো—ও তুখানা হজম হয়ে গেছে।'

গোবরা পকেটে হাত দিয়ে অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে পড়ে, সেখানে ব্যাগের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না। এই তুর্যোগে বা সুযোগে কে পকেট মেরে সরে পড়েছে। কিন্তু তার বিস্ময় তার বিক্ষোভকে ছাপিয়ে ওঠে—'একি, তোমার কাপড় কী হল দাদা?'

তাই তো! এ কার কাপড় পরে আছেন হর্ষবর্ধন? তাঁর ছিল লাল-পেড়ে ধোপতুরস্ত ধুতি—এ কার আধ-ময়লা ফুল-পাড় কাপড় কখন বদলে গেছে কে জানে!

'তবে আর টিকিট কেটে কাজ নেই দাদা। কাপড় বদলেছে এই যথেষ্ট, এবার যদি চেহারা বদলে যায়?'

ভাবনার কথা বটে! হর্ষবর্ধন বলেন—'তবে চল্ বাড়ি ফিরি। কী আর করব, বেশি খরচা করা গেল না আজ। সমস্ত দিনে আর কটা টাকাই বা ওড়াতে পেরেছি—এই কুড়ি ধরে?' তাঁর কণ্ঠে তুঃখের সুর বাজে।

গোবর্ধন যেতে যেতে হঠাৎ দেখে রাস্তার কোণে আর-একটা কার মানিব্যাগ পড়ে আছে, দাদার অলক্ষ্যে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পোরে। ব্যাগটা বেশ ভারি, নোটে-

টাকায় নিশ্চয়ই অনেক কিছু। যাক, ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন নইলে দাদার বকুনি ছিল। মনে মনে সে হিসেব করে, পাঁচশো যদি গিয়েই থাকে তবে সাতশো নির্ঘাত ফিরে এসেছে। টাকা-কড়ি কলকাতার পথে-ঘাটে ছড়ানো থাকে, সত্যিই তবে এ কথা! গোবর্ধন কলকাতার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হয়।

বাড়ি ফিরে হর্ষবর্ধন চায়—'দে তো ব্যাগটা!'

প্রসন্নমুখে গোবর্ধন জবাব দেয়—'সেটা খোয়া গেছে দাদা, তবে, আর একটা কুড়িয়ে পেয়েছি, অনেক টাকা আছে তাতে!...দেখছ কেমন পেট-মোটা ব্যাগ!...একি! ব্যাগের আবার হাত-পা কেন? কলকাতার হালচালই অদ্ভুত! হাত-পা-ওয়ালা মানিব্যাগ! কিন্তু এর মুখ খোলে না কেন! ওমা, এ যে দেখছি মোটর-চাপা-পড়া আস্ত কোলা ব্যাঙ!'

হর্ষবর্ধন অট্টহাস্য করতে থাকেন—'যাক, বেশ হয়েছে! পাঁচশো টাকা তবু খরচ করা গেল—নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোনো যাবে আজ!'

পঞ্চম ধাক্কা

ইঁদুর-চরিতামৃত

সেদিন সকাল আটটা বেজে গেল তবু দু' ভাইয়ের ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছিল। অর্ধতন্দ্রায় হর্ষবর্ধন নানাবিধ সুখস্বপ্ন দেখছিলেন, যেমন—কেবলমাত্র কলার খোসায় চেপে পৃথিবী পরিভ্রমণ করা সম্ভব কি না, কিংবা যদি এমন হত—রেল লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন না চ'লে যদি প্ল্যাটফর্মটাই চলতে শুরু করত তা হলে কী মজাই হত! কেমন প্ল্যাটফর্মটাই চেপে, খোলা জায়গায় হাওয়া খেতে খেতে, পায়চারি করতে করতে দিল্লী-মক্কা বেড়ানো যেত! ঠিক এমনি সুখের সময়ে (মানুষের সুখ বিধাতার অসহ্য!) সহসা হর্ষবর্ধনের মনে হল, তাঁর ভুঁড়ির ভার যেন অকস্মাৎ অনেকখানি বেড়ে গেছে। চোখ খুললে পাছে স্বপ্নের আমেজ টুটে যায় সেই ভয়ে হর্ষবর্ধন চোখ বুজেই ডাকলেন—'গোবরা, এই গোবরা!'

'উঁ!'

'দ্যাখ্ তো আমার পেটে কী?'

চোখ না খুলেই গোবর্ধন জবাব দিল—'কী আবার?'

ইতিমধ্যে ভুঁড়ির বোঝাটিকে বেশ সচল এবং সক্রিয় বলে হর্ষবর্ধনের সন্দেহ হতে লাগল। ব্যাপার কী? নিতান্তই কি নিদ্রার মায়া ত্যাগ করে অকালে চোখ খুলতে হবে? কিংবা খবরের কাগজের বড় বড় হরফে যাদের বলে 'ভীষণ আকস্মিক দুর্ঘটনা'—তেমনি ভয়াবহ কিছু তাঁরই উদরের ওপরে এই মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে? তাঁর ভয় হচ্ছিল চোখ খুলতে।

'দ্যাখ্ না, নড়ছে যে রে!'

'পেটে নড়ছে? পিলে-টিলে হয়ত!' গোবর্ধনও চোখ খোলার কষ্ট করতে প্রস্তুত নয়।

হর্ষবর্ধন ভাবলেন গোবরা ভুল বলে নি। পিলেই হবে, নইলে পেটে আবার নড়বে কী? আসামের পিলে ডাকসাইটে পিলে, কলকাতায় এসে হাওয়া-বদল করে শহরের হালচাল দেখে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে—আশ্চর্য কিছু নয়। আকস্মিক ভুঁড়িকম্পের কারণ অবগত হয়ে হর্ষবর্ধন নিশ্চিত হলেন, আবার তাঁর নাক ডাকতে শুরু করল। ভুঁড়িকম্পে চাপা পড়ার ভয় নেই তো, সে ভয় বরং পাশের লোকের কিছু পরিমাণে থাকলেও ভুঁড়ির যিনি মালিক তিনি একেবারে অকুতোভয়। সুতরাং হধবর্ধন ভৌড়িক বিপর্যয়ে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন মনে করলেন। তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

বর্ধনেরা নিশ্চিন্ত হলেও পিলে নিশ্চিন্ত ছিল না; হঠাৎ গোবর্ধন অনুভব করল কি যেন একটা লাফিয়ে পড়ল তার পেটের ওপর। ভয়ে তার সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গেল, কিন্তু চোখ খুলতে সাহস হল না। দাদার পিলে তার পেটে লাফিয়ে আসবে, শারীরতত্ত্বের নিয়মে এটা কি সম্ভব? সে ভয়ানকভাবে ভাবতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে একটা ক্ষীণ আর্তধ্বনি শোনা গেল—মিঁয়াও!

পিলের ডাক! আওয়াজ শুনে গোবর্ধনের নিজের পেটের পিলে চমকে গেল; সে ধড়মড় করে উঠে বসল—'এ যে বেড়াল ও দাদা!' তার কণ্ঠে ও চোখে বিভীষিকা ফুটে উঠল, বেড়ালকে তার ভারি ভয়। হর্ষবর্ধন উঠে বেড়ালটাকে বিপর্যস্ত গোবর্ধনের উদর থেকে সজোরে স্থানচ্যুত ক'রে ঘরের কোণে নিক্ষেপ করলেন। 'বেড়াল? এল কোত্থেকে! কী বি—পদ!'

বেড়ালটা তৎক্ষণাৎ আবার লাফিয়ে বিছানায় এসে উঠল—তার সেই লাফটাকে একসঙ্গে হাই এবং লং-জাম্পের রেকর্ড বলা যেতে পারে। মার্জার মহাপ্রভুর ভীত দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে দুই ভাই দেখলেন ঘরের তিনটে কেঁদো কেঁদো ইঁদুর—নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে তাঁদের রাত্রের ভুক্তাবশেষের সদ্ব্যবহার করছে। বিছানায় বসে তিনজনে সভয়ে সেই দৃশ্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

ভয়ের কথাই বটে। কাবুলে ইঁদুর হয় কি না জানা যায় নি, কিন্তু কাবুলী ইঁদুর বলে যদি কিছু থাকে এগুলো হচ্ছে তাই। গোবর্ধন এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। কাবুলী বেড়ালের সঙ্গে এরা কেমন ব্যবহার করে কে জানে, কিন্তু গো-বেচারা বাঙালী বেড়ালকে যে এরা আমলই দেয় না তা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। মানুষদের এরা কেমন খাতির করবে তাও তো জানা নেই, হর্ষবর্ধন নিতান্ত ভাবিত হয়ে পড়েন।

গোবরা সাহস দেয়—'ভয় কী দাদা, ওরাও তিনজন, আমরাও তিনজন আছি।'

হর্ষবর্ধন হতাশভাবে ঘাড় নাড়েন—'উঁহু! সম্মুখ-সমরে এই বেড়ালটা ধর্তব্যের মধ্যেই না! দেখলি না কী রকম পালাতে ওস্তাদ! কী রকম লাফখানা দিল—বাপ্‌স! একটা আস্ত কাপুরুষ।'

অনেকক্ষণ মাথা ঘামিয়ে কথাটা গোবর্ধনের মনে আসে—'হুঁ, যাকে ইংরিজিতে বলে 'কাউহার্ড ; ঠিক বলেছ !'

হর্ষবর্ধন বুক ফুলিয়ে বলেন—যদি এক-একজন ক'রে আসে আমি ভয় করি না ওদের ! তা তো আসবে না, একসঙ্গে তাড়া করবে !'

তাহলে কী বিপজ্জনক ব্যাপারই না ঘটবে, ভেবে গোবর্ধন শিউরে ওঠে। একসঙ্গে তিন-তিনটে কাবুলি ইঁদুরের আক্রমণ ঠেকানো কি সহজ কথা ? এ যা ইঁদুর, বেড়াল দূরের কথা, এ রকম বাহন দেখলে বাবা গণেশকেও পালাতে হত। কার বাপু প্রাণের মায়া নেই ? গোবরা বলে—'বুঝেছ দাদা, এ চীজ দেখলে গণেশ বাবাজীও পালাতেন, আমরা তো ছার !'

'হুঁ,' হর্ষবর্ধন গম্ভীর হয়ে ওঠেন—'আমি ভাবছি যদি তাড়া করে তাহলে কী করব। কড়িকাঠ ধরে ঝুলতে হবে দেখছি। পালাব কোথায় ?'

'হ্যাঁ, দরজা তো ওরাই আগলে রয়েছে !' দুই ভাই কড়িকাঠ ধরে ঝুলছেন, বেড়ালটা দাদার কাছা আশ্রয় করে দোদুল্যমান, আর নিচে থেকে ইঁদুরদের ভয়ানক লম্ফ-ঝম্প—এই দৃশ্য কল্পনা ক'রে গোবরার হাসি পেল। 'তাই তো, তাহলে তো ভারি মুশকিল দাদা ! তুমি কি ওই ভারি দেহ নিয়ে ঝুলতে পারবে ?'

বেড়ালটাও কটাক্ষে হর্ষবর্ধনের বিপুল কলেবর একবার লক্ষ্য করল, তার মুখভাব দেখে মনে হল গোবর্ধনের মত সেও এ বিষয়ে সন্দেহবাদী। বেড়ালের সহানুভূতি হর্ষবর্ধনের মনকে স্পর্শ করল।

'যদি করেই তাড়া আমি ভয় করি নাকি ?' হর্ষবর্ধন তাল ঠুকে বেড়ালটার লেজ মুঠিয়ে ধরেন—'তাহলে এই বেড়ালটাকেই বাগিয়ে ধরব। বেড়ালে ইঁদুর মারে বলে শুনেছি —এই বেড়াল-পেটা করেই ইঁদুর ব্যাটাদের শেষ করব।'

বেড়ালটা হস্তগত লেজের বিরুদ্ধে কুণ্ঠিতভাবে আপত্তি করে—'মিউ !'

অনাহূত ও অনাকাঙ্ক্ষিত এই চতুষ্পদ ব্যক্তিটিকে গোবরারও ক্রমশ ভাল লাগছিল। ভাল লাগবারই কথা, আসন্ন বিপদের মুখে শত্রুর সঙ্গে আত্মীয়তা হয়। ভীষণ বন্যাবর্তে মানুষ আর বাঘ একই খড়ের চাল আশ্রয় করে পাশাপাশি ভেসে চলেছে অনেক সময়ে এমন দেখা গেছে (দেখার চেয়ে শোনা যাওয়াই সম্ভব, কেননা সেই দারুণ স্রোতের ধাক্কায় দাঁড়িয়ে দেখার লোক তখন দুর্লভ)। যাই হোক আসল কথা এই, বিপদে পড়লে বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, সুতরাং একটা বেড়ালের সঙ্গে গোবরা ভাব করে ফেলবে এ আর বেশি কথা কী ?

সুতরাং সে দাদার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে—'তাহলে বেড়ালটাও যে সাবাড় হবে।'

'হয়, হোক গে। কথায় বলে, যাক শত্রু পরে পরে। ইঁদুরও যাক, বেড়ালও যাক—ওদের কাউকেই চাই নে।'

'আচ্ছা, ইঁদুরগুলো যদি এখন বিছানায় লাফিয়ে আসে দাদা ?'

'কেন, তা আসবে কেন ? বিছানা কি ওদের খাদ্য ?'

'হ্যাঁ, তুলো খায় শুনেছি ! কিন্তু তা নয়, যদি বেড়ালটাকে তাড়া করে আসে ?'

'অ্যাঁ, বলিস কী ?' হর্ষবর্ধন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন—'তা পারে তাড়া করতে,—যে-রকম মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে বেড়ালটার দিকে ! কী হবে তাহলে ?' হর্ষবর্ধনের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

'তাই তো ভাবছি।'

'দে, ওকে ইঁদুরদের দিয়ে দে—পিকনিক করে ফেলুক। ওর জন্যে কি আমরাও প্রাণে মরব ?'

কিন্তু বেড়ালটা বোধ করি ওদের ষড়যন্ত্র টের পেয়েছিল, এমনভাবে গদিতে নখ এঁটে বসল যে টেনে তোলে কার সাধ্য ! বেড়ালের সঙ্গে টাগ্ অব্ ওয়ারের প্রাণান্ত পরিশ্রমে দুই ভাই যখন ঘর্মাক্ত-কলেবর, ইঁদুর তিনটে তখন প্রাতরাশ সমাপ্ত করে নিঃশব্দে প্রস্থান করেছে। বাহুযুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তিনজনের কেউই এদিকে দৃক্‌পাত করেননি। প্রথম বেড়ালের নজরে পড়তেই সে ঘাড় ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এতক্ষণ পরে গলা পরিষ্কার ক'রে উঁচু খাদের ডাক ছাড়ল—'ম্যাঁও !'

পরমুহূর্তেই সে বর্ধনদের বাহুপাশ মুক্ত করে নিয়ে বিছানা থেকে নেমে গেল, দরজা পর্যন্ত একবার টহল দিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ইঁদুরদের উচ্ছিষ্টে মনোনিবেশ করল।

বেড়ালের স্বরের তারতম্য থেকেই হর্ষবর্ধন ঘরের পরিবর্তন আবিষ্কার করতে পারলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন—'বাঁচা গেল, বাপ্ ! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ! ইঁদুরে বেড়াল তাড়ায়, কলকাতার হালচালই অদ্ভুত !'

'শহুরে ইঁদুর দাদা ! যে রকম ভাবভঙ্গি দেখলাম, মানুষেরই তোয়াক্কা করে না, তো বেড়াল ! আমার তো বুক কাঁপছিল এতক্ষণ !'

'কিন্তু—' খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যায়।

'হুঁ।' গোবর্ধন কি যেন ভাবতে থাকে।

'তুই কী ভাবছিলি ?'

'ভাবছি বেড়ালটা যে শহুরে ইঁদুর দেখে ঘাবড়েছিল হয়ত তা নয়।'

'তা নয় তো আবার কী ! আমাদের কর্মচারী কী লিখেছিল ? কলকাতার হালচালই এইরকম। মেশামেশির পক্ষপাতী নয় এরা। বেড়ালেরাও।'

'উঁহু, তা নয় ; পিলেগের নাম শুনেছ ?'

'শুনেছি, কী তাতে ?'

'শহর জায়গায় ভারি হয় ।' গোবর্ধনের চালটা মুরুব্বিয়ানা হয়ে ওঠে—'বায়রামটার নাম পিলেগ কেন জান ? পিলে থেকে লেগ পর্যন্ত ফুলে ওঠে—তাই পিলেগ । লেগ কী জান তো ?'

হর্ষবর্ধন দাবাড়ি দেন—'যা যাঃ, আর তোকে বিদ্যে ফলাতে হবে না ! তোর মাথা !'

'উঁহু, লেগ মানে মাথা নয়, ঠিক তার উলটো । যাকে বলে গিয়ে পা ।'

'জানি জানি, তোকে আর বলতে হবে না ! ফীট মানেও পা হয়—আবার ফীট দিয়ে আমরা কাঠ মাপি, সে হল গিয়ে আর-এক ফীট ।'

'আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেও ফীট হয়, কিন্তু তাতে লেগ হয় না—লেগে আর ফীটে এইখানেই তফাত ।'

হর্ষবর্ধন চটে যান—'বুঝেছি রে বুঝেছি । এখন পিলেগের কথা বল্ ।'

'শহরের ইঁদুর, বুঝেছ, কামড়ালেই পিলেগ । বেড়ালটা কেন ঘাবড়াচ্ছিল, এখন বুঝলে ? ইঁদুরের ভয়ে নয়, পিলেগের ভয়ে ।'

'অ্যাঁ, বলিস কী ?' হর্ষবর্ধন একেবারে চমকে ওঠেন ।

'শহুরে বেড়াল, কত ডাক্তারের বাড়ি ওর যাতায়াত—কত ডাক্তারি কথাবার্তা শোনে, রোগ-ব্যারামের ব্যাপার সব ওর জানা, তাই ও সাবধান, বুঝেছ দাদা ! সাবধানের কিনা বিনাশ নেই !'

'তুই ঠিক বলেছিস ।' হর্ষবর্ধন সোজা হয়ে বসেন । 'আজ কিংবা কালই এ বাড়ি আমাদের ছাড়তে হবে । যা ইঁদুরের উপদ্রব এখানে—কখন কামড়ে দেয় কে জানে ! কামড়ে দিলেই হল !'

'ব্যস, তাহলেই পিলে থেকে লেগ পর্যন্ত—!

'—আগাগোড়া পিলেগ !' হর্ষবর্ধন বাক্যটা সম্পূর্ণ করে মুখখানা প্যাঁচার মত বানিয়ে তোলেন । গোবর্ধনও দাদার মুখের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে বসে ।

ষষ্ঠ ধাক্কা

অথ শ্রীভিক্ষুক-দর্শন

বসে থাকতে থাকতে দুই ভাই অকস্মাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন, তাঁদেরই বাড়ির দুয়ারে কে খঞ্জনী বাজিয়ে সংকীর্তন শুরু করেছে ।

হর্ষবর্ধন অভিভূত হয়ে গেলেন, বললেন—'আহা, কে হরিগুণ গান করে ! গোবরা, ওপরে ডেকে আন, কোন মহাপুরুষ-টহাপুরুষ হবে !'

নিচে থেকে গোবরার গলা শোনা যায়—'কোন মহাপুরুষ নয় দাদা, একেবারেই টহাপুরুষ।'

'তুই ডেকে নিয়ে আয়।'

খঞ্জনীধারীকে নিয়ে গোবর্ধন ঘরে ঢোকে। একজন খোঁড়া ভিখারী—সিঁড়ি ভেঙে ওপরে আসতে অনেক কষ্ট, অনেক কসরৎ করতে হয়েছে তাকে। খোঁড়া দেখে হর্ষবর্ধনের দয়া হয়, তিনি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন—'ভগবান তোমাকে খোঁড়া করেছেন সে জন্য দুঃখ করো না ভাই, এ তাঁর দয়া। এ জন্মে আমাদের মত পাপী-তাপীকে হরিনাম শুনিয়ে পুণ্য অর্জন করছ, পরজন্মে তাঁর দয়ায়—'

গোবরা কথাটা পূরণ করে—'তুমি ফুটবল-খেলোয়াড় হবে।'

ভিখারীর মুখ বিকৃত হয়—'আর যা বলেন বাবু, তেনার দয়ার কথা বলবেন নি, দয়ার জন্যেই মরে আছি! ভয় হয়, এ জন্মের ক্ষেতি সারতে পরজন্মে না চার-পেয়ে করে পাঠান আমাকে!'

লোকটার বিধাতার কৃপায় অরুচি দেখে হর্ষবর্ধন ক্ষুব্ধ হন—'তুমি বোধহয় পদ্যপাঠ পড় নি, সেই পদ্যটা—"একদা ছিল না জুতা চরণ-যুগলে, একদা ছিল না জুতা—" তার পরে কী রে গোবরা?'

গোবরার ধারণা হয়, দাদা ওকে ধাঁধা পূরণ করতে বললেন; তাই অনেক ভেবে সে লাইনটা মিলিয়ে দেয়—'মোজা পরে চলিয়া গেলাম কর্মস্থলে।'

হর্ষবর্ধন বিরক্ত—'উঁহু, উঁহু? মনে আসছে না পদ্যটা—সেই কবে বাল্যকালে পড়েছি। যাই হোক, তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই, একজন লোকের একদিন পায়ে জুতো ছিল না বলে সে সেই রাগে ভগবানকে গাল পাড়ছিল, হঠাৎ দেখল আর-একজনের পা-ই নেই; তার তো কেবল জুতোই নেই, আর-একজনের জুতো থাকার প্রয়োজনই নেই! তখন তার দুঃখ দূর হল।'

গোবরা যোগ করে—'আর যে লোকটার পা ছিল না সে-ও অন্য লোকটার জুতো নেই দেখে অনেকটা আরাম পেল। দুজনেই ভগবানের অপার মহিমা স্মরণ করে মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।'

ভিখারীটা এই উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা কতটা হৃদয়ঙ্গম করল সে-ই জানে, কিন্তু সে-ও জোরের সঙ্গে সায় দিল—'দেবেই তো!'

তাঁর শিক্ষার ফল ধরছে দেখে হর্ষবর্ধন পুলকিত হয়ে ওঠেন—তবেই বোঝ। খোঁড়া হওয়া খুবই দুঃখের তাতে ভুল নেই, কিন্তু কানা হলে আরও কত কষ্ট! ভগবান যে তোমাকে—'

ভিখারী বাধা দেয়—'যা বলেছেন বাবু, আগে যখন কানা ছিলাম তখন লোকে কেবল

আমাকে অচল পয়সা চালাত। বাধ্য হয়ে আমায় খোঁড়া হতে হল—কী করি? ভারি ঠকায় লোকে।'

হর্ষবর্ধন দারুণ বিস্মিত হন—'বল কী? তুমি আগে অন্ধ ছিলে?'

'তা, চোখ পেলে কী করে?' গোবরাও বিস্ময়ে বদন ব্যাদান করে।

ভিখারী আমতা আমতা করতে থাকে—'ভগবানের কেরপা! তা ছাড়া আর কী বলব!'

'তাই বল!' গোবরা আশ্বস্ত হয়। হর্ষবর্ধন বলেন—'সেই কথাই তো বলছিলাম হে! ভগবানের দয়ায় হয় না কী?'

ভিখারী তাগাদা লাগায়—'পয়সা দিন বাবু, যাই। অনেক বাড়ি ঘুরতে হবে, বেলা হল।'

'আমাদের কাছে তো পয়সা নেই, নোট আছে। গোবরা—' বলা-মাত্র গোবর্ধন একখানা দশ টাকার নোট বের করে আনে।

ভিখারী তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে একবার দেখে নেয়—'ওঃ, দশ টাকার নোট! তা আপনারা দুজনে দুটো পয়সা দেবেন তো বাবু? আমি ন' টাকা সাড়ে পনের আনা ফেরত দিচ্ছি—' বলে ঝুলি ঝেড়ে রাশীকৃত পয়সা গুনতে শুরু করে দেয়।

'উঁহুঁ হুঁ—' হর্ষবর্ধন বাধা দেন—'তুমি গোটা নোটখানাই নাও। ওর বদল দিতে হবে না; আমরা খরচ করতেই শহরে এসেছি।'

ভিখারীর চোখদুটো ডাগর হয়ে ওঠে, সে অবাক হয়ে যায়; কিছুক্ষণ পরে সন্দেহের দৃষ্টিতে নোটখানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে, আসল কি জাল আবিষ্কারের চেষ্টা করে। অবশেষে তার সাহস হয়—'বাবু, আপনি কি পুলিসের টিকটিকি?'

হর্ষবর্ধন স্তম্ভিত হন—'গোবরা, এ বলে কী? আমি টিকটিকি! কলকাতায় এসে কি টিকটিকির মত চেহারা হল নাকি? আয়নাখানা আন তো!'

গোবরা আয়না আনতে পাশের ঘরে দৌড়োয়। বাবুর ভাবান্তর দেখে, পাছে নোটখানা কেড়ে নেয় সেই ভয়ে ভিখারীও এই অবসরে আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

হর্ষবর্ধন আপন মনে বলতে থাকেন—'বৌ বলছিল বটে, যেয়ো না কলকাতায়, চামচিকের মত চেহারা হবে। কিন্তু চামচিকে না হয়ে হলাম টিকটিকি! আশ্চর্য।'

আয়না দেখে হর্ষবর্ধনের ধড়ে প্রাণ আসে—'নাঃ, এখনও অদ্দূর গড়াই নি।' গোবর্ধন দাদাকে ভরসা দেয়, দাদার মুখে আবার হাসি খেলে—'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভিখিরিটা! লোকটা কানা ছিল কি, এখনও সেই কানাই আছে!'

গোবর্ধনও সে বিষয়ে একমত হয়—'হ্যাঁ, এখনও চোখ সারে নি সম্পূর্ণ। তা নইলে

তোমার মত লম্বা-চওড়া ভুঁড়িদার লোকটাকে বলে কিনা টিকটিকি! ছ্যাঃ!' ভিখারীর ওপর সমস্ত শ্রদ্ধা তার লোপ পায়।

'কিন্তু দেখেছিস, ভিখিরি হলে কী হবে, লোকটার অগাধ পয়সা! সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকার চেঞ্জ! কলকাতার ভিখিরিরাও কী বড় মানুষ! আসামের অনেক ধনীকেই হয়ত কিনতে পারে!'

'যা বলেছ দাদা! হাতে-হাতে ন' টাকা সাড়ে পনের আনা নগদ, চাই-কি নিরেনব্বই টাকা সাড়ে পনের আনাও বের করতে পারত হয়ত!'

'তাহলে একখানা একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে নিলি নে কেন? খুচরো টাকা-কড়ির কখন কি দরকার হয় বলা যায় না তো!'

'আর কী দেখলাম জান দাদা? অদ্ভুত ব্যাপার।'

'কী—কী?' হর্ষবর্ধন উৎসুক হয়ে ওঠেন।

'লোকটা আসবার সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল, সিঁড়ি টপকে তর-তর করে নেমে গেল। ভারি আশ্চর্য কিন্তু!'

হর্ষবর্ধন বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না—'আশ্চর্য আর কি? এ কি আমাদের আসাম? এ হল গিয়ে শহর কলকাতা। এখানকার হালচালই আলাদা।'

তিনি আয়নার মধ্যে আপনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

সপ্তম ধাক্কা

বে-দন্তবাগীশের বিবরে

সাজ-সজ্জা করে দুই ভাই নগর-ভ্রমণের জন্য বার হন। ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে গোবর্ধন হতাশ হয়ে ওঠে—কই দাদা, তুমি যে বলেছিলে আজ সকালে তিনতালা মোটর বেরুবে? কই এখনো বেরুলো না তো!'

'বেরুবে বৈকি, সবুর কর! না বেরিয়ে যাবে কোথায়? বেরুতেই হবে! তিনতালাও বেরুবে, চারতালাও বেরুবে—তবে, পাঁচতালার কথা বলতে পারি না।'

'পাঁচতালা মোটর বোধহয় নেই।'

কলকাতায় কী আছে আর কী নেই কিছুই বলা যায় না। সনাতন খুড়ো এই কথা বলে, বুঝলি?'

'ধুত্তোর তোমার সনাতনখুড়ো!'

'আরে, এত অধীর হচ্ছিস কেন? যদি তিনতালা মোটর এ-বেলা নাই বেরোয়, দোতালার ছাদে দাঁড়িয়ে যাব না-হয়—সেও তো তিনতালাই হবে।'

'পড়ে যাই যদি?'

'ধুর, পড়ব কেন ? আমি কখনও পড়ি ? তবে ধড়াম্‌তলার কাছটায় একটু সাবধান হতে হবে, জায়গাটা বড় খারাপ। আর পড়বই বা কেন ? মাথার ওপর দিয়ে বরাবর তার চলে গেছে দেখছিস না ?'

'দেখছি তো।'

'কেন বল্‌ দেখি ? ধরবার জন্যে। পড়বার মুখেই তার ধরে ফেলবি, ব্যস।'

সত্যিই তো, যতদূর দৃষ্টি যায়—গোবর্ধন চোখ চালিয়ে দেখে—রাস্তার মাঝখান দিয়ে বরাবর তারের লাইন চলে গেছে আর তারই নিচে দিয়ে অতিকায় মোটরগুলো ভীষণ শব্দে দৌড়োদৌড়ি করছে। সে মনে মনে দাদার বুদ্ধির তারিফ করতে থাকে, যথার্থই তার মত দাদা দুনিয়ায় দুর্লভ। 'তবে চল দাদা, একটা মোটরের ছাদে উঠে পড়া যাক। ছাদে যাবার সিঁড়িও আছে যেন দেখা যাচ্ছে। থামাব একটাকে ?'

'একটু দাঁড়া।' পাশের দোকানের দিকে হর্ষবর্ধনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়—'দোকানটা এ রকম দাঁত বের করে রয়েছে কেন দেখা যাক তো !'

উভয়ে দাঁত-বের-করা দোকানের দিকে অগ্রসর হন। 'বাবা, দাঁতের কী বাহার ! দেখলে পিলে চমকায় ! এটা কিসের দোকান হ্যা ?'

একজন সাহেবি-পোশাক-পরা ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে হর্ষবর্ধনের কথার জবাব দেন—'আমরা দাঁত তুলি, দাঁত বাঁধাই। আমিই ডেন্টিস্ট।'

'গোবরা, তোর পোকা-খাওয়া দাঁতটা তোলাবি ?'

'তা তোলালে হয়, পোকারা খেয়ে শেষ করতে কদ্দিন লাগবে কে জানে ! ওদের ওপর তো বরাত দেওয়া যায় না !'

'হ্যাঁ, তুলেই ফ্যাল্‌। পরের ওপর নির্ভর করা ভালো নয়। তা, কতক্ষণ লাগবে একটা দাঁত তুলতে ?'

ডেন্টিস্ট বলেন—'কতক্ষণ আর ? এক মিনিট। আপনি টেরও পাবেন না।'

'কত মজুরি ?'

'মজুরি কী মশাই, ফিস বলুন !'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এক কথাই—চেঁচিয়ে বলি আর ফিস-ফিস করেই বলি। দিতে হবে কত ?'

'দশ টাকা আমাদের চার্জ।'

'বলেন কী মশাই ! এক মিনিটের কাজের জন্যে দ—শ টাকা ! আপনি কি ডাকাত ? চলে আয় গোবরা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে পেয়ে ভদ্রলোক ঠকাচ্ছেন, চলে আয়, আর দাঁত তুলিয়ে কাজ নেই।'

গোবরাও অবাক হয়—'সত্যিই তো ! মিনিটে মিনিটে দশ-দশ টাকা রোজগার, তাও

আবার পরের দাঁত তুলে! শহুরে ঠক দাদা, পালাই চল এখান থেকে! আধ ঘণ্টা কাঠ চিরলে একখানা তক্তা হয়, তার দাম আট আনাও না; আর এদিকে এক মিনিটে দশ টাকা—তাও আবার গোটা দাঁত নয়, আধখানা দাঁত!'

হর্ষবর্ধন রুষ্ট হয়ে ওঠেন—'আমরা বেড়াতে এসেছি, খরচ করতেই এসেছি তাতে ভুল নেই, কিন্তু ঠকতে রাজী নই আমরা। হ্যাঁ, যদি ন্যায্য হয় দুশো টাকা নাও দিচ্ছি, কিন্তু ঠকিয়ে কেউ এক পয়সাও নিতে পারবে না আমাদের, হুঁ!'

মেজাজ আর ধরন-ধারণেই দাঁতের ডাক্তার বুঝতে পেরেছিলেন যে খদ্দের কেবল দাঁতালোই নয়, শাঁসালোও বটে। এমন মক্কেল হাত-ছাড়া করা ঠিক না; তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যদি একটা দাঁতের জন্যে দশ টাকা খরচ করতে নারাজ হয়, না-হয় দশটা দাঁতই তুলিয়ে নিক। তাঁর আপত্তি নেই, কেননা তাঁর পক্ষে তো দশ মিনিটের মামলা! তাহলেই তো আর ঠকা হবে না!

নিতান্তই চলে যায় দেখে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করলেন—'দশ টাকায় একটা দাঁত তোলানো যদি লোকসান মনে করেন, না-হয় দু'জনের দুটো দাঁত তুলে দিচ্ছি ঐ এক চার্জে।'

হর্ষবর্ধনকে দলের পাণ্ডা বিবেচনা ক'রে ডেন্টিস্ট তাঁকেই হাত করার মতলব করলেন—'দেখুন, বাজার মন্দা, কমপিটিশন খুব কীন, সবই জানি, কিন্তু আমাদের রেট তো কমাতে পারি নে! বরং আপনার একটা দাঁত না হয় অমনি তুলে দিতে রাজী আছি। এর চেয়ে আর কী কনসেশন আশা করেন বলুন!'

হর্ষবর্ধন অবাক হন—'একেবারে অমনি?'

'একেবারে।'

'পোকায় না খেলেও?'

'ক্ষতি কী?'

হর্ষবর্ধন কিন্তু আপ্যায়িত হন না। 'মশাই, আমরা কলকাতায় এসেছি, টাকা খরচ করব এ কথাও সত্যি; কিন্তু তাই বলে যে অনর্থক দাঁত খরচ করে যাব এ দুরাশা আপনি মনেও স্থান দেবেন না। অমনি হলেও না!'

গোবরা বলে—হ্যাঁ, টাকা আমাদের অঢেল হতে পারে, কিন্তু দাঁত আমাদের মুষ্টিমেয়। বাজে খরচ করবার মত দাঁত নেই আমাদের।'

হর্ষবর্ধন উষ্ণ হয়ে ওঠেন—'আমাদের পাড়াগেঁয়ে দেখে আপনি হয়ত ভেবেছেন যে একটা দাঁও। কিন্তু ভুল ধারণা মশাই আপনার, যত বোকা আমাদের দেখায় তত বোকা নই আমরা! আমরাও ব্যবসা করি—কিন্তু দাঁতের নয়, কাঠের।'

গোবরা সানাইয়ের কাজ করে—'হ্যাঁ, ব্যবসা করেই খাই আমরা, কিন্তু গলায় ছুরি বসাই না।'

এতক্ষণে ডেন্টিস্ট কথা বলার ফুরসত পান—'আমিও না। ছুরি নয়—সাঁড়াশি বসানোই আমার কাজ, তাও গলায় নয়, দাঁতে।' তিনি গোবর্ধনকে সংশোধন করে দেন।

হর্ষবর্ধন চটে যান—'তা, সাঁড়াশিই বসান আর খুন্তিই বসান কিংবা হাতাই বসান, এক মিনিটের কাজের মজুরি যে দশ টাকা দিয়ে ফেলব, এত ছেলেমানুষ পান নি আমাদের!'

গোবরা দাদার কথায় সায় দেয়—'আর হাতুড়িই বসান!'

ডেন্টিস্ট যেন এতক্ষণে আলো দেখতে পান—'ও, এই কথা! এক মিনিটের কাজে দশ টাকা দিতে আপনাদের আপত্তি? তা, না-হয় এক ঘণ্টা ধরে আস্তে আস্তে দাঁতটা তুলে দিচ্ছি—তাহলে তো হবে?' তাঁর প্রাণে আশার সঞ্চার হয়।

এবার হর্ষবর্ধন খুশি হয়ে ওঠেন; 'হ্যাঁ, তাহলে আপত্তি নেই। উচিত খাটুনির উচিত দাম নেবেন, এতে নারাজ হবে কে? কী বলিস গোবরা?'

গোবরাও উৎসাহিত হয়—'দু-ঘণ্টা ধরে তুলুন—কুড়ি টাকা নিন—উচিত মজুরি দিতে আমরা পেছোব না। কিন্তু এক মিনিটে—জানতেও পেলাম না, বুঝতেও পেলাম না সে কি কথা!'

ডেন্টিস্ট গোবরাকে নির্দেশ করেন—'নিন, বসে পড়ুন তো ঐ চেয়ারটায়! আপনাদের অভিরুচিটা স্পষ্ট করে বললেই পারতেন প্রথমে, এত বকাবকি হত না! দেখে নেবেন আপনি, এমনভাবে এত আস্তে একটু একটু করে তুলব যে আপনি তো টের পাবেনই, পাড়াসুদ্ধ লোক টের পাবে যে হ্যাঁ, একটা দাঁত তুলছে বটে!'

গোবর্ধনের ভারি আনন্দ হয়—'হুঁ; যেন পোকারাও টের পায়! ভারি বজ্জাত ব্যাটারা; ভারি যন্ত্রণা দেয় মাঝে মাঝে।' সে জিঘাংসা-পরায়ণ হয়ে ওঠে।

হর্ষবর্ধনের হাসি ধরে না—'এই তো চাই! দাঁত তোলা হবে, কাক-চিল জানতে পাবে না—সে কী কথা! পাড়াসুদ্ধ জানুক যে হ্যাঁ, একটা মানুষের মত মানুষের দাঁত তোলা হচ্ছে! নইলে দাঁত তুলে লাভ কী! কথায় বলে, হাতিকা বাৎ, মরদকা দাঁত!'

ডেন্টিস্ট বাধা দেন—'উঁহু, ভুল হল কথাটা। মরদকা বাৎ হাতিকা—'

হর্ষবর্ধন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন—'দুই-ই হয়। হাতিকা বাৎ তো শোনেন নি! কী করে শুনবেন, থাকেন কলকাতায়! আমরা আসামের জঙ্গলে থাকি, দিনরাত শুনতে পাই।'

ডেন্টিস্টের চোখ কপালে ওঠে—'কেন, সেখানে কি হাতির দাঁত হয় না?'

'হয় না তা কি বলেছি?' হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে দেন, 'কথাটার মানে হল এই যে হাতির আওয়াজ যেমন জোরালো তেমনি জোর হবে পুরুষের দাঁতের। যাকে কামড়াবে তার আর রক্ষা নেই। সেই যে শক্ত ব্যামো—জল দেখলে ঘাবড়ায়—তাতেই খতম, নির্ঘাৎ! কী ব্যামো রে গোবরা?'

গোবরা মাথা চুলকোতে থাকে—'কি হাইডো না ফাইডো—'

'হ্যাঁ, ফাইড্রো-হোবিয়া। ইংরিজি কথা মনে রাখা কি সোজা রে দাদা!' হর্ষবর্ধন আরো বিশদ করে দেন, 'বুঝলেন মশাই, দাঁতই হল গে মানুষের প্রধান অস্ত্র। প্রথমে দাঁত, তার পরেই হাত।'

গোবরা নিজের গবেষণা যোগ করে—'ও দুটো কাজে না লাগলে তারপরেই পা—পালাবার জন্যে।'

বক্তৃতায় বাধা দেওয়ার জন্য হর্ষবর্ধন ভাইয়ের ওপর গরম হয়ে ওঠেন—'তা বলে পা অস্ত্র নয় তোমার। বরং বাহন বলতে পার, পায়ে চেপেই তো আমাদের যাতায়াত।'

পাছে দু'ভাই দোকানের মধ্যেই নিজেদের অস্ত্রবলের পরিচয় দিতে শুরু করে দেন সেই ভয়ে ডেন্টিস্ট তাঁর মক্কেলের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন—'বসে পড়ুন চেয়ারটায়। আবার তো অনেকক্ষণ লাগবে দাঁতটা তুলতে।'

গোবরা বলে—'এখন কী করে হবে? এখন তো এক ঘণ্টা ছেড়ে এক মিনিট সময় নেই আমাদের। শহর দেখতে বেরুচ্ছি এখন, সন্ধ্যার পরে হবে। কী বল দাদা!'

'সেই ভালো। এর মধ্যে তুই বরং কাবুলি ইঁদুরের গর্তটা খুঁজে রাখিস। দাঁতটা সেই গর্তে দিলে কাবুলি দাঁত পাবি।'

'কী হবে দিয়ে? আর কি দাঁত উঠবে? এ তো দুধে-দাঁত নয়!' গোবরা সন্দেহ প্রকাশ করে।

'এ জন্মে না ওঠে পরজন্মে তো উঠবে? আরে কর্মফল যাবে কোথায়!'

'তাহলে তো কাবুলি হয়ে জন্মাতে হয় দাদা।'

'যদি হয় তো হবে। তোর বুলি শুনিয়ে লোককে কাবু করে দিবি—মন্দ কী!' ভবিষ্যতের কল্পনায় গোবর্ধন মুহ্যমান হয় কি না হয় ঠিক বোঝা যায় না।

ভাইকে করতলগত করে হর্ষবর্ধন অগ্রসর হন। 'আচ্ছা, আসি তাহলে ডেন্টিস্ট মশায়। কী দাঁত-ভাঙা নাম মশায় আপনার। কোন সাহেব রেখেছিল বুঝি? যেন ইংরিজি ইংরিজি মনে হচ্ছে!'

'হুঁ, যা বলেছ দাদা! ডেনটিশ মেনটিশ কখনও বাঙালীর নাম হয়? পারবেন মশাই, পারবেন—আপনিই পারবেন দাঁত তুলতে! আপনাকে উচ্চারণ করতেই দাঁত উঠে আসে—সাঁড়াশির দরকার হয় না! ডেনটিশ—বাব্বাঃ! কী নাম!'

অতিথিরা অন্তর্হিত হলে ডেন্টিস্ট দু-বার কাঁধে ঝাঁকি দেন—'কোথাকার আমদানি কে জানে! বাহনের সাহায্য যখন নিয়েছে, আর ফিরবে বলে বোধ হয় না। না ফিরুক, যা চমৎকার আইডিয়া একখানা দিয়ে গেছে তারই দাম দশ টাকা!'

এক ঘণ্টা পরে তাঁর দরজার ওপরে নতুন একটা সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা যায়:

"দাঁতই হল মানুষের প্রধান অস্ত্র
নিরস্ত্র লোককে সশস্ত্র করাই আমাদের কাজ।
আমরা দাঁত বাঁধাই।"

ততক্ষণে দু'ভাই তিনতালা মোটরের অপেক্ষায় ফুটপাতের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়রান হয়ে উঠেছেন। অবশেষে হর্ষবর্ধন হতাশ হয়ে পড়েন—'নাঃ, আর আশা নেই। বেশিতালার মোটর সব ভাড়া হয়ে গেছে আজ। তার চেয়ে এক কাজ করি, ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা যাক। সেটাও তো একটা চাপবার জিনিস!'

গোবরার মোটরে চাপার শখ, সে নিরুৎসাহিত হয়—'দূর। ঘোড়ার গাড়িতে আবার মানুষ চাপে!'

হর্ষবর্ধন উত্তেজিত হন—'কেন চাপবে না? ঘোড়ায় চাপে, তো ঘোড়ার গাড়ি! তোর যে কেন এত মোটরের ঝোঁক—আমি বুঝি না! আমার তো নিত্যি নতুন জিনিস চাপতে ইচ্ছে করে। ঘোড়ার গাড়ি কি গাড়ি না? আমি ডাকছি ঐ গাড়িটাকে—এই কচুয়ান, কচুয়ান!'

ক্যোচম্যান গাড়ি এনে হাজির করে। 'কোথায় যেতে হবে বাবু?'

গোবর্ধন অসন্তোষ প্রকাশ করে—'গাড়ি তো নয়, চার চাকার পিঁজরে!'

হর্ষবর্ধন ততক্ষণে ক্যোচম্যানের কেশবিন্যাস দেখে আত্মহারা—'বাঃ, তোমার খাসা চুল তো হে। কোন নাপিতের কাছে ছেঁটেছ?'

'নাপিত নয়, সেলুনের ছাঁট।'

'চালই তো কলে ছাঁটে জানি, আজকাল চুলও কলে ছাঁটছে? কালে কালে হল কী! তা, কোথায় কিনতে মেলে এই সেলুন-কল? একটা দেশে নিয়ে যাব তাহলে।'

'কোন কল না বাবু, সেলুন হচ্ছে চুল ছাঁটার দোকান।'

'দোকানে চুল ছেঁটে দেয়? কলকাতার হালচালই অদ্ভুত! তা বাপু তুমি সেই দোকানে নিয়ে চল আমাদের। আমরা তোমার মত করে চুল ছাঁটব। ভাড়া বল, বকশিশ বল, দশ টাকা দেব তোমাকে। দে তো গোবরা, একখানা নোট ওকে। নাও আগাম নাও।'

গাড়িতে চেপে হর্ষবর্ধনের স্ফূর্তি হয়, 'ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছিলাম বলেই তো চুল ছাঁটার দোকান জানলাম! কখন কিসে কার থেকে কী উপকার হয় কেউ বলতে পারে? কলকাতার মত চুল ছাঁটলে পাড়াগেঁয়ে বলে কারুর সন্দেহও হবে না, কেউ আমাদের ঠকাতেও সাহস করবে না।'

গোবর্ধন গুম্ হয়ে থাকে।

'তা ছাড়া কলকাতায় এলাম, তার একটা চিহ্ন তো নিয়ে যেতে হবে, আমাদের মাথা দেখে তবু এখানকার হালচালের কিছু পরিচয় পাবে দেশের লোক। তারা কত অবাক হবে ভাব তো!'

তবুও গোবর্ধন সাড়া দেয় না।

'সারা কলকাতা তো মাথায় করে নিয়ে যেতে পারি না, তাই মাথাটা কলকাতার মত করে নিয়ে যাই।'

গোবর্ধন একবার জবাব দেয়—'কে যেন গোটা গন্ধমাদনই মাথায় করে নিয়ে গেছেন?'

হর্ষবর্ধন কি-একটা জবাব দিতে যান, কিন্তু বাধা পড়ে; ক্যোচম্যান গাড়ির দরজা খুলে ডাকে—'নামুন বাবু, এসে পড়েছি।'

হর্ষবর্ধনের চোখ কপালে ওঠে—'সে কি! এক মিনিটও তোমার গাড়ি চাপলাম না, এর মধ্যেই এসে পড়লাম!'

গোবর্ধন বলে—'কড়কড়ে দশটা টাকা দিয়েছি।'

ক্যোচম্যান জবাব দেয়—'যেখানে যেতে বললেন নিয়ে এলাম। বিশ্বাস না হয় ঐ দেখুন দোকানের সাইনবোর্ড।'

দুই ভাই গাড়ির দুই জানলা দিয়ে মুখ বাড়ান—সত্যিই, অবিশ্বাসের কারণ নেই, "সাইনবোর্ডে" স্পষ্ট বড় বড় হরফে লেখা—

"এখানে উত্তমরূপে চুল ছাঁটা আর দাড়ি কামানো হয়।"

হর্ষবর্ধন তবু ইতস্তত করেন—'এত শিগগির এল! তোমার গাড়ি যে বাপু মোটরের চেয়েও জোর চলে দেখছি। গাড়ি চাপলাম, তা টেরই পেলাম না!'

গোবরাও নামতে রাজী হয় না—'তোমার কি বাপু পক্ষীরাজ ঘোড়া? একেবারে যেন উড়িয়ে নিয়ে এল!'

ক্যোচম্যান বলে—'তা যখন দশ টাকা পেয়েছি হুকুম করেন তো আপনাদের আলিপুর ঘুরিয়ে আবার এখানেই নিয়ে আসছি। কিন্তু আলিপুরে গেলে একটা মুশকিল আছে।'

'কী? কী মুশকিল? কিসের মুশকিল?' দুই ভাই যুগপৎ প্রশ্ন করেন।

'সেখান থেকে আপনাদের ফিরতে দিলে হয়!' ক্যোচম্যান একটু মুচকি হাসে।

গোবরা বলে—'কেন? কেন ফিরতে দেবে না? কে ফিরতে দেবে না? কার অ্যাদ্দুর ক্ষমতা? আমরা পালিয়ে আসতে জানি!'

হর্ষবর্ধন অধিকতর সমীচীন হন—'উঁহু, দরকার নেই গিয়ে! জায়গাটা বোধহয় খারাপ, প্রাণের ভয়-টয় আছে। নইলে বারণ করবে কেন? নেবে পড়্‌ গোবরা।' তিনি ভুঁড়িকে অগ্রবর্তী করেন, গোবরা পশ্চাদ্বর্তী হয়।

গাড়ি চলে গেলে গোবরা আকাশ থেকে পড়ে—'আরে, এ যে আমাদের সামনের বাড়ি! কাল থেকে দুশো বার এ সেলুনটা আমার চোখে পড়েছে। কেবল ভাবছি, নীল কাঁচের দরজা দেওয়া ঘরটা কী হতে পারে! তখন তো জানি নি এই-ই সেলুন!'

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন—'বলিস কী?' তিনি ঘুরে দাঁড়ান। 'তাই তো! ঐ যে ও ফুটপাথে আমাদের বাড়ি। আর ঐ পাশে সেই ডেন্টিস্টের দোকান!'

এমন সময়ে একটি বছর পনেরর ফুটফুটে ছেলে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসে। গোবর্ধন তাকে চিনতে পারে—'তোমাকে যেন দেখেছি। তুমি আমাদের পাশের বাড়ির না?'

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে—'কোন্ বাড়ি আপনাদের?'

'ঐ যে আমার ছবি সাঁটা রয়েছে—দেয়ালে—' ভুল ধরতে পেরে হর্ষবর্ধন তৎক্ষণাৎ শুধরে নেন—'উঁহু, আমার নয়, কিং কঙের ছবি সাঁটা রয়েছে আমাদের দেয়ালে—'

'দেখেছি। আর ঐ বাড়িটা আমাদের।' ছেলেটি দাঁত-বের-করা দোকানটা নির্দেশ করে, 'ডেন্টিস্ট আমার বাবা।'

'অ্যাঁ, বল কী? হাঁ কর তো! একি, তোমার সবগুলো দাঁতই যে রয়েছে! একটাও তোলেন নি তো!' হর্ষবর্ধন চমৎকৃত হন।

গোবর্ধন বলে—'তোমার বাবা বোধহয় তোমাকে ভালোবাসেন না?'

'তোমার দাঁতগুলো সব বাঁধানো বোধহয়?' হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ হন।

ছেলেটি ঘোরতর প্রতিবাদ করে—'বাঃ, তা কেন? কখনই না!'

গোবরার কৌতূহল হয়—'টেনে দেখতে দেবে?'

'এই যে আমি নিজে টানছি, দেখুন না!' ছেলেটি প্রাণপণ বলে দুহাতে দুপাটি আকর্ষণ করে।

তথাপি হর্ষবর্ধনের সন্দেহ থেকে যায়—'উঁহু, তুমি জান না যে তোমার দাঁত বাঁধানো। তুমি ডেন্টিস্টের ছেলে, তোমার কখনও আসল দাঁত হয়? দুপাটিই তোলা হয়েছে, তোমার মনে নেই।'

গোবরা বলে—'সেলুনে বুঝি চুল ছাঁটতে গেছলে?'

'দাড়ি কামাতে গেছলাম।'

'এইটুকু ছেলে তোমার দাড়ি কই!' বিস্ময়ে হর্ষবর্ধন বিরাট হাঁ করেন।

দাড়িহীনতার লজ্জায় ছেলেটি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে—'দাড়ি আর টাকা কি অমনি আসে মশাই? কামাতে হয়। আমার কথা নয়, মাস্টারমশাই বলেন। আমার ইস্কুলের টাইম হল।'

ছেলেটি চলে যায়, দুই ভাই কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকেন। অবশেষে গোবর্ধন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে—'কী রকম বুঝলে দাদা কলকাতার হালচাল?'

হর্ষবর্ধন মাথা চুলকোতে থাকেন—'তাই তো!'

'এ বাড়ির লোকের দাড়ি না গজাতেই সামনের বাড়ির লোক সেলুন খুলে বসে গেছে। আজব শহর দাদা, কী বল!'

হর্ষবর্ধন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন—'চল্, সেলুনে ঢুকি!'

অষ্টম ধাক্কা

কেশ-কর্ষণের করুণ কাহিনী

কাল থেকে গোবর্ধন নীল কাঁচের দরজায় নজর রেখেছে এবং ওর অন্তরালে কী ব্যাপার হতে পারে তাই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে—সেই নীল কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য যে কোনদিন তার জীবনে হবে, এ সে প্রত্যাশা করতে পারে নি। নানা চেহারার, নানা বয়সের, নানা সাইজের হরেক রকম লোককে ওই দরজা ঠেলে যেতে-আসতে সে দেখেছে আর ভেবেছে, বিশ্বশুদ্ধ লোকই কি ঐ বাড়ির বাসিন্দা! কিন্তু এখন কেবল আর এক মুহূর্তের ব্যবধান—একটু পরেই ঐ রহস্যলোকের দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হবে। ডিটেকটিভ বইয়ের শেষ পাতায় এসে কিশোর পাঠকের বুক যেমন কাঁপতে থাকে, গোবর্ধনের এখন সেই অবস্থা।

যবনিকা অনাবৃত হলে দেখা যায়, ছোট্ট একখানি ঘর মাত্র। তার মধ্যেই কায়দা করে খান-ছয়েক চেয়ার সাজানো—ছ-টা বিরাট আয়নার সামনে; সবকটা চেয়ারেই তখন ক্ষুর আর কাঁচির খুব জোর খচ-খচ! হর্ষবর্ধন ভাবেন, কী আশ্চর্য, এইটুকু ঘরে বিশ্ব-ভারতের আমন্ত্রণ! যাদের মাথা আছে আর মাথায় চুল আছে তাদের কারুই অব্যাহতি নেই এখানে না এসে—সারা দুনিয়ার দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে এরা! বাহাদুর বটে! গোবর্ধন কী ভাবে বলা যায় না, কী ভাবা উচিত, বোধকরি সেই কথাই তিনি ভাবেন।

যাওয়া-মাত্রই কর্তা-নাপিত এসে দুই ভাইকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে, দুজনকে দুটো কুশন-চেয়ারে বসতে দেয়, একজোড়া মাথা ও গালের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবিনয়ে জানায় যে ওই দুটির 'চুলহীন ও নির্দাড়ি' হতে আর সামান্যই বাকি আছে, তার পরেই তাঁদের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে।

কলকাতায় আসার পর এই প্রথম অভিনন্দন লাভ, হর্ষবর্ধন খুশি হয়ে ওঠেন। গোবর্ধনও রীতিমত বিস্মিত হয়। নীল কাঁচের নেপথ্য-লোকের যিনি একচ্ছত্র মালিক তাঁর পর্যন্ত কী অমায়িক ব্যবহার! হ্যাঁ, শহরের হলেও এবং হাতে ধারালো ক্ষুর থাকলেও এমনি লোকের কাছেই গাল ও গলা (দাড়ি সমেত) নির্ভয়ে বাড়ানো যায়—এমন কি এর কাঁচির তলায় মস্তক দান করাও শক্ত ব্যাপার নয়।

গোবর্ধন অবাক হয়ে লক্ষ্য করে। সত্যিই, রহস্যলোকই বটে! ওধারের আয়নার ছায়া এধারের আয়নায় পড়েছে, আর কিছুই না, কিন্তু কী আশ্চর্য! একই আয়নার মধ্যে গোবর্ধন দেখছে একশোটা ঘর, একশোটা আয়না! ঘরগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে হয়ে যেন অনন্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। অদ্ভুত কাণ্ড! গোবর্ধন ভাবছে, এখান থেকে বেরিয়েই দাদাকে প্রস্তাব করবে, এমনি এককুড়ি বড় বড় আয়না বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। প্রত্যেক ঘরে দুটো করে মুখোমুখি সাজিয়ে দেওয়া হবে—তাতে ঘরের সংখ্যা বাড়বে আত্মপ্রসাদও

বাড়বে সেইসঙ্গে, অথচ পয়সা খরচ করে ঘর বাড়াতে হবে না। বাড়িতে যে আয়নাটা আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন এখন কেবল আর একটা গোবর্ধনকে মাত্র দেখতে পায়, কিন্তু এইরকম পলিসি করলে তখন একশোটা গোবর্ধনকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে— গোবর্ধনের সামনের চেহারা আর পেছনের চেহারা যুগপৎ! কী মজাই না হবে তাহলে!

যাদের চুল-দাড়ির গতি হচ্ছিল, হর্ষবর্ধন বসে বসে তাদের ভাবগতিক দেখছিলেন। অবশেষে তিনি ফিস্‌-ফিস্‌ করতে বাধ্য হন—'গোবরা দেখেছিস, লোকগুলোর মুখের ভাব হাসি-হাসি নয় কিন্তু!'

'চুল-ছাঁটা কি হাসির ব্যাপার দাদা!'

'জানি গুরুতর ব্যাপার; কিন্তু তাই বলে এতখানি গোমড়া মুখ করতে হবে এই বা কী কথা?'

গোবরা অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে—'হুঁ, লোকগুলো যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে!'

হর্ষবর্ধন সায় দেন—'যা বলেছিস! হাল আর মাথা দুই-ই হল এক জিনিস, দুটোরই কর্ণ আছে কিনা! মাঝিকে বলে কর্ণধার—শুদ্ধ ভাষায়, জানিস?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে—'নাপিতকেও বলা যায় ও-কথা। কর্ণধার তো বটেই, তা ছাড়া নাপিতের ক্ষুরেও ধার।'

একটা আয়নার চেয়ার খালি হয়, হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণ আসে। গোবরা ত্যাগীর ভূমিকা নেয়—'দাদা, তুমিই ছাঁটো আগে, আমার পরে হবে।'

হর্ষবর্ধনের ভাই-অন্ত প্রাণ, ভাইকে ছেড়ে কোন কাজে তাঁর মন সরে না। একসঙ্গে ট্রেনে উঠেছেন, ট্রেন থেকে নেমেছেন, মোটর চেপেছেন, কলকাতার সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাঁরা একসঙ্গে আস্বাদ করেছেন, অথচ চুল-ছাঁটার আনন্দ একা তাঁকেই প্রথম উপভোগ করতে হবে! ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ কাঁচুমাচু হয়: 'বেশ, তুই না-হয় আগেই দাঁত তোলাস।' তারপর কি ভাবেন খানিকক্ষণ—'আমি না-হয় দাঁত তোলাবই না।' হ্যাঁ গোবরার দাদ্‌-ভক্তির বিনিময় তিনি অবশ্যই দেবেন, দাঁত তোলার আনন্দ থেকে তিনি কঠোরভাবে নিজেকে বঞ্চিত রাখবেন। ভাইয়ের জন্যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর প্রাণ চওড়া হয়ে ওঠে। গোবরা দাদৃভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু ভ্রাতৃভক্তির তুলনাই কি পৃথিবীতে আছে?

চেয়ারে বসে চুল-ছাঁটানো হর্ষবর্ধনের জীবনে এই প্রথম। চুল-ছাঁটার কথা শুনলেই চিরকাল তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে এসেছে, আর দাড়ি কামানোর সময়ে মনে হয়েছে চীনে-ম্যানেরাই পৃথিবীতে সুখী। চীনে দাড়ির প্রাদুর্ভাব কম, হর্ষবর্ধনের ধারণা সে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের এই হচ্ছে একমাত্র কারণ।

কেশ-কর্ষণের করুণ কাহিনী

কাল থেকে গোবর্ধন নীল কাঁচের দরজায় নজর রেখেছে এবং ওর অন্তরালে কী ব্যাপার হতে পারে তাই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে—সেই নীল কাঁচের দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য যে কোনদিন তার জীবনে হবে, এ সে প্রত্যাশা করতে পারে নি। নানা চেহারার, নানা বয়সের, নানা সাইজের হরেক রকম লোককে ওই দরজা ঠেলে যেতে-আসতে সে দেখেছে আর ভেবেছে, বিশ্বশুদ্ধ লোকই কি ঐ বাড়ির বাসিন্দা! কিন্তু এখন কেবল আর এক মুহূর্তের ব্যবধান—একটু পরেই ঐ রহস্যলোকের দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হবে। ডিটেকটিভ বইয়ের শেষ পাতায় এসে কিশোর পাঠকের বুক যেমন কাঁপতে থাকে, গোবর্ধনের এখন সেই অবস্থা।

যবনিকা অনাবৃত হলে দেখা যায়, ছোট্ট একখানি ঘর মাত্র। তার মধ্যেই কায়দা করে খান-ছয়েক চেয়ার সাজানো—ছ-টা বিরাট আয়নার সামনে ; সবকটা চেয়ারেই তখন ক্ষুর আর কাঁচির খুব জোর খচ-খচ! হর্ষবর্ধন ভাবেন, কী আশ্চর্য, এইটুকু ঘরে বিশ্ব-ভারতের আমন্ত্রণ! যাদের মাথা আছে আর মাথায় চুল আছে তাদের কারুই অব্যাহতি নেই এখানে না এসে—সারা দুনিয়ার দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে এরা! বাহাদুর বটে! গোবর্ধন কী ভাবে বলা যায় না, কী ভাবা উচিত, বোধকরি সেই কথাই তিনি ভাবেন।

যাওয়া-মাত্রই কর্তা-নাপিত এসে দুই ভাইকে সমাদরে অভ্যর্থনা করে, দুজনকে দুটো কুশন-চেয়ারে বসতে দেয়, একজোড়া মাথা ও গালের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবিনয়ে জানায় যে ওই দুটির 'চুলহীন ও নির্দাড়ি' হতে আর সামান্যই বাকি আছে, তার পরেই তাঁদের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে।

কলকাতায় আসার পর এই প্রথম অভিনন্দন লাভ, হর্ষবর্ধন খুশি হয়ে ওঠেন। গোবর্ধনও রীতিমত বিস্মিত হয়। নীল কাঁচের নেপথ্য-লোকের যিনি একচ্ছত্র মালিক তাঁর পর্যন্ত কী অমায়িক ব্যবহার! হ্যাঁ, শহরের হলেও এবং হাতে ধারালো ক্ষুর থাকলেও এমনি লোকের কাছেই গাল ও গলা (দাড়ি সমেত) নির্ভয়ে বাড়ানো যায়—এমন কি এর কাঁচির তলায় মস্তক দান করাও শক্ত ব্যাপার নয়।

গোবর্ধন অবাক হয়ে লক্ষ্য করে। সত্যিই, রহস্যলোকই বটে! ওধারের আয়নার ছায়া এধারের আয়নায় পড়েছে, আর কিছুই না, কিন্তু কী আশ্চর্য! একই আয়নার মধ্যে গোবর্ধন দেখছে একশোটা ঘর, একশোটা আয়না! ঘরগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে হয়ে যেন অনন্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। অদ্ভুত কাণ্ড! গোবর্ধন ভাবছে, এখান থেকে বেরিয়েই দাদাকে প্রস্তাব করবে, এমনি এককুড়ি বড় বড় আয়না বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। প্রত্যেক ঘরে দুটো করে মুখোমুখি সাজিয়ে দেওয়া হবে—তাতে ঘরের সংখ্যা বাড়বে আত্মপ্রসাদও

বাড়বে সেইসঙ্গে, অথচ পয়সা খরচ করে ঘর বাড়াতে হবে না। বাড়িতে যে আয়নাটা আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন এখন কেবল আর একটা গোবর্ধনকে মাত্র দেখতে পায়, কিন্তু এইরকম পলিসি করলে তখন একশোটা গোবর্ধনকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে—গোবর্ধনের সামনের চেহারা আর পেছনের চেহারা যুগপৎ! কী মজাই না হবে তাহলে!

যাদের চুল-দাড়ির গতি হচ্ছিল, হর্ষবর্ধন বসে বসে তাদের ভাবগতিক দেখছিলেন। অবশেষে তিনি ফিস্-ফিস্ করতে বাধ্য হন—'গোবরা দেখেছিস, লোকগুলোর মুখের ভাব হাসি-হাসি নয় কিন্তু!'

'চুল-ছাঁটা কি হাসির ব্যাপার দাদা!'

'জানি গুরুতর ব্যাপার; কিন্তু তাই বলে এতখানি গোমড়া মুখ করতে হবে এই বা কী কথা?'

গোবরা অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে—'হুঁ, লোকগুলো যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে!'

হর্ষবর্ধন সায় দেন—'যা বলেছিস! হাল আর মাথা দুই-ই হল এক জিনিস, দুটোরই কর্ণ আছে কিনা! মাঝিকে বলে কর্ণধার—শুদ্ধ ভাষায়, জানিস?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে—'নাপিতকেও বলা যায় ও-কথা। কর্ণধার তো বটেই, তা ছাড়া নাপিতের ক্ষুরেও ধার।'

একটা আয়নার চেয়ার খালি হয়, হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণ আসে। গোবরা ত্যাগীর ভূমিকা নেয়—'দাদা, তুমিই ছাঁটো আগে, আমার পরে হবে।'

হর্ষবর্ধনের ভাই-অন্ত প্রাণ, ভাইকে ছেড়ে কোন কাজে তাঁর মন সরে না। একসঙ্গে ট্রেনে উঠেছেন, ট্রেন থেকে নেমেছেন, মোটর চেপেছেন, কলকাতার সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাঁরা একসঙ্গে আস্বাদ করেছেন, অথচ চুল-ছাঁটার আনন্দ একা তাঁকেই প্রথম উপভোগ করতে হবে! ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ কাঁচুমাচু হয়: 'বেশ, তুই না-হয় আগেই দাঁত তোলাস।' তারপর কি ভাবেন খানিকক্ষণ—'আমি না-হয় দাঁত তোলাবই না।' হ্যাঁ গোবরার দাদৃ-ভক্তির বিনিময় তিনি অবশ্যই দেবেন, দাঁত তোলার আনন্দ থেকে তিনি কঠোরভাবে নিজেকে বঞ্চিত রাখবেন। ভাইয়ের জন্যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর প্রাণ চওড়া হয়ে ওঠে। গোবরা দাদৃভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু ভ্রাতৃভক্তির তুলনাই কি পৃথিবীতে আছে?

চেয়ারে বসে চুল-ছাঁটানো হর্ষবর্ধনের জীবনে এই প্রথম। চুল-ছাঁটার কথা শুনলেই চিরকাল তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে এসেছে, আর দাড়ি কামানোর সময়ে মনে হয়েছে চীনে-ম্যানেরাই পৃথিবীতে সুখী। চীনে দাড়ির প্রাদুর্ভাব কম, হর্ষবর্ধনের ধারণা সে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের এই হচ্ছে একমাত্র কারণ।

হ্যাঁ, দাড়ি কামানোর সময়ে হর্ষবর্ধনের মনে হয়েছে, এর চেয়ে চীন দেশে জন্মানো ভাল ছিল। আসামের গাছপালা রেহাই পেত, তিনিও রেহাই পেতেন। দেশি নাপিতকে যদি বলেছেন—'দাড়িটা আর একটু ভিজিয়ে নাও হে—বড় লাগছে,' অমনি তার জবাব পেয়েছেন, 'দরকার হবে না বাবু, আপনার নয়নজলেই সেরে নিতে পারব।' বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজের দাড়ির ওপর অশ্রুবর্ষণ করতে হয়েছে। যদি বলেছেন—'তোমার ক্ষুরটা ভারি ভোঁতা বাপু!' আপনি বাপুর উত্তর, 'ডবল খাটুনি হল তার দ্বিগুণ মজুরি দিন তবে।' সুতরাং আর এক দফা অশ্রুবর্ষণ। আর চুল ছাঁটার কথা না তোলাই ভাল। উবু হয়ে বসে খবরের কাগজের মাঝখানে ফুটো করে মাথা গলিয়ে ঝাড়া দু'ঘণ্টা সে কী কর্মভোগ! চুলের সঙ্গে কাঁচির সে কী ঘোরতর সংগ্রাম—আবার অনেক সময় ঠিক চুলের সঙ্গেই না, মাথার খুলি, কানের ডগা, খোদ হর্ষবর্ধনের সঙ্গেও। কাঁচির খোঁচা খেয়ে হর্ষবর্ধন ক্ষেপে ওঠেন; ইচ্ছা হয় নাপিতকে মনের সাধে দু'ঘা দেন কসিয়ে—কিন্তু দারুণ বাসনা তিনি দমন করে ফেলেন। নাপিতকে মারা আর আত্মহত্যা করা এক কথা, কেননা এমন সুযোগ প্রায়ই আসে যখন নাপিতের ক্ষুর আর গলার দূরত্ব খুব বেশি থাকে না। অনেক ভেবে হর্ষবর্ধন নাপিতকে মার্জনা করে ফেলেন। বিবেচক হর্ষবর্ধন।

কিন্তু প্রাণ নিয়ে পরিত্রাণ পেলেও চুল নিয়ে কি পরিত্রাণ আছে সে-সব নাপিতের কাছে? অনেক ধস্তাধস্তি করে মাথায়-মাথায় হয়ত রক্ষা পান, কিন্তু চুলের অবস্থা দেখে হর্ষবর্ধনের কান্না পায়—আয়নায় যেটুকু স্বচক্ষে দেখা যায় সে তো শোকাবহ বটেই, আর যে অংশ 'পরস্ব' চোখে জানতে হয় তার রিপোর্টও কম মর্মভেদী নয়। এধারে খপচানো, ওধারে খপচানো, কাকে-ঠোকরানো বকে-ঠোকরানো—যত দিন না চুল বেড়ে আবার ছাঁটবার মত হয়েছে তত দিন সে মাথা মানুষের কাছে দেখালে মাথা কাটা যায়। এই হেতু কাঁচি-হাতে নাপিতের আবির্ভাব দেখলেই হর্ষবর্ধনের জ্বর আসে, মাথা ধরে, ঘাম হয়, পেট কামড়াতে থাকে—ঠিক যে-সব উপসর্গ ছেলেবেলায় পাঠশালায় যাবার সময়ে অনিবার্যরূপে দেখা দিত।

কিন্তু সে চুল-ছাঁটার সঙ্গে এ চুল-ছাঁটার তুলনাই হয় না। এ কেমন চেয়ারে বসে সাদা চাদর জড়িয়ে (যাতে এমটিমাত্র পলাতক চুলও তোমার কাপড়-জামার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ না করতে পারে) দস্তুরমত আরাম! ঘণ্টাখানেক চোখ বুজে ঘুমিয়েও নিতে পার, জেগে দেখবে তোফা চুল ছেঁটে দিয়েছে—ঠিক কচুয়ানদের মত। তুমি কচুয়ান নও বলে যে তোমাকে কম খাতির করবে তা নয়—কোন রকম উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নাই এ সব শহুরে নাপিতের কাছে। যে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকায় না তাকেও এরা মানুষ বলেই গণ্য করে। কেন, হর্ষবর্ধনকে কি এরা কম মর্যাদা দেখিয়েছে? ঢোকামাত্রই কত সাদর সম্ভাষণ—ডেকে চেয়ারে বসানো—সম্বর্ধন কি কিছু কম করেছে এরা? তবু তো হর্ষবর্ধন

কচুয়ান নন ! হর্ষবর্ধন গ্যাঁট হয়ে বসে পড়েন চেয়ারে । আরামে গা এলিয়ে দেন । মাথার ওপরে হু-হু করে পাখা ঘুরছে—সম্মুখে নিজের চেহারা দেখবার স্বর্ণ সুযোগ—হর্ষবর্ধন স্বর্গসুখ উপভোগ করেন । মুখখানা হাসি-হাসি করে তোলার সাধ্যমত চেষ্টা করেন তিনি । নাপিত একটা নতুন ধরনের কাঁচি হাতে নেয়, কাঁচির কলেবর দেখে হর্ষবর্ধন অবাক হন । কাঁচি না বলে তাকে চিরুনিও বলা যায়, তার মুখের দিকে চিরুনির মত দাঁত আর হাতলের দিকটা অবিকল কাঁচি ! হর্ষবর্ধন বস্তুটির মনে মনে নামকরণ করেন—'কাঁচিরুনি' । নাপিতকে প্রশ্ন করেন, 'অদ্ভুত কাঁচি তো !'

'কাঁচি নয়, ক্লিপ ।' নাপিত উত্তর দেয় । 'পেছনটা ক্লিপছাঁটা করব তো ?'

'যেমন কলকাতার দস্তুর তাই কর ।'

ঘাড়ের পেছনে ক্লিপ চলতে থাকে, হর্ষবর্ধন শিউরে শিউরে ওঠেন । যন্ত্রটা তেমন আরামদায়ক নয় । যেন ঘাড়ের চামড়া একেবারে ছেঁচে নেয়, চুলগুলোকে যেন গোড়া থেকে সমূলে উপড়ে তোলে । কখনও ঘাড় কোঁচকান, কখনও টান করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সুবিধে করতে পারেন না । অবশেষে মরিয়া হয়ে তিনি লাফিয়ে ওঠেন—'থামাও তোমার কিলিপ ! ঘাড় গেল আমার ! এ যে দেখছি আসামী কাঁচির বাবা !'

নাপিত ঘাড় ধরে বসিয়ে দেয়, কোন উচ্চবাচ্য করে না । তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা । পাড়াগাঁয়ে যারা প্রথম চুল ছাঁটায় তারা সবাই এই রকমই করে কিন্তু পরে আবার তারাই চেহারার খোলতাই দেখে খুশি হয়ে আশাতীত বখশিশ দিয়ে ফেলে । ক্লিপ চলতে থাকে, হর্ষবর্ধন একবার কাতর নেত্রে গোবর্ধনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু কী করবেন, ভাগ্যের কবল থেকে কারু কি নিষ্কৃতি আছে ! তিনি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন । গোবরা তাকিয়ে দেখে, দাদার হাসি-হাসি মুখভাব বেশ কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসেছে এখন । নাপিতের হাত থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে নীল দরজা ভেদ করে সবেগে প্রস্থান করবে কি না সে ভাবতে থাকে । আপন মনে গজরায়—'আসলে হল খুরপি, নাম দিয়েছেন কিলিপ । তা, খুরপি চালাবে তো বাগানে চালাও গে, পরের ছেলের মাথায় কেন বাপু ?'

পেছন শেষ করে সামনে ছাঁটা শুরু হয়, কিলিপের স্থান অধিকার করে কাঁচি । সামনের চুল যেমন তেমনই থাকে, কেবল ডগাগুলো সামান্য ছেঁটে সমান করে দেওয়া হয় । কাজ সমাধা হয়েছে জানিয়ে, পছন্দ হয়েছে কি না নাপিত প্রশ্ন করে । হর্ষবর্ধন সেই প্রশ্ন গোবর্ধনের প্রতি নিক্ষেপ করেন ।

গোবর্ধন প্রাণপণে পর্যবেক্ষণ করে, কিন্তু চুল-ছাঁটাটা কোন্ জায়গায় হল খুঁজে পায় না । সামনের চুল তো ছোঁয়াই হয় নি আর পেছনটা দিয়েছে খুরপি দিয়ে একদম ন্যাড়া করে । সমান করে আঁচড়ালে সামনে দাড়ি পর্যন্ত ঢাকা পড়বে—নাক-মুখই দেখতে পাওয়া যাবে না, আর পেছনে তো মাথার খুলিই বেরিয়ে পড়েছে, তার সাদা চামড়া ঢাকতে গেলে

পরচুলোই পরতে হয় কি না কে জানে! গোবরা স্বাধীন অভিমত দেয়—'দাদা, তোমার পেছনে দিয়েছে দাড়ি কামিয়ে, আর সামনে? সামনে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ।'

'হুঁ, সামনেটা একটু কমানো দরকার।' হর্ষবর্ধন মন্তব্য করেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর আশঙ্কা হয়, কমাতে বললে হয়ত কাঁচি ছেড়ে কিলিপ দিয়ে কমাতে শুরু করে দেবে। ভয়াবহ যন্ত্রটার দিকে বঙ্কিম কটাক্ষ করে তিনি বলেন—'না, থাক।'

'তাহলে হেয়ার ড্রেস করি? নাপিত হর্ষবর্ধনের অনুমতির অপেক্ষা করে। হর্ষবর্ধন মনে মনে আলোচনা করেন, হেয়ার মানে তো চুল, অবশ্য খরগোসও হয় কিন্তু এখানে চুলই হবে, কিন্তু ড্রেস করবে—সে আবার কী! চুলে কাপড় পরাবে নাকি? তিনি ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করেন—'কিলিপের ব্যাপার নয় তো?'

'না না, মাথায় গোলাপ-জল দিয়ে—'

'তা দাও, তা দাও।' ঘাড়ের পেছনটা তখন থেকে ভারি জ্বলছিল, জল পড়লে হয়ত ঠাণ্ডা হতে পারে ভেবে হর্ষবর্ধন উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। 'আচ্ছা, চুল না ছাঁটলে বুঝি তোমরা গোলাপ-জল খরচ কর না—না?' নাপিত ঘাড় নাড়ে। 'কর! বটে? আহা, তা জানলে আমি ড্রেস হেয়ারই করাতাম, তাহলে চুল ছাঁটতো কোন্ হতভাগা!'

নাপিত গোলাপ-জল দিয়ে চুলগুলো ভিজিয়ে দেয়, দিয়ে চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে আঙুল চালায়। হর্ষবর্ধনের আরাম লাগে, ঘুম পায়। কিন্তু ক্রমশই নাপিতের 'ড্রেস হেয়ারে'র জোর বাড়তে থাকে, তার আঙুলগুলো যেন হয়ে ওঠে লৌহঘটিত—সে তার সমস্ত বাহুবল প্রয়োগ করে হর্ষবর্ধনের খুলির ওপর। হর্ষবর্ধন লাফাবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না, লাফাবেন কী করে? পায়ের জোরে মানুষ লাফায় বটে- কিন্তু লাফাতে হলে পা ও মাথা একসঙ্গে তুলতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর শ্রীচরণ স্বাধীন থাকলে কি হবে, মাথা যে নিতান্তই বে-হাত! মাথা বাদ দিয়ে লাফানো যায় না। হর্ষবর্ধন আর্তনাদ করেন—'এ কী হচ্ছে? এ কী হচ্ছে? এ কী রকম তোমাদের ড্রেস হেয়ার? এ তো ভাল নয়!'

খোট্টারা যেমন প্রবল পরাক্রমে বর্তন মলে, গোবর্ধন দেখে, সেই তালে দাদার ড্রেস হেয়ার চলছে। সে বিরক্তি প্রকাশ করে—'এ কি বেওয়ারিশ মাথা পেয়েছ যে চটকে-মটকে দিচ্ছ?'

নাপিত এসব কথায় কান দেয় না, তার কাজ করে যায়। সে কখনও রগ টিপে ধরে, কখনও মাথায় থাবড়া মারে, কখনও সমস্ত চুল মুঠিয়ে ধরে গোড়া ধরে টানে, কখনও দুধার থেকে টিপে মাথাটিকে চ্যাপটা করার চেষ্টা করে, কখনও ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দেয়—তার দেহের সমস্ত শক্তি এখন করতলগত। হর্ষবর্ধনের বাধা দেবার ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসে, তিনি নির্জীব হয়ে পড়েন। তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়—'গোবরা, তোর বৌদিকে বলিস আমি সজ্ঞানে কলকাতা-লাভ করেছি!' এর বেশি আর তিনি বলতে পারেন না। কিন্তু

গোবরা বুঝতে পারে দাদার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, দাদাকে সজ্ঞানে আসাম-লাভ করাতে হলে এই মুহূর্তেই এখান থেকে সটকান দিতে হবে। সে যেন ক্ষেপে যায়—'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি আমার দাদাকে ; নইলে ভাল হবে না!'

নাপিত হতভম্ব হয়ে হস্তক্ষেপ থামায়।

'এমনিভাবে মাথাটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ, এর মানে কী ?'

'চুলের গোড়া শক্ত হয় এতে।'

'চুলই রইল না তো চুলের গোড়া! টেনে টেনে তো অর্ধেক চুল ওপড়ালে, মাথায় চুল কোথায় ?'

'এ রকম করলে মাথা ছেড়ে যায়।'

'মাথা ছেড়ে যায় ?' গোবরা যেমন অবাক হয়, তেমনি চটে। 'ছেড়ে যায় ? ছেড়ে গেলে তুমি জোড়া দিতে পারবে ?'

নাপিত কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। গোবরা কণ্ঠে আরো জোর দেয়—'যে মাথা তুমি দিতে পার না সে মাথা নেবার তোমার কী অধিকার ?'

হর্ষবর্ধন ঘেরাটোপের ভেতর দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে ক্লিপটা হাতাবার চেষ্টা করেন—'গোবরা সহজে না ছাড়ে যদি তাহলে দে এই যন্তরটা ওর ঘাড়ে বসিয়ে! মজাটা টের পাক।···মাথা ছাড়িয়ে দেবেন—ভারি আবদার।'

গোবরা বলে—'না, দরকার নেই ঝগড়াঝাটির। এই নাও তোমার মজুরি দশ টাকা। দেশে চুল ছাঁটতে দশ পয়সা—কলকাতায় না-হয় দশ টাকাই হবে, এর বেশি তো নয় ? দাদা, আর দেরি করো না, উঠে এস! চল পালাই।'

দুই ভাই নাপিতকে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ দেয় না, চক্ষের পলকে সেলুন পরিত্যাগ করে।

বাইরে এসে হর্ষবর্ধন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। হতাশভাবে মাথায় হাত বুলোন—'সত্যিই তো, টাক ফেলে দিয়েছে দেখছি! যাক, খুব রক্ষা পাওয়া গেছে! আর-একটু হলে মাথাটাই ফেলে আসতে হত!'

গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে—'এরা পেছনের চুল দেয় দাড়ি কামানো করে আর সামনের চুল দেয় ছিঁড়ে—একেই কি বলে চুল ছাঁটা ? আজব শহরের অদ্ভুত হালচাল! অ্যাঁ, এত লোক জমছে কেন চারদিকে ?'

দুই ভাইকে কেন্দ্র করে ক্রমশই জনতা ভারি হতে থাকে। হর্ষবর্ধন ফিস-ফিস করে বলেন—'দুজনের দুরকম চুল দেখে অবাক হচ্ছে বোধহয় ?'

'উঁহু,' গোবরা অনুচ্চকণ্ঠে জানায়, 'তোমার বোরখাটা খুলে ফেলনি এতক্ষণও ?'

পালাবার মুখে ঘেরাটোপ ফেলে আসার অবকাশ সামান্যই ছিল, কিন্তু সেটাকে তখন

পর্যন্ত গায়ে জড়িয়েই রেখেছেন হর্ষবর্ধন। এতক্ষণে খেয়াল হল। সত্যিই, লোকে যা বলে মিথ্যে নয়, অদ্ভুত কলকাতার হালচাল! ঘেরাটোপ খুলে ফেলতেই জনতা আপনা থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কোন উচ্চবাচ্য করল না।

চাদরটা গুটিয়ে বগলে চেপে হর্ষবর্ধন বলেন—'এই দ্যাখ্!' তাঁর হাতে সেই ভয়াবহ ক্লিপটা। আমি ইচ্ছে করে আনি নি, পালাবার সময় আমার হাতে ছিল। কী করব? ফেরত দিয়ে আসি?'

'আর যায় ওখানে?' গোবরা ভয় দেখায়। 'আবার যদি শুরু করে?'

'তবে থাক এটা। দেশে গিয়ে দীনু নাপিতকে দেখাব। এবার যে ব্যাটা আমার চুল ছাঁটতে আসবে দেব এটা তার ঘাড়ে বসিয়ে—তা কলকাতার নাপিতই কি আর আসামের নাপিতই কি!'

'বেশ করেছ এটা নিয়ে এসে! কলকাতার বহুৎ লোক তোমাকে আশীর্বাদ করবে! অনেকের ঘাড় বাঁচিয়ে দিলে!'

হর্ষবর্ধন মাথা নাড়েন—'যা বলেছিস তুই! একখানা মানুষ-মারা কল!' ক্লিপ দিয়ে একবার পিঠ চুলকে নেন তিনি। 'যাক, ঘামাচি মারা যাবে এটা দিয়ে।'

'বৌদি কাক তাড়াবে এটা দিয়ে। কাকের উৎপাত থেকে বাঁচা যায় তাহলে। মানুষ এ দেখলে ভয় খায় আর কাক খাবে না? কী বল দাদা?'

'তখন থেকে ঘাড়টা কী জ্বালা করছে! মাথাটাও টাটিয়ে উঠেছে! চুল নিয়ে কি কম টানাটানি করেছে? ইসকুলের সেই যে কি ইসপোট হয় জানিস? তাই।'

'হুঁ, ওয়ার অব্ টাগ।'

হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে বিশদ করেন—'ওয়ার মানে যুদ্ধ—বালিশের ওয়াড়ও হয়,—সে আলাদা ওয়াড়—'

গোবর্ধন বাধা দেয়—'কেন, আলাদা হবে কেন? আমরা ছোটবেলায় বালিশ নিয়ে যুদ্ধ করি নি? কত বালিশের তুলো বের করে দিয়েছি!'

'দূর মুখ্যু, বালিশের ওয়াড় বুঝি ওকে বলে? বালিশের জামাকে বলে বালিশের ওয়াড়, তাও জানিস না? "ওয়ার অব্ টাগ"—"অব্" মানে হল "র" আর "টাগ" মানে কী?'

'কী জানি! টাক-ফাক হবে।'

'তাই হবে বোধহয়। ওয়ারের চোটে প্রায় টাক পড়ে গেল আমার! হ্যাঁ, কথাটা হবে ওয়ার অব্ টাক, বুঝলি? লোকের মুখে-মুখে "টাক" "টাগ" হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

গোবরা মুখখানা গম্ভীর করে—'উঃ, কাল থেকে কী টেকো লোকই দেখছি রাস্তার! কালকাতার লোকের এত টাক কেন হয় এখন বোঝা গেল।'

'কেন ?'

'এইসব দোকানে চুল ছাঁটার জন্যে। দুবার ছাঁটলেই টাক—একদম চাঁদি পরিষ্কার! চুল ছাঁটালেই চুল ধরে টানতে দিতে হবে—এই হল কলকাতার নিয়ম।'

'বলিস কী! ভাগ্যিস গোঁফ ছাঁটি নি! তাহলে কী সর্বনাশই না হত!' হর্ষবর্ধন সভয়ে গোঁফ চুমরান। গোঁফ তাঁর ভারি আদরের এবং এই হচ্ছে তাঁর একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি যার ভাগ ইচ্ছা থাকলেও তাঁর ভাইকে দেবার তাঁর উপায় ছিল না।

নবম ধাক্কা

আনন্দবাজারের আনন্দ-সংবাদ!

যতদূর সম্ভব এবং নাপিতের সাধ্য নিশ্চুল তো হয়েছেন, অতঃপর কী করা যায় এই কথাই হর্ষবর্ধন ভাবছিলেন। দ্রষ্টব্য দেখতেই তিনি বাড়ি থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন, অবশেষে এখানে এসে চাপ্‌তব্য জিনিসেরও সাক্ষাৎ পেলেন—মোটর গাড়ি থেকে মায় কলার খোসা পর্যন্ত চাপতে কিছুই আর বাকি থাকল না—এমনকি যা তাঁর দুঃস্বপ্নেরও দূরগোচর ছিল সেই ভয়াবহ ছাঁট্‌তব্য কাজও তিনি এইমাত্র সমাধা করে এসেছেন। অতঃপর আর কী করা যায়?

গোবর্ধনের কাছে তিনি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন কিন্তু তার চিন্তাধারা যে অন্য পথে খেলছিল তা প্রকাশ পেতেও দেরি হল না। সে বলল—'কেন? চাপ্‌তব্য তো কতই এখনও বাকি রয়ে গেল। টেরাম আর গোরুর গাড়ি তো এখনো চাপিই নি। রিক্‌শো না কি বলে—ওই যে মানুষ-টানা দু-চাকার—ওর রসও তো এখনও টের পেলুম না। তেতালা মোটরের কথা ছেড়েই দাও। ইস্টিশনে সেই যে ট্যাক্সি না টাশ্‌কি কি বলছিল তাও চাপা হয় নি। দাদা, এস, ঐরকম একটা পুঁচকে মোটর ভাড়া করে ঘোরা যাক কতক্ষণ।'

'থাম থাম! তোর কেবল মোটর আর মোটর!' হর্ষবর্ধন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন—'কেন, কলার খোসায় যে চাপা গেল সেটা কি চাপা নয়? কটা লোক চাপতে পারে?'

'সে তো তুমিই কেবল চেপেছ। আমি তো চাপিনি!'

'কে বারণ করছে চাপতে? একঝুড়ি কলা কিনে ফেললেই হল। কলার খোসা মোটরের চেয়ে জোর যায়—হ্যাঁ! চোখে-কানে দেখতে দেয় না—হুঁ!'

'তা বেশ, কেনো না কেন? ওই তো ওখানে ঝুড়িতে বসে বিক্রি করছে। আমি টাশ্‌কি চেপে কলা খেয়ে খেয়ে খোসা ফেলতে ফেলতে যাই, আর তুমি পেছনে পেছনে খোসায় চেপে চেপে আসতে থাকো। আমি বরাবর জুগিয়ে যেতে পারব, খোসার অভাব হবে না তোমার, তা বলে রাখছি।'

গোবর্ধনের প্ল্যানটা হর্ষবর্ধনের ঠিক মনঃপূত হয় না। তিনি ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে বলেন—'উঁহু!' খানিক পরে পুনরায় নিজের কথায় সায় দেন—'তা হয় না।'

কোন্‌টা হয় না, টাশ্‌কি চাপা কি কলা খাওয়া, গোবর্ধন দাদার মন্তব্য থেকে সেই দুরূহ তত্ত্ব উদ্ধারের প্রয়াস পাচ্ছে, এমন সময় একজন অপরিচিত লোক এসে উভয়কে অভিবাদন করল। 'খবর-কাগজ দেব বাবু?' লোকটা কাগজওয়ালা।

'কাগজে আর কী হবে?' হর্ষবর্ধন চিন্তা করে বলেন, 'চুল-ছাঁটা তো হয়েই গেছে।'

গোবর্ধন বলে—'শালুনে চুল ছাঁটতে গেলে তো কাগজের দরকার হয় না, ওরা কাপড় মুড়ে দেয়।'

'খবর-কাগজ থাকলে কে যেত ঐ হতভাগ্য শালুনে? ওর চেয়ে কাগজে মাথা গলিয়ে উবু হয়ে বসে ঘরোয়া নাপিতের কাছে ছাঁটানো ঢের ভাল। হ্যাঁ, ঢের ভাল।' এই বলে হর্ষবর্ধন হকারের দিকে ঝোঁক দেন—'তা বাপু, একটু যদি আগে আসতে—নেওয়া যেত তোমার একখানা কাগজ। গোবরা ছাঁটবি নাকি, নেব কাগজ?'

'এসেছে যখন আশা করে—কেন একখান।'

কাগজওয়ালা সেদিনের একখানা বাঙলা কাগজ হর্ষবর্ধনের হাতে দেয়। মুহূর্তমধ্যে তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায়।

'এ কী কাগজ? এত ছোট কেন? এ তো আমাদের পুরোনো হিতবাদী নয়! না বাপু, আমাকে প্রকাণ্ড বড় একখানা দাও—হিতবাদীই দাও কিংবা হিতবাদীর মত। আজকের হোক, পুরোনো হোক তাতে ক্ষতি নেই। টুকরো-টাকরা এতগুলি আমার কী কাজে লাগবে? মাথা গললেও গা ঢাকা তো পড়বে না এতে।'

'পেতে বসা যাবে অন্তত।' গোবরা আর-একটা সম্ভাবনীয় সদ্ব্যবহারের দিকে দাদার অন্তর্দৃষ্টি আকৃষ্ট করে—'যদি টেবিলগুলোয় ছারপোকা থাকে?'

'হ্যাঁ, তবে দাও তোমার কাগজ।' হর্ষবর্ধন ঠন্‌ করে একটা টাকা ফেলে দেন।

'কোন্ কোন্ কাগজ দেব বাবু?' হকার সপ্রশ্ন হয়।

'যা যা আছে দাও না কেন তোমার? এক টাকার মধ্যে কিন্তু—ওর বেশি এখন কিনতে পারব না।' লোকটার বিস্ময়বিমূঢ়তা কাটিয়ে ওঠবার আগেই আবার তাকে কাবু করে দেন—'কি কাগজ দিচ্ছিলে তুমি—তাই না-হয় দাও এক টাকার। ঘর তো একখান নয়, টেবিল চেয়ারও অনেক।'

গোবর্ধন যোগ করে—'আর যদি থেকে থাকে তাহলে ছারপোকাও অঢেল হবে।'

হকার তার বগলের সমস্ত কাগজ গুনতে থাকে, হর্ষবর্ধন তার থেকে একখানা টেনে নিয়ে ভাইয়ের হাতে দেন—'কী কাগজ পড়ে দ্যাখ্ তো গোবরা! হিতবাদী যে নয় তা আমি না-পড়েই বলতে পারি। তবে হ্যাঁ, হিতবাদীর বাচ্চা হতে পারে।'

'হ্যাঁ, বাচ্চা হাতি বাচ্চা হিতবাদীর মতই দেখতে দাদা।' গোবর্ধন নামটা পড়বার চেষ্টা করে—'বলছে, আনন্দবাজার পত্রিকা।'

'ঠিক হয়েছে। কলকাতার হাট-বাজারের সব খবর আছে এতে। সবাই তো কলকাতায় আমাদের মত বেড়াতে আর টাকা ওড়াতে আসে না, হাট-বাজার, কেনা-কাটা করতেই অনেকের আসা হয়। তাদের সুবিধের জন্যেই এই কাগজ—বুঝতে পেরেছিস গোবরা ?'

'যাতে লোকে, মানে যারা পাড়াগেঁয়ে, অনর্থক না ঠকে যায়—বেশ আনন্দের সঙ্গে বাজার করতে পারে। অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছি আমি।'

'হ্যাঁ, তা বুঝবিই তো। বলে দিলুম কিনা!' হর্ষবর্ধন গোবরার ওপর-চালে ঠিক আপ্যায়িত হতে পারেন না—'এইজন্যেই তোকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না!'

এই বলে তিনি ভাইয়ের প্রতি আর দৃকপাত না করে হকারের বিষয়ে নিজেকে ব্যাপৃত করেন—'হ্যাঁ হে বাপু, তোমার কাছে জগুবাবুর বাজার বলে কোন কাগজ আছে ? নেই ? কাছে না থাক একটু পরে এনে দিতে পারবে তো ? পুরোনো হলেও চলবে, পুরোনো খবরও পড়া যায়—খবর থাকলেই হল, খবর পড়া নিয়ে কথা। আজকের খবর আজকেই পড়তে হবে তার কোন মানে নেই। ঐ আমাদের বাড়ি, ওখানে গিয়ে দিয়ে এলেই হবে; অ্যাঁ ? কি বলছ ? ও-নামে কোন কাগজই নেই ? একদম নেই ? উঁহু—অসম্ভব! এ কখনও হতে পারে ? জগুবাবুর বাজার যখন আছে তখন কাগজও নিশ্চয় আছে ওখানকার—না, জগুবাবুর বাজারই নেই তুমি বলতে চাও ? বাজার আছে ? বাজার আছে তো কাগজ নেই কেন হে! আশ্চর্য! থাকলে ভাল হত। সেই কর্মচারীটা জগুবাবুর বাজারের কাছে কাল নাইস হোটেলের কথা বলেছিল, তার সমস্ত খবর জানা যেত তাহলে।'

হকারটা ঘাড় নেড়ে জবাব দিচ্ছিল, এতক্ষণে কথা বলার ফুরসুৎ পেল—সাড়ে দশ আনার কেবল হল বাবু! আর সাড়ে পাঁচ আনার আনন্দবাজার আমি একটু পরেই দিয়ে যাব আপনার ওই বাসায়—দিয়ে যাব ঠিক, 'ঘাবড়াবেন না।'

হর্ষবর্ধন কাগজের তাড়াটা গোবরার কাঁধে চাপিয়ে দেন, দিয়ে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে বিনা বাক্যব্যয়ে অবলীলায় বাড়ির অভিমুখে রওনা হন। তখনকার মত ভাইয়ের প্রতি তাঁর আর চিত্ত নেই। তাঁর মনের মধ্যে গজগজ হতে থাকে—'আমি বললাম বলে তাই জানল, আর'বলে কিনা জানি, অনেক আগেই জানতাম! কী ভয়ানক মিথ্যেবাদী দেখেছ! ইস, এমন জানোয়ার নিয়ে মানুষ কলকাতায় আসে!'

তাড়া-স্কন্ধে গোবর্ধন দাদার অনুসরণ করে—সেও কোন কথা বলে না। কোন্‌খানে যে তার দোষ হল যে-অপরাধে দাদা চটে গেলেন, তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে অনেক আন্দোলিত করেও সে তার কাছাকাছি পৌছতে পারে না। তার অন্তঃকরণেও ফোঁস-ফোঁসানি শুরু

হয়—'তা যাবে তো যাও না বাপু কলার খোসা চেপে ! আমি কি বারণ করেছি, না বাধা দিচ্ছি ? মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, আর তোমার দৌড় ঐ ধড়াম্‌তলা ! ঐখানে পৌঁছেছ কি অমনি আর-একটি ধড়াম্‌ ! ব্যাস ! ধড় এবার আস্ত থাকলে হয় ! ধড় তো নয়, যেন ভূধর !'

বাড়ির ভেতরে গিয়েও রফার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কেউ কারু সঙ্গে কথা বলে না, নিঃশব্দে যত টেবিল চেয়ারের ওপর কাগজ পেতে চলে। সমস্ত ঘর নিঃশেষ করে বসবার কামরায় এসে দেখে ডেন্টিস্টের সম্পর্কিত দাড়ি-প্রিয় সেই ছেলেটি চেয়ারের একখানা কাগজ অপসারিত করে একমনে কি পড়ছে।

দাঁত তুলবার জন্যে বোধহয় ডাকতে এসেছে—গোবরার এইরকম আশঙ্কা হয়, সে ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে তাকিয়ে থাকে। হর্ষবর্ধন স্মিতমুখে ওকে অভ্যর্থনা করেন—'কী কদ্দূর এগুলো দাড়ি ?'

ছেলেটি অপ্রতিভের মত একটু হাসে—'আজকের কাগজটা একবার দেখতে এলাম। গোরা বলছিল—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না—কে একজন পৃথ্বীশ রায় নাকি অমনি-অমনি উড়োজাহাজে করে ইটালি বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। তা সত্যিই ঘটে !'

'উড়োজাহাজ করে ! অ্যাঁ—তাই বললে না তুমি ?' হর্ষবর্ধন অবাক হয়ে যান—'জাহাজ আজকাল উড়ছে নাকি ?'

গোবরা বলে—'আমি তো জানতাম কেবল ডুবে যায়। কথায় বলে জাহাজডুবি !'

'তুই থাম্‌ ! তুই তো সব জানতিস !' গোবর্ধনকে ধমক দিয়ে হর্ষবর্ধন ছেলেটির অভিমতের অপেক্ষা করেন—'খবর-কাগজে লিখেছে ? ছাপার অক্ষরে ? কই দেখি ! যখন ছেপে দিয়েছে তখন সত্যিই হবে।'

তিনজনেই একসঙ্গে কাগজের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং তিনজোড়া বিস্মিত দৃষ্টি একত্র হয়। হ্যাঁ, সত্যিই বটে ! স্পষ্ট অক্ষরেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যে আটাশ বছর থেকে আটাশি বছরের মধ্যে যাদের বয়স এমন দু-জন দুঃসাহসিক সহযাত্রী চেয়েছেন পৃথ্বীশ রায়। তাঁদের তিনি ইটালি নিয়ে যাবেন, আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন—ইত্যাদি, এইরকম অনেক কিছুই লেখা রয়েছে সেই কাগজে।

'প্রায় মাসখানেক থেকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, গোরা অনেক আগেই আমায় বলেছিল। কিন্তু আমাকে কি নিয়ে যাবে।' ছেলেটি হর্ষবর্ধনের সম্মতির আশঙ্কা করে—'আমাকে কি আটাশ বছরের মত দেখতে ? ঠিক বলুন তো ? ভালো করে তাকিয়ে বলুন।'

হর্ষবর্ধন দারুণ ঘাড় নাড়েন—'মোটেই না। একদম না। বরং আট বছরের মত অনেকটা। আমাদের আসামের অনেক আট বছরের ছেলে তোমার মত দেখতে হয়।'

'সেইজন্যেই তো মাসখানেক থেকে, মানে যেদিন গোরার কাছে শুনেছি সেদিন থেকেই

দাড়ি কামাতে লেগেছি। কিন্তু কই, এতদিনেও দাড়ি বেরুল না তো?' হতাশভাবে বারদুয়েক সে গালে হাত বুলোয়—'দাড়ি বেরুলেও না-হয় আটাশ বলে নিজেকে চালাতে পারতাম। কিংবা যদি আগে থেকে আসামে জন্মাতাম তাহলেও হতে পারত বরং। আপনি বললেন না যে আট বছরের ছেলেও সেখানে প্রায় ডবল হয় দেখতে—'

গোবর্ধন বলে—'নিশ্চয়! আবার আট বছরেই অনেকের দাড়ি বেরিয়ে গেছে।'

আসামী-বালকের সৌভাগ্যে ছেলেটি ঈর্ষান্বিত হয়—'তাহলে এমনিতেই তো আমি আটাশ বছরের দেখতে হতুম! আর দাড়িও হত সেইসঙ্গে! ইটালি যাবার তবে বাধা ছিল কী!'

হর্ষবর্ধন বলেন—'কিছু না।'

'মাসখানেকের জন্যে আসামে চেঞ্জে গেলেও তো হয়? হয় না?'

'হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে খুব কষে আসামী দুধ ঘি খেলেও তোমার চেহারা ডবল হয়ে যাবে এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। তবে দাড়ির কথাটা—'

গোবর্ধন দাদার বাক্য সমাপ্ত করে দেয়—'দাড়ি গজায় জলবায়ুর গুণে। চীন দেশে যে একেবারেই হয় না, তার কি করছি বল? এ তো মিথ্যে কথা নয়, নিজের চোখে দেখলাম কাল সকালে।'

'আচ্ছা, আমি যদি আসামে গিয়ে দাড়িতে জলপটি লাগিয়ে রাখি আর দিনরাত পাখার বাতাস করি তাহলেও কি এক মাসে আমার দাড়ি হবে না?' সে গোবর্ধনকে জিজ্ঞাসা করে এবার।

'হবে না? আলবৎ হবে! হতে হবে দাড়িকে—জল হাওয়ার গুণ তবে কী?' গোবর্ধন সজোরে জবাব দেয়।

'তবে তাই যাই, বাবাকে জিজ্ঞাসা করি গে। আসামে যেতে হলে বাবার পারমিশন নিতে হবে। আপনাদের সঙ্গে যদি যেতে দেয় তো হয়।' ছেলেটি চলে যায়।

'ইটালি কোথায় দাদা?' গোবর্ধন ভয়ে ভয়ে দাদাকে প্রশ্ন করে।

'কোথায় আবার! বিলেতে।' হর্ষবর্ধনের বিরক্তি তখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

'বিলেত আর ইটালি কি এক জায়গা নাকি?'

'নিশ্চয়! খাপরার ইংরিজি যেমন টালি, বিলেতের ইংরিজি তেমনি ইটালি।'

'এইবার বুঝেছি।' গোবর্ধন মাথা নাড়ে—'নেপালির ইংরেজি যেমন ভুটানি।'

হর্ষবর্ধন কিঞ্চিৎ প্রীত হন—'কিন্তু সে কথা তো নয়, আমি ভাবছি কি—'

গোবর্ধন দুর্ভাবিত দাদার দুশ্চিন্তার অংশ নেবার ব্যগ্রতা ব্যক্ত করে—'বল না দাদা কী ভাবছ তুমি?'

'ভাবছি যে আমাদের বয়স কিন্তু আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে।'

গোবর্ধন তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে—তার বুদ্ধির সমস্ত দরজা-জানলা যেন একযোগে অকস্মাৎ খুলে যায়—'হ্যাঁ! ভারি চমৎকার হয় দাদা! এইজন্যই তো তোমাকে দাদা বলি!' তারপর একটু দম নেয়—'উড়োজাহাজেও চড়া হয়—জাহাজেই চাপি নি তো উড়োজাহাজ!'

'তুই আছিস কেবল চাপবার তালে! আমাকে কত দিক ভাবতে হয়! ছেলেমানুষ সঙ্গে নিয়ে বিদেশে এসেছি, তার ওপরে বিদেশ থেকে আরো বিদেশে—। আটাশ হলে কি হয়, তুই ওই ছোঁড়াটার চেয়েও অপোগণ্ড। উড়োজাহাজ উলটে গিয়ে যদি আকাশ থেকে ঝপাৎ করে পড়ে যাস তখন কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে তোকে? হাওয়ার চোটে কোন্ দেশে কোথায় যে উড়ে যাবি কে জানে! অত উঁচু আকাশে হাওয়ার জোর কি কম!'

'পড়ব কেন? আমি তোমাকে ধরে থাকব দেখো।'

'হ্যাঁ, তাহলে হয়। আমি ভারি আছি, সহজে আমাকে ওলটাতে পারবে না।'

'তবে আর ইটালি যেতে বাধা কী আমাদের? বয়েস তো আছেই, তাছাড়া দাড়িও রয়েছে—উড়োজাহাজে চাপতে হলে যা যা চাই।'

'আমি তাই ভাবছিলুম। এ-দুদিন কলকাতা তো বহুৎ দেখলাম, এখন বিলেতটা বরং দেখে আসা যাক।' হর্ষবর্ধন মাথা চালেন—'বিলেতের হালচাল আবার কি রকম কে জানে!'

'হ্যাঁ, উড়োজাহাজে চাপতে পারলে মোটরে না চাপলেও চলে যায়, তত দুঃখ হয় না আর। তবে চল দাদা বিজ্ঞাপনের ঠিকানাটা কারু কাছে বাৎলে নিয়ে এক্ষুনি আমরা বেরিয়ে পড়ি। নইলে অন্য সকলে আমাদের আগে গিয়ে ভিড় জমিয়ে ফেলবে। দেশে দাড়িওয়ালার তো অভাব নেই!'

'আচ্ছা আমরা যে ইটালি যাব, সেই কথাই যে আমি ভাবছিলাম তা কি তুই জানতে পেরেছিলি?' হর্ষবর্ধন মুরুব্বির মত একখানা চাল দেন।

'একদম না।' সরল গোবর্ধন সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়।

'আমি কিন্তু জানতে পেরেছিলাম। খবর-কাগজ পড়ে নয়, যেদিন বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছি তখনই জেনেছিলাম যে আমাদের ইটালি যেতে হবে। জানিস?'

গোবর্ধনের সংশয় হয়, প্রায় প্রতিবাদ করে ফেলে আর-কি, কিন্তু উড়োজাহাজে চাপবার লোভে চেপে যায় সে। গোঁফে চাড়া দেন হর্ষবর্ধন—'তোর চেয়ে কত বেশি জানি আমি দ্যাখ্!'

গোবর্ধন মৌন সম্মতি জানায়, তখন দুই ভাইয়ের মধ্যে আবার প্রবল ভাবের সূত্রপাত হয়।

হর্ষবর্ধনের সমুদ্র-লঙ্ঘন

বিখ্যাত বিমানবীর পৃথ্বীশ রায়ের নাম শুনেছ নিশ্চয় । তাঁর খেয়াল হয়েছে, নিজের মনো-প্লেনে ইটালি যাবেন—একেবারে ননস্টপ ফ্লাইট, কলকাতা থেকে ইটালি এবং ইটালি থেকে কলকাতা ।

বাঙালীদের মুখোজ্জ্বল করতে যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু তাঁর নিজের মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল না সকাল থেকে । দুজন সহযাত্রী চেয়ে খবরের কাগজে তিনি ইস্তাহার দিয়েছিলেন, তার পনের ষোল হাজার জবাব এসেছে কিন্তু প্রায় সবই পনের ষোল বছরের ছেলেদের কাছ থেকে ।

তিনি চেয়েছিলেন দুজন সাবালক সহযাত্রী, আটাশ থেকে আটাশি বছরের মধ্যে যাদের বয়স, স্পষ্ট করে সে কথা জানিয়েও দিয়েছিলেন । কিন্তু ঐ বয়সের কোন লোক যে সম্প্রতি বাংলা দেশে আছে, হাজার হাজার আবেদনের অভ্যন্তরে তার কোন প্রমাণ তিনি পাচ্ছেন না ।

তিনি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে প্রাণহানির কোন আশঙ্কা নেই, আর যদিই বা এরোপ্লেন বিকল হয় তখন প্যারাস্যুট আছে । কিন্তু বয়স্ক বাঙালীরা প্রাণরক্ষার প্রলোভনে সহজে পড়তে রাজী নয় স্পষ্টই তা বোঝা যাচ্ছে । অনেক ইস্কুলের মেয়েও যেতে চেয়েছে, আট বছরের ছেলেদের কাছ থেকেও অনুরোধ এসেছে কিন্তু আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে একজনও না ।

পৃথ্বীশ রায় খামের পর খাম খুলছেন আর ঘাড় নাড়ছেন—'হ্যাঁ, এইসব ছেলেমেয়েরা যেদিন বড় হবে সেদিন আমাদের দেশও বড় হবে, কিন্তু ততদিন— ! নাঃ, আটাশ বছর কি আটাশি বছর আর অপেক্ষা করবার মত সময় আমার হাতে নেই । সহযাত্রী বা না-সহযাত্রী, আজই আমাকে যাত্রা করতে হবে ।'

একটি ছেলে লিখেছে—'দেখুন, আমি আপনার সাথী হতে রাজী আছি, কিন্তু একটা শর্তে । আপনাকে এক সময়ে এরোপ্লেন বিকল করতে হবে, যেমন বায়োস্কোপে দেখা যায় তেমন হলেও চলবে ; এরোপ্লেনে আগুন লাগিয়েও দিতে পারেন তাতেও আমার বিশেষ আপত্তি নেই । কেবল আমাকে প্যারাস্যুটে নামবার সুযোগটা দিতে হবে । অজানা দেশে অচেনা লোকেদের মধ্যে হঠাৎ আকাশ থেকে নামতে ভারি মজা কিন্তু— !'

আর একটা চিঠির বক্তব্য—'আমাকে কি আপনি সঙ্গে নেবেন ? আমার একটা মুশকিল আছে । আমার বয়স আটাশ বছর কিন্তু দেখতে ভারি ছোট দেখায় । দেখলে আপনার মনে হবে বারো কি চোদ্দ—এই হয়েছে গণ্ডগোল । এইজন্যে আমাকে ইস্কুলেও খুব নিচু কেলাসে ভর্তি করে দিয়েছে । কিন্তু আমি সত্যি-সত্যি বলছি আমার আটাশ

বছর বয়স—সবে আটাশ পেরোলাম সেদিন। আপনি আমাদের পাড়ার টুনুকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

এই দুটি আবেদন সম্পর্কে গুরুতর বিবেচনা করছেন, এমন সময়ে দুটি ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। পৃথ্বীশ রায় মুখ তুলে চাইলেন—'কে আপনারা ?'

এক নম্বর ভদ্রলোক দু-নম্বরকে দেখিয়ে বললেন—'উনি হচ্ছেন হর্ষবর্ধন। আমার দাদা।'

দু-নম্বর বললেন—'আর ওর নাম গোবরা।'

এক নম্বর সংশোধন করে দিলেন—'উঁহু। গোবর্ধন।'

পৃথ্বীশ রায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হন—'তা, কী চাই আপনাদের ?'

হর্ষবর্ধন বলেন—'আমরাও আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে আসতে চাই।'

গোবর্ধন আবার সংশোধন করে—'উঁহু। উড়ে আসতে।'

'ওঃ, উড়োজাহাজে ইটালি যাবেন ? বেশ তো, বেশ তো। তা আপনাদের বয়েস ?'

হর্ষবর্ধন ভাল করে গোঁফ চুমরে নেন—'আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে।'

গোবর্ধনও প্রয়োজন মত গম্ভীর গলায় সায় দেয়—'হুঁ, তার থেকে এক দিন কম না।'

এর পর আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না ; পৃথ্বীশ রায় বলেন—'তবে দশটার সময় হাজির থাকবেন দমদমে। দমদম এরোড্রাম, বুঝলেন ?'

হর্ষবর্ধন ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করেন—'তা, ভাড়া কত ? খুব বেশি নয় তো ?'

গোবর্ধন বলে—'দশ হাজার পর্যন্ত আমরা উঠতে পারি। বেশি টাকা তো সঙ্গে আনা হয় নি !'

'হ্যাঁ, আসাম থেকে কলকাতায় এসেছি বেড়াতে। বিলেত যাওয়ার মতলব আগে ছিল না তো ! তা, আপনি যখন খবরের কাগজে ছাপিয়েছেন যে তিন দিনে বিলেত ঘুরিয়ে আনবেন—'

গোবর্ধন মধ্যপথে বাধা দেয়—'উড়িয়ে আনবেন।'

'হ্যাঁ, বিলেত উড়িয়ে আনবেন, তখন আমরা ভাবলাম, মন্দ কী ? এই ফাঁকে বিলেত ঘুরে—ওর নাম কি—বিলেত উড়ে আসা যাক !'

পৃথ্বীশ রায় বলেন—'আপনাদের সহযাত্রী পাচ্ছি এই আমার সৌভাগ্য। এক পয়সাও লাগবে না আপনাদের।'

গোবর্ধনের চোখ কপালে ওঠে—'অ্যাঁ, বলে কি দাদা ! বিনে পয়সায় বিলেত !'

হর্ষবর্ধনও কম অবাক হন না—'ওমনি-ওমনি নিয়ে যাবেন ?'

'নিয়ে যাব আবার নিয়ে আসব—একদম মুফৎ। বরং আপনারা দাবি করলে কিছু ধরে দিতে রাজী আছি।'

হর্ষবর্ধনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না—'না, আমরা কিছু চাই না। আমরা তো রোজগার করতে কলকাতায় আসি নি, টাকা ওড়াতেই এসেছি।'

'কিন্তু দেখছ তো দাদা, টাকা ওড়ানো কত শক্ত এখানে!' গোবর্ধন যোগ করে—'আমি তখনই বলেছিলাম তোমায়!'

হর্ষবর্ধন পিছপা হবার পাত্র নন—'তা বেশ, বিনে পয়সায়ই সই, ওমনি যাব বিলেত। তার কী হয়েছে?'

পৃথ্বীশ রায় বলেন—'একটু ভুল করছেন। বিলেত নয়, ইটালি।'

'ওই যাকে বলে ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি। বিলেত আর ইটিলি একই কথা। সমুদ্দুর পেরুলেই বিলেত, তা ইটিলিটি কি আর আন্দামানই কি?'

গোবর্ধন অমায়িকভাবে হাসতে থাকে—'ও আর আমাদের বোঝাতে হবে না।'

পৃথ্বীশ রায় বলতে শুরু করেন—'দেখুন, যদিও উড়োজাহাজে প্রাণহানির কোন ভয় নেই, তবুও—'

হর্ষবর্ধন বাধা দেন—'আমরা জানি। আকাশে আবার ভয় কিসের? এ তো রেলগাড়ি নয় যে কলিশন হবে! আর আকাশে এন্তার ফাঁকা, কোথায় বা ধাক্কা লাগবে বলুন! তুই কি বলিস গোবরা?'

গোবরা জবাব দেয়—'তুমিই বল না, কোন পাখিকে কি কখনো মরতে দেখা গেছে? মানে খাঁচার পাখি নয়, আকাশের পাখিকে? আকাশে যারা ওড়ে তাদের মরণ নেই দাদা! আর উড়োজাহাজ তো বলতে গেলে পাখির মতই। এখুনি পথে আসতে আসতে দেখলে না—ইয়া বড়-বড় দুই পাখা!'

পৃথ্বীশ রায় তথাপি বোঝাতে চেষ্টা করেন—'তা বটে, পাখা থাকলেই পাখি হয় বটে, কিন্তু আরশোলা আর এরোপ্লেন বাদ। কিন্তু আমার কথা তো তা নয়! প্রাণহানির ভয় নেই সে কথা সত্যি, তবু আমি বলছিলাম কি, আপনাদের কি লাইফ ইন্‌শিওর করা আছে? নেই? তা, একটা করে ফেলুন না কেন যাত্রার আগে, বলা যায় না তো! যদি একটা বিপদ-আপদ ঘটে যায়, একটা প্রিমিয়াম দেয়া থাকলে আত্মীয়-পরিবার তখন টাকাটা পাবে।'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'হ্যাঁ, লাইফ ইন্‌শিওর জানি বৈকি! আসামের জঙ্গলেও ওরা গেছে। তা আপনি যখন বলছেন, পঞ্চাশ হাজার কি লাখ খানেকের একটা করে ফেলা যাক। তা আমার নামেই করুন, ওর নামে করে কাজ নেই—ও কখনো মরবে না। আমি মলে টাকাটা যেন গোবরাই পায়। হ্যাঁ, যা বলেছেন, যদিই দৈবাৎ উড়োকল বেগড়ায়, বলা যায় না তো! পড়লেই তো সব চুরমার—হাড়গোড় একদম ছাতু! তখন কি আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে?'

গোবর্ধন। (খাপ্পা হয়ে) লেকিন কেয়া? তুমলোগ খুড়া সম্‌ঝাতা আউর খুরি নেহি সম্‌ঝাতা, এ কোন্ বাথ্ হ্যায়?

হর্ষবর্ধন। সনাতনখুড়োর যেমন কাণ্ড! কলকাতায় খুরি কিনতে পাঠিয়েছে। খুরির জন্যে প্রাণে মারা পড়ি আর কি!

গোবর্ধন। (দারুণ অসন্তোষে) একটা বিয়ে করলেই তো পারে বাপু! খুরির আর দুঃখ থাকে না। তাকে ধরে মাখন কলেও লাগিয়ে রাখতে পারে দিনরাত!

হর্ষবর্ধন। যা বলেছিস গোবরা! একটা কথার মত কথা বলেছিস এতক্ষণে!

গোবর্ধন। হ্যাঁ, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। একটা সনাতন-খুরি হয়! খুরির দুঃখ ঘোচে আমাদের!

হর্ষবর্ধন। কিন্তু কী আশ্চর্য গোবরা! আমি শুধু ভাবছি ব্যাটারা খুরি বোঝে না, আণ্টও বোঝে না—কী তাহলে বোঝে বল তো? এই বিদ্যে নিয়ে বিলেত থেকে ব্যবসা করতে এসেছে এখানে? অবাক কাণ্ড!

গোবর্ধন। কী করে যে এরা দোকান চালায় খোদাই জানেন।

হর্ষবর্ধন। বড় সাহেবটা আসছে আবার। এদিকেই আসছে। দাঁড়া ইংরিজিটা একটু গুছিয়ে নিই এবার—আমি তো ঠিকই বলব—এতক্ষণ বলেওছি ঠিক—কিন্তু ব্যাটাদের পেটে যা বিদ্যে, বুঝলে হয়!

গোবর্ধন। কিন্তু তোমার ইংরিজি বোঝাও একটু শক্ত দাদা! আমারই তাক্ লেগে যায়! বড্ডো শক্ত ইংরিজি তোমার!

হর্ষবর্ধন। হেডমাস্টারের মত অনেকটা—কী বলিস? তা সাহেবরা—সাহেবরাও কি বুঝতে পারে না? ওদের তো বোঝা উচিত?

বড় সাহেব। (ফিরে এসে) হ্যাভ ইউ গট্ ইয়োর থিং?

হর্ষবর্ধন। নো স্যার! ইয়েস স্যার!

বড় সাহেব। ক্যান ইউ এক্সপ্রেস ইট নাউ?

হর্ষবর্ধন। ক্যান ইউ হোয়াট?

বড় সাহেব। এক্সপ্রেস—আই মীন—টেল ইট ক্লিয়ারলি—আই মীন—টেল মি হোয়াট ইট ইজ ইউ ওয়াণ্ট?

হর্ষবর্ধন। ইয়েস স্যার। উই ওয়াণ্ট ইয়োর আণ্ট—

বড় সাহেব। হো—য়া—ট!

গোবর্ধন। ইয়েস, আণ্ট! নাথিং বাট ইয়োর আণ্ট।

গোবর্ধন। ইয়েস স্যার। ইয়োর আণ্ট অব এ বাটার মিল।

গোবর্ধন। উই ওয়াণ্ট ইয়োর আণ্ট অব এ বাটার মিল।

বড় সাহেব। (বজ্রগর্জনে ফেটে পড়লেন) ইউ ওয়াণ্ট মাই আণ্ট ? মাই আণ্ট ! (সাহেবের মুখ থেকে চুরুট পড়ে যায়, দাঁত কড়মড় করে) মাই আণ্ট ? মাই ওন আণ্ট ? মাই ওনলি আণ্ট ? ইজ দ্যাট হোয়াট ইউ ওয়াণ্ট ?

গোবর্ধন। ই—য়েস স্যার—(কম্পিত কণ্ঠে বলে)

বড় সাহেব। (কোট খুলে ফেলে আস্তিন গুটোতে থাকেন) মাই ওন আণ্ট—ইউ ওয়াণ্ট টু বাই হার ?

গোবর্ধন। নো স্যার ! আই—আই ডু নট্—হি—হি ওয়াণ্টস্ ইট—(কাঁপতে থাকে)।

হর্ষবর্ধন। নট মি—স্যার—ইট ইজ আওয়ার সনাতনখুড়ো—আওয়ার ডিস্ট্যাণ্ট ভিলেজ-আঙ্কল—ভেরি ব্যাড হি ইজ—হি ওয়াণ্টস ইট !

বড় সাহেব। ইয়োর আঙ্কল ওয়াণ্টস মাই আণ্ট—ও মাই গড ! মাই ওলড বিলাভেড আণ্ট ! দেন টেক্ ইট !—টেক ইট হিয়ার অ্যাণ্ড নাউ !

(হর্ষবর্ধনের নাকের উপরে প্রচণ্ড এক ঘুসি ঝাড়লেন। হর্ষবর্ধন ঘুসির ঠেলায় গোবর্ধনের ঘাড়ে গিয়ে পড়লেন, সেই ধাক্কাতেই সে কাত—তারপরে দু-জনেই ভূমিসাৎ)

গোবর্ধন। (হর্ষবর্ধনের তলায় চাপা পড়ে) ওরে দাদা রে !

হর্ষবর্ধন। গেছি রে ভায়া—!

বেতন-নিবারক বিছানা

* *

প্রথম দৃশ্য

(মিহিরের মেস, মিহির এবং সুনীল চা পান করিতেছে। সুনীলের হাতে একখানা দৈনিক আনন্দবাজার—চা পান করিবার ফাঁকে সুনীল পড়িতেছে। সকাল বেলা।)

মিহির। দূর ছাই ! কিচ্ছু ভাল লাগছে না ! কবে থেকে বি.এ. পাশ করে বসে আছি। অথচ চাকরির কোন পাত্তা নেই—

সুনীল। কেন, আপাতত এই টুইশনিটা কর না কেন ? ভাল টুইশনি বলেই তো বোধ হচ্ছে। আজকের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—পড়ছি শোন্ঃ

কর্মখালি

কোন বনেদি গৃহস্থের একমাত্র পুত্রের বি.এ. পাশ গৃহশিক্ষক আবশ্যক—আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা। আবেদন করুন।

নাটক

বাজার করার হাজার ঠ্যালা

* *

একটি সাজানো-গোছানো দোকানের মধ্যে এই নাটিকার সমস্ত ঘটনাটা ঘটেছে। হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন দুই ভাই। ক্রমশ আসবে বাঙালীবাবু, সাহেব বিক্রেতা, বেয়ারা, মেম বিক্রয়িত্রী, বড় সাহেব।

হর্ষবর্ধন। হ্যাঁ দোকান বটে একখান! দেখছিস গোবরা?

গোবর্ধন। দেখছি দাদা! সাহেবদের কাণ্ডই আলাদা! দোকান করেছে, না একটা ইন্দ্রপুরী বানিয়ে রেখেছে! তাকিয়ে গ্যাখো না। দেখছ তো? তা হবে না কেন? সাহেব বলেছে কেন? মোসাহেব বললেও তো পারত।

হর্ষবর্ধন। সনাতনখুড়ো বলেছিল সাহেবি দোকানে পাওয়া যায় জিনিসটা। কিন্তু এ যা দোকান—যা পেল্লায় কাণ্ড একখানা—এর কোন্‌খানে যে ঢুঁ মারব—

গোবর্ধন। চারধারেই তো ঢুঁ-ঢুঁ!

হর্ষবর্ধন। খুড়োর আর কী, বলেই খালাস। এখন আমরা সারা দোকান তালাস করি, হাতড়ে মরি চারধারে!

গোবর্ধন। কাকেই বা জিজ্ঞেস করি—কেই বা জানে!

হর্ষবর্ধন। আর জানলেও কি বলবে? জানতে যাবেই বা কে? আমার তো ভাই সাহস হচ্ছে না!

গোবর্ধন। এই মেমটাকে জিজ্ঞেস কর না কেন? ও তো দোকানদারদেরই একজন, জিনিস বেচছে বলেই বোধ হচ্ছে আমার।

হর্ষবর্ধন। দূর! ও কি বলতে পারে? মেম যে!

গোবর্ধন। বাঃ পারবে না? কেন, মেম কি মেয়েমানুষ নয়? মেয়েমানুষই তো! আর, মেয়েদের অজানা কী আছে?

হর্ষবর্ধন। তা বটে, তা বটে, তা বটে। তুই জিজ্ঞেস কর।

গোবর্ধন। তুমিই কর দাদা।

হর্ষবর্ধন। কী ভীতু রে! (ফিস-ফিস করেন) যা রে গোবরা। ভয় কিসের?

গোবর্ধন। উঁহু!

হর্ষবর্ধন। ভয় কি রে? আমি তো আছি—এই কাছেই রয়েছি। ভয় নেই, কামড়ে দেবে না।

গোবর্ধন। উহু। মেম যে—

হর্ষবর্ধন। কী কাপুরুষ! এইজন্যে তোকে আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। তোর ঐ ভীতুপনার জন্যেই! সাহেবি দোকানে নিয়ে আসাই তোকে ভুল হয়েছে! মেম দেখেই তোর চক্ষুস্থির—সাহেব দেখলে তো ভিরমিই খাবি দেখছি!

গোবর্ধন। ঐ যে বাঙালী বাবুটি এধারে আসছে, ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক না!

বাঙালী বাবু। (এগিয়ে আসেন) কী চাই আপনাদের?

হর্ষবর্ধন। আমাদের? আমার? না—আমার কিছু চাই না। আমাদের গাঁয়ের সনাতন-খুড়ো—তারই একটা জিনিস চাই, তার জন্যেই কিনতে আসা।

বাঙালী বাবু। কী জিনিস বলুন।

হর্ষবর্ধন। আপনাদের এই সাহেবি দোকান থেকে অনেক দিন আগে একটা মাখন তোলার কল তিনি কিনে নিয়ে গেছলেন। আমাদের সনাতনখুড়ো। সেই কলের, মশাই, একটি খুরি গেছে হারিয়ে। সেই কলেই লাগানো থাকত সেই খুরি—সেই খুরিটাই চাই।

বাঙালী বাবু। মাখন কলের খুরি? খুরিটা কী রকমের বুঝিয়ে দিন তো!

হর্ষবর্ধন। আমি কি আর দেখতে গেছি? হারিয়ে গেল, তার আর দেখলাম কখন?

গোবর্ধন। কী রকম আর! এই, খুরি যেমন হয়! যেমন হয়ে থাকে খুরির

(একজন সাহেব সেল্‌স্‌ম্যান এগিয়ে আসেন)

সাহেব সেল্‌স্‌ম্যান। হোয়াট বাবু?

হর্ষবর্ধন। ইয়েস স্যার, ইয়েস—উই ওয়াণ্ট—উই ওয়াণ্ট এ খুরি—

সাহেব সেল্‌স্‌ম্যান। খুরি—হোয়াট?

হর্ষবর্ধন। ইয়েস স্যার, খুরি! এ খুরি, স্যার।

সাহেব সেল্‌স্‌ম্যান। খোরি। দি স্পেল?

হর্ষবর্ধন। হোয়াট স্যার?

বাঙালী বাবু। বানান করতে বলছে।

হর্ষবর্ধন। উঁ? বানান? খুরি—খ-য়ে হ্রস্ব-উ—

গোবর্ধন। উহুঁ হুঁ! ইংরেজি বানান। বাংলা কি বুঝবে সাহেব?

হর্ষবর্ধন। ও! ইংরেজি? বুঝেছি। খুরি—কে-এচ্-ইউ-আর আই।

গোবর্ধন। আই—তুমি ঠিক জান? ওয়াই-ও তো হতে পারে?

হর্ষবর্ধন। পাগল! 'ওয়াই' হয় কখনো? বি-এল-এ ব্লে, বি-এল-ই ব্লি, বি-এল-আই ব্লাই। তারপরে বি-এল-ও ব্লো, তারপর বি-এল-ইউ ব্লিউ, বি-এল-ওয়াই ব্লোয়াই।

পৃথ্বীশ রায় জিজ্ঞাসা করেন—'ও, উনি আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন না তাহলে ?'

'নিশ্চয়ই যাচ্ছে ! যাচ্ছে না কে বললে ? ওকে ছেড়ে আমি যমের বাড়ি যেতেও রাজী নই।' হর্ষবর্ধন জোরালো গলায় জবাব দেন—'বিলেত তো বিলেত !'

পৃথ্বীশ রায়ের উড়োজাহাজ ইটালির এরোড্রামে পৌঁছতেই সেখানকার প্রবাসী বাঙালীরা ভিড় করে এল। অভিবাদন ও অভিনন্দনের পালা শেষ হলে হর্ষবর্ধন সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন—'দেখছিস গোবরা, বাংলা ভাষাটা কি রকম ছড়িয়ে পড়েছে আজকাল !'

'হুঁ দাদা, নইলে বিলিতি সাহেবদের মুখে বাংলা বুলি !'

পৃথ্বীশ রায় বুঝিয়ে দেন যে সমাগত ভদ্রলোকদের সাহেবি পোশাক হলেও আসলে তাঁরা বাঙালী, ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা পড়াশোনার ব্যাপারেই এঁদের বিদেশ বাস ; বাঙালী বলেই বাঙালীকে সংবর্ধনা করতে এঁরা সবাই এসেছেন। তখন দুই ভাই দস্তুরমত অবাক হয়ে যায়। 'বটে ? বুঝেছি তাহলে, কাঠের কারবার নিয়েই এদের এখানে থাকা !' হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়তে থাকেন।

'তা আর বলতে !' গোবর্ধন যোগদান করে—'কাঠের জন্য আসামের জঙ্গলে গিয়ে মানুষ বাস করে, তা বিলেতে আসবে এ আর বেশি কী !'

পৃথ্বীশ রায় জানান যে সন্ধ্যার মুখেই ওঁরা দেশমুখো হবেন ; এঞ্জিনের অবস্থা ভাল নয়, এইজন্য সমস্ত দিন ওঁর কল মেরামত করতেই যাবে।

হর্ষবর্ধন বলেন—'তাহলে এই ফাঁকে এই বিলিতি শহরটা দেখে নেওয়া যাক না কেন ?'

গোবর্ধন সায় দেয়—'হুঁ, যখন পুরো একটা দিন পাওয়া যাচ্ছে !'

মুকুল বলে একটি বছর পনের যোলর ছেলে এগিয়ে আসে—'আসুন, এখানে যা যা দেখবার আছে আপনাদের সব দেখাব আমি।'

হর্ষবর্ধন অবাক হন—'অ্যাঁ, এইটুকু ছেলে তুমিও কাঠের কারবারে লেগেছ ? এই বয়সেই ?'

মুকুল বলে—'না, আমার বাবা ডাক্তার।'

গোবর্ধন ব্যাখ্যা করে—'তার মানে, তিনি তোমাকে ব্যবসাতে সাহায্য করেন। মরলেই তো কাঠের খরচ !'

হর্ষবর্ধন পুলকিত হয়ে ওঠেন—'বাপ ডাক্তার, ছেলের কাঠের কারবার ; এর চেয়ে লাভের কী আছে ? ব্যবসার দুটো দিকই একচেটে—ডবল লাভ ! আমার ছেলেকে আমি ডাক্তারি পড়াব। আর নাতিকে দেব আমাদের কারবারে, বুঝলি গোবরা ?'

পৃথ্বীশ রায় মনে করিয়ে দেন—'আপনারা সন্ধ্যার আগেই ফিরবেন কিন্তু।'

'সে আর বলে দিতে হবে না। আপনি আমাদের ফেলে চলে গেলেই তো হয়েছে! এখান থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরা আমাদের কম্ম নয়!'

গোবর্ধন মিনতি জানায়—'দোহাই, তা যেন যাবেন না! দেখছেন তো, দাদা যা মোটা, একটু হাঁটলেই ওঁর হাঁপ ধরে। আমি হাঁটতে পারলেও দাদা পারবে না।'

হর্ষবর্ধনের আত্মসম্মানে ঘা লাগে—'হুঁ! দাদা পারবে না! নিশ্চয় পারবে, আলবৎ পারবে, দাদার ঘাড় পারবে! হেঁটে দেখিয়ে দেব?' গোঁফে তা' দিতে দিতে সদর্পে তিনি অগ্রসর হন।

'আসুন আপনারা আমার মোটরে।' হর্ষবর্ধনের অভিযানে মুকুল বাধা দেয়—'ঐ যে আমার বেবি কার ঐখানে, আমি নিজেই ড্রাইভ করি।'

কিন্তু হর্ষবর্ধন থামেন না, তাঁর অগ্রগতি ততক্ষণে শুরু হয়েছে। গোবর্ধন সভয়ে দাদার বিরাট পদক্ষেপ দেখতে থাকে, তার আশঙ্কা হয়, হয়ত একেবারে আসাম না গিয়ে দাদা নিরস্ত হচ্ছেন না। কিন্তু সন্দেহ অমূলক, হর্ষবর্ধন সটান গিয়ে মোটরে পৌঁছে গ্যাঁট হয়ে বসেন।

তখন আশ্বস্ত হৃদয়ে গোবর্ধনও দাদার অনুসরণ করে। কিন্তু হর্ষবর্ধন ভায়ের দিকে দৃকপাত করেন না, তিনি ভয়ানক চটে গেছেন। তিনি নাকি ভয়ানক মোটা, হাঁটতে গেলে তাঁর হাঁপ ধরে যায়—দেশে হলেও ক্ষতি ছিল না কিন্তু বিলেতে এসে তাঁকে এমনধারা অপমান, সব বাঙালী সাহেবদের সামনে, ছি! ছি! তিনি জোরে জোরে গোঁফে তা' দিতে থাকেন।

মুকুল ওঁদের মিউজিয়মে নিয়ে যায়, সেখান থেকে চিত্রশালায়। 'এই যে সব চমৎকার চমৎকার ছবি দেখছেন, এসব হচ্ছে মাইকেল এঞ্জেলোর। পৃথিবীর একজন নামজাদা বড় আর্টিস্ট।'

'অ্যাঁ, বল কি? আমাদের মাইকেল? বিলেতে ছবি আঁকত সে? বটে?' হর্ষবর্ধনের বিস্ময় ধরে না।

'মাইকেল এঞ্জেলোকে আপনারা জানলেন কী করে?'

'মাইকেলকে জানি না! তুমি অবাক করলে! তুমি তাঁর মেঘনাদবধ পড় নি?'

মুকুল ঘাড় নাড়ে—'না তো! আমি জন্ম থেকেই এখানে কিনা; দেশে তো যাই নি কখনো!'

'বল্ না গোবরা, বল্ না সেইটে মুখস্থ—সম্মুখ সমরে পড়ি চূড়বীরামণি, বহু বীর—বহু বীর—হুঁ, মনে পড়েছে, বীর বহু চলি যবে গেলা যমপুরে—তার পরে—তার পরে?'

গোবর্ধনও সহজে দমবার নয়—'হুরুরে হুরুরে হুরুরে করি গর্জিল ইংরাজ, নবাবের সৈন্যগণ ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ—'

হর্ষবর্ধন বিরক্ত হয়ে বাধা দেন—'উঁহু, উঁহু ! ও যে মিলে গেল ! মাইকেলের মেলে না। তোর কিচ্ছু মনে থাকে না, তুই একটা অপদার্থ ! একেবারে রাবিশ ! আবার আমাকে বলিস হাঁটতে পারে না !'

এতক্ষণে প্রতিশোধ নিতে পেরে হর্ষবর্ধন একটু খুশি হন, মুকুলকে সম্বোধন করেন—'তুমি মাইকেল পড় নি তো ? পড়ে দেখো, অনেক বই আছে মাইকেলের।'

গোবর্ধন বলে—'পড়লে বোঝা যায় বটে, কিন্তু পড়াই শক্ত। দাঁতভাঙা ব্যাপার !'

হর্ষবর্ধন খাপ্পা হয়ে ওঠেন—'পড়লে বোঝা যায় ? তুই তো সব জানিস মাইকেলের ! বল্ দেখি "হস্তী নিনাদিল"—এর মানে কী ?'

বার-বার অপমানে গোবর্ধনও গরম হয়—'তুমি বল দেখি ?'

'আমি ? আমি জানি না ? আমি না জেনেই তোকে জিজ্ঞেস করছি বুঝি ?' হর্ষবর্ধন গোঁফ পাকানো ছেড়ে আমতা আমতা করেন—'এমন কী শক্ত মানেটা শুনি ? "হস্তী নিনাদিল ?" এ তো জলের মত সোজা। "নিনাদিল"র "নি" শব্দ বাদ দিলেই টের পাবি। কিংবা "হস্তিনী নাদিল" তাও করা যায়।' গোবর্ধন তাঁর পাণ্ডিত্যে কাবু হয়ে পড়েছে দেখে পুনরায় তিনি গোঁফে হস্তক্ষেপ করেন—'হুঁঃ, এই তো তোর বিদ্যে ! তবু "হ্রেষাধ্বনি" এখনো জিজ্ঞাসাই করি নি !'

গোবর্ধন এবার ভীত হয়, "হ্রেষাধ্বনি" চাপা দেবার জন্য বলে—'মাইকেলের ছবিগুলো কিন্তু বেশ, না দাদা ?'

'বেশ না ছাই, এর চেয়ে ওর পদ্য ভাল ঢের !'

মুকুল ওদের আরও অনেক কিছু দেখায়, মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া মূর্তি, মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য, মাইকেল এঞ্জেলোর ফ্রেস্‌কো, এবং আরও কত কী কারুকার্য ! মাইকেল এই বিদেশে এসে এত কাণ্ড করে গেছে ভেবে দু-ভাই কম অবাক হয় না ! বলতে গেলে গোটা ইটালিটাই গড়ে-পিটে গেছে মাইকেল !

হর্ষবর্ধন মাইকেল-গর্বে গর্বিত হয়ে ওঠেন—'মাইকেলের বাড়ি কোথায় ছিল জানিস গোবরা ?'

'যশোরে কি খুলনায় যেন।'

'উঁহুঃ, আসামে। আমাদের আসামে। আসামী ছাড়া কেউ অত খাটতে পারে ? কী রকম প্রাণ দিয়ে খেটেছে !'

'হ্যাঁ, ঠিক যেন ফাঁসির আসামী !' গোবর্ধন আর দাদার প্রতিবাদ করে না। 'ফাঁসির আসামীর মত প্রাণ দিয়ে খাটতে পারে কেউ ?'

মুকুল ওদের বিখ্যাত রোমান ফোরাম দেখায় ; হর্ষবর্ধন প্রশ্ন করেন—'এও আমাদের মাইকেলের তো ?'

'না, তাঁর জন্মাবার হাজার বছরেরও আগের তৈরি।'

'ওঃ!' হর্ষবর্ধন কিঞ্চিৎ হতাশ হন।

অতি প্রাচীন কালের একটা প্রস্তর-স্তম্ভের কাছে এসে হর্ষবর্ধন আবার প্রশ্ন করেন—'মাইকেলের ?'

'এ তাঁর জন্মাবার দু' হাজার বছর আগেকার!'

হর্ষবর্ধন দমে যান, মুকুল তাঁকে একটা বিরাট প্রস্তর-মূর্তি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে—'ওটা কার মূর্তি জানেন ?'

হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ চোখে তাকান—'মাইকেলের বোধহয় ?'

'উঁহু। ভাস্কো ডা গামা; নাম শোনেন নি ?'

'গামা, গামা—নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে যেন। খুব কুস্তি করে বেড়াত লোকটা না ?'

'ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল এ কথা ইতিহাসে লেখা আছে, কিন্তু কুস্তি-টুস্তির কথা তো পড়িনি!'

'ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল! তুমি অবাক করলে বাপু! এই মাত্র আমরা তো ভারতবর্ষ থেকেই আসছি, কিন্তু কই এরকম কথা তো শুনিনি। অতবড় দেশটা আবিষ্কার করল আর আমরা তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলাম না!'

গোবর্ধন বলে—'তুমি ভুল পড়েছ, ভারতবর্ষ নয়, কুস্তি অবিষ্কার করেছিল গামা। আমি ভাল রকম জানি।'

'কি গামা বললে ? ভাস্কো ডা গামা ? বেশ নামটা। তা লোকটা কি মারা গেছে ?'

'অনেক দিন! চারশো বচ্ছরেরও আগে!'

'চারশো বচ্ছর! বল কি! তা কিসে মারা গেল ?'

'তা কি জানি!' মুকুল মাথা নাড়ে।

'বসন্ত বোধহয় ? হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন।

'বইয়ে তো পড়িনি, জানি না।' মুকুল আরও জোরে মাথা নাড়তে থাকে।

গোবর্ধন বলে—'হামও হতে পারে!'

'হতে পারে—তাও হতে পারে—বেঁচে নেই যখন, কোন কিছুতে মারা গেছে নিশ্চয়।' মাথা নাড়তে নাড়তে মুকুলের ঘাড়ে ব্যথা হয়।

'বাপ মা আছে ?'

'অসম্—ভব!' প্রশ্ন শুনে মুকুল আকাশ থেকে পড়ে। 'ছেলে-পুলেই বেঁচে নেই তো বাপ মা।'

অবশেষে ওরা পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তুর সম্মুখীন হয়—মিশরের কোন এক রাজার মামি। মুকুল উৎসাহে লাফাতে থাকে, 'দেখেছেন ?—মামি! মামি!'

হর্ষবর্ধন কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে লক্ষ্য করেন—'কী বললে ? কী নাম ভদ্রলোকের ?'

'নাম ? ওর কোন নাম নেই—জিপসিয়ান মামি !'

'মাইকেলের মত কোন নামজাদা লোক বোধহয় ? তা এই বিলেতেই কি এর জন্ম ?'

'না,—জিপসিয়ান মামি।'

'আমাদের বাংলা দেশের—মানে, আমাদের আসামের তবে ?'

'না না, বলছি তো, জিপসিয়ান !' মুকুল এবার ক্ষেপে যায়।

'ও, তাই বল ! এতক্ষণে বুঝেছি। ইংরেজ !'

'না, ইংরেজ নয়, ফরাসী নয়, জার্মান নয়, ইটালির লোকও নয়, এমন কি বাঙালীও নয়—ইজিপ্টায় এর জন্ম।'

'ইজিপ্টায় জন্ম ! ইজিপ্টা বলে কোন দেশের নাম তো কখনো শুনিনি !' হর্ষবর্ধন সন্দেহভরে মাথা নাড়েন।

'ইজিপ্টায়, না, ইজিচেয়ারে ? তুমি ঠিক জান ?' গোবর্ধন প্রশ্ন করে।

'ইজিপ্টা কোন বিদেশ-টিদেশ হবে। গোবরা, তলায় কী লেখা রয়েছে পড়ে গ্যাখ তো !'

'এফ্-আর্-ও-এম্—ফ্রম, ই, জি, ওয়াই, পি, টি। ফ্রম—ফ্রম মানে "হইতে" আর ই-জি-ওয়াই-পি-টি ?'

'এগ্ওয়াইপ্ট। এগ্ওয়াইপ্ট হইতে। এগ্ মানে ডিম। অর্থাৎ যেখান থেকে আমাদের দেশে ডিম চালান যায় সেখানকার এই লোকটা। বোধহয় কোন ডিমের আড়ৎদার-টাড়ৎদার।'

'মামি—মামি !' গোবর্ধন প্রশ্ন করে—'তা এর মামা কোথায় ?'

মুকুলের ঘাড় টন্-টন্ করছিল, সে হাত নেড়ে জানায় যে ওর জানা নেই।

'দেখেছিস গোবরা, কি রকম মজা করে শুয়ে আছে লোকটা—কেমন শান্তশিষ্ট মুখের ভাব !'

গোবর্ধন মুকুলের মুখে তাকায়—'এ কি—অ্যাঁ—এ কি মারা গেছে ?

'নিশ্চয়। তিন হাজার বছর !'

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন—অ্যাঁ, বল কি ? তিন হাজার বছর ধরে এমনি মরে রয়েছে ?'

গোবর্ধনের বিশ্বাস হয় না—'তিন হাজার বছর। হতেই পারে না। তিন দিনে মানুষ পচে ওঠে, আর এ কিনা তিন হাজার—'

হর্ষবর্ধনের মুখ এবার অত্যন্ত গম্ভীর হয়—'শোন ছোকরা, তুমি কী বলতে চাও বল দেখি ? বাংলা দেশ থেকে এসেছি বলে কি আমাদের বাঙাল পেয়েছ ? যা খুশি তাই বুঝিয়ে দিচ্ছ ? ছেলেমানুষ বলে এতক্ষণ তোমাকে কিছু বলিনি ; তা বিলেতের ছেলে বলে

কি তোমাকে ভয় করে চলতে হবে? অত ভীতু নই আমরা! তোমার চেয়ে আমাদের বাংলা দেশের ছেলেরা ঢের ঢের ভাল!'

গোবর্ধন দাদার সঙ্গে যোগ দেয়—'হ্যাঁ, স্পষ্ট কথা! আমরা ভয় খাই না! নিশ্চয়ই ভাল, হাজার হাজার গুণ ভাল! অত বোকা পাওনি আমাদের, যে যা খুশি তাই বুঝিয়ে দেবে! তিন হাজার বছরের বাসি মড়া চালাতে চাও আমাদের কাছে? টাটকা মড়া থাকে তো নিয়ে এস—টাটকা চমৎকার খাসা একখানা লাশ! আমাদের আপত্তি নেই।'

তিনজনকে বাক্যহীন গুরুগম্ভীর মুখে ফিরতে দেখে পৃথ্বীশ রায় বিস্মিত হন। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের আগেই হর্ষবর্ধনের বিচলিত কণ্ঠ শোনা যায়—'মশাই, চলুন! আর নয়, এ দেশে আর এক মুহূর্ত না! এই আপনার বিলেত? দূর দূর! সারা শহরটায় দেখবার মত কিচ্ছু নেই! এর চেয়ে আমাদের কলকাতা ঢের ঢের ভাল! হ্যাঁ, ঢের ঢের ভাল!'

শিব্রাম THE ভূপর্যটক

* *

আমার ছোটবেলার ডায়েরিটা সেদিন খুঁজে পেয়েছি হঠাৎ। ডায়েরিটা আমি খুঁজতে যাইনি, আমার ভাগ্নে গোপালের চিঠিটা কোথায় রেখেছি তাই খুঁজছিলাম, কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন সাপ বেরোয় ডায়েরিটা তেমনি করে বেরিয়ে পড়ল।

পাতা দশ-বারোর একটা ফোঁড়-সেলাই খাতা। পেন্সিলের লেখা। আমার ছোট-বেলার মাতুলালয়ের ডায়েরি। মামার বাড়ির গপ্পো। [ভাগ্নের চিঠি খুঁজতে গিয়ে বেরুলো আমার ভাগ্নেরূপের—নিজের ভগ্নদশার কাহিনী।]

আমার ভূপর্যটনের ইতিকথাও বলা যায়। মামাদের ব্যাভারে তেতবিরক্ত হয়ে ধুত্তোর বলে একদিন আমি পৃথিবী-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলাম—ডায়েরিটা ঠিক তার ইতিহাস নয়। ইতিকথাই বলতে হয়। কি করে সেই ভ্রমণের ইতি হল তারই বৃত্তান্ত।

কেন বেরিয়েছিলাম পৃথিবী-ভ্রমণে, সেই শুরুর কথাও বলতে হয় তাহলে···

কর্ণের বিপদ পদে পদে, দিদিমার মুখে মহাভারত শুনে জানতে আমার বাকী ছিল না। আর মামারা কেমন ধারা যে, শকুনি আর কালনেমির কাহিনী থেকে তাও আমি জানতাম এবং আমার নিজের বেলাও দেখেছিলাম। স্বকর্ণেই দেখতাম আমি। আমার কর্ণের বিপদ কেবল পদে পদেই নয়, হাতে হাতেও। মামাদেরই হাতে হাতে। বড় মামা, মেজ মামা, সেজ মামা যারই যখন হাতের আয়েস করার সখ হয়, আমার কানের ওপর দিয়ে করে নিতে কসুর করেন না। করে নেন বেশ করে।

কিন্তু এভাবে কি প্রাণধারণ করা যায়? কানধারণ করাও কঠিন হয়। সদাসর্বদা উৎকর্ণ হয়ে থাকা কি সহজ কথা?

আমি প্রাণ দিয়ে পড়তে পারি; কিন্তু কান দিয়ে পড়তে হবে এ কেমন তরো? পড়া ধরার ছুতো করে কান ধরার ছলনা আমার ভালো লাগে না। একদিন নয়, দিনের পর দিন তেমনি ধারা চলতে থাকলে বাধ্য হয়েই একদিন আমাকে নিজের কান নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে···এবং হলও একদিন। সেই দিনের কথাটাই বলি···

কান খাড়া করে পড়ছি,—কখন কার খাঁড়া কানের ওপর এসে পড়ে কে জানে! এমন সময় বড় মামার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল···সঙ্গে সঙ্গে বইখানাকে ভূগোল চাপা দিলাম।

পৃথিবী-ভ্রমণ বইখানার শেষ পরিচ্ছেদ পড়ছিলাম। ভূগোলের আড়ালে সামলাতে হল আমার পৃথিবীটাকে।

'কী পড়ছিস্ রে ?' হাঁকলেন বড় মামা।

'ভূগোল।'

'ভূগোল ? আচ্ছা, বল দেখি গ্রীস জিনিসটা কি ?'

'গ্রীস ? একটা দেশ।'

'আর টাইগ্রিস ?'

'আরেকটা দেশ।'

'না, দেশ নয়—'

'তা হলে মহাদেশ।' আমার চোটপাট জবাব।

'না, মহাদেশ নয়। টাইগ্রিস হচ্ছে একটা নদী। না, এমনিতে তোর মনে থাকবে না, ভালো করে মনে করিয়ে দিই···।'

ওই পর্যন্ত বলে বড় মামা এগিয়ে এসে আমার কান পাকড়ালেন। দু'হাতে দুই কান। তারপরে বলতে লাগলেন আর মলতে লাগলেন—

'গ্রীস একটা দেশ (ডান কান মলা), টাইগ্রিস একটা নদী (বাঁ কান মলা), গ্রীস একটা দেশ (ডান কান), টাইগ্রিস নদী (বাঁ কান), গ্রীস হচ্ছে দেশ (ডান কান তার সঙ্গে জড়িত), আর টাইগ্রিস হচ্ছে নদী (বাঁ কানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত)···।'

এইভাবে কিছুক্ষণ ধরে পর্যায়ক্রমে তাঁর পঠনপাঠন চলতে থাকল—কর্ণমর্দনের সঙ্গে। মলতে মলতে ক্লান্ত হয়ে তিনি ক্ষান্ত হলেন। পরিশ্রান্ত হয়ে চলে গেলেন।

তার পরেই মেজ মামা—একটু বাদেই।

'দেখি তোর টেন্‌স।'

টেন্‌স ? টেন্‌স আবার কিরে বাবা ? কান তো মোটে দুটো আমার। বরং দু'হাতে আর দু'পায়ে দশটা করে—কান বাড়াবো না আঙুল বাড়াবো ভাবি আমি···

'কাল যে এত করে তোকে টেন্‌স বোঝালাম এর মধ্যেই তা ভুলে মেরে দিয়েছিস্ ?'

'ও সেই টেন্‌স ?' এতক্ষণে আমি স্বস্তি পাই।—'ভুলব কেন ? মনে তো রয়েছে। বেশ ভালো করেই মনে আছে আমার। আই অ্যাম ইউ আর হি ইজ··· ।'

'আচ্ছা আচ্ছা। আই রাইট-এর ফিউচার ইনডেফিনিটে কি হবে বল্ তো ?'

'আই শ্যাল রাইটিং।' আমি বলেছি।

মেজ মামা খানিকক্ষণ হতবাক্ থেকে শুধোলেন—'এর মানে ?'

'মানে ? মানে, আমি লিখিয়া থাকিব।'

'মানে আমি তোমায় বোঝাচ্ছি।' এই না বলে মেজ মামা সবল হস্তে আমার ছোট্ট

কানটি পাকড়ালেন।—'মানে এবার বুঝতে পাচ্চ? মানে, আমি তোমার কান মলিয়া থাকিব।'

মানে যে শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াবে তা আমি কানে কানেই জানতাম। সব মানের পরিণতি কর্ণঘটিত অপমানে তা আমার ভালোই জানা ছিল।

তারপরে সেজ মামার আবির্ভাব।

'আচ্ছা শিবু, একটা ট্রানশ্লেসন করো তো—শিবু খুব ভালো ছেলে ছিল।'

বুঝলাম এটা নেহাত নিজেকেই সার্টিফিকেট দেয়া—তাই যথাসম্ভব নম্র সলজ্জভাবে বিনীতকণ্ঠে বললাম—'শিবু হ্যাড এ ভেরি গুড বয়।' বলে ব্রীড়াবনত হয়ে রইলাম।

'কী? শিবু হ্যাড এ ভেরি গুড বয়? তোমার পিণ্ডি। শিবু হ্যাড এ হর্স-এর মানে তবে কি হল?'

'শিবু ঘোড়া ছিল।'

'হ্যাঁ, আগে ঘোড়া ছিল বটে, এখন একেবারে আস্ত গাধা। এত বড় বুড়োধাড়ি ছেলে এখনও ট্রানশ্লেসন করতে শেখেনি? ছ্যা।' বললেন সেজ মামা।—'জানো, তোমার এই এগারো বছর বয়সে কত ছেলে এনট্রেন্স্ পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছে?'

বলে সেজ মামা কতকগুলি ক্ষণজন্মা বালকের দৃষ্টান্ত আমার সম্মুখে স্থাপন করলেন।—আমার কানে কোন হাত না দিয়ে।

তাতে আমি উৎসাহ বোধ করে বললাম—'জানো সেজ মামা, আমিও কতকগুলো উদাহরণ দিতে পারি। আমার ক্লাসেই অনেক ছেলে আছে যারা আমার চেয়ে অনেক বড়ো। তাদের কারো কারো দাড়ি-গোঁফ বেরিয়ে গেছে তোমার মতন।'

'তোমারও সেই দশা হবে। দশ বছর থাকতে হবে এই ফিফথ ক্লাসে। এই অবধিই বিদ্যে হবে তোমার।'

এই বলে সেজ মামা চলে গেলেন—আমার কানে কোন আঘাত না দিয়ে। এই প্রথম তিনি আমার প্রাণে আঘাত দিতে অন্যথা করলেন।

কিন্তু মামা কি আমার একটা। আবার ঘুরে ফিরে বড়মামা।

'দেখি তোর বাংলা অনুবাদের খাতাটা; বাংলা বিদ্যের বহরটা দেখি একবার। **Phula Sing was not dead**—এই চ্যাপটারটা কাল অনুবাদ করতে দিয়েছিলাম না? করা হয়েছে?'

আমি ঘাড় নেড়ে জানাই—'হ্যাঁ।'

এক লাইন পড়েই বড়মামার চোখ কপালে উঠল—'এ কি লিখেছিস্, এঁ্যা? **Phula Sing was not dead**-এর বাংলা ফুলের গান এখনো মরে নাই?'

'হ্যাঁ, তাই লিখেছি। তাই তো হবে।'

'মরে নাই কিন্তু এইবার মরিবে।' বলে বড়মামা যেই না একটা বিরাট চড় তুলেছেন—চড়টা কার উপর দিয়ে যাবে বুঝতে আমার এক মুহূর্ত দেরি হল না। আমার গালকে তাঁর চড়ের বাইরে নিয়ে তিন লাফে তক্ষুনি আমি তাঁর নাগালের বাইরে।

তিনি রাগে খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, উদ্যত ক্রোধ সংবরণ করে খাতাটা কুড়িয়ে আনলেন আবার—

'আরো কী লেখা হয়েছে দেখি!'

কিন্তু তারপরে আর অনুবাদের কিছুই লেখা ছিল না। ফুলের গানের অমরত্ব ঘোষণার পর লেখা ছিল আমার ডায়েরির কয়েক ছত্র: 'পৃথিবী-ভ্রমণ বইখানি পড়িবার জন্য বড়মামার টাস্‌ক আজ রাত্রে করা হইল না। বড়মামা কাল রাগে ফুলে তিনখানা হবে, সে ভারি মজা—তা হোক। আমার খুবই ইচ্ছা যে আমি নিজেই একবার পৃথিবী-ভ্রমণ করিব।'

যেখানে ফেলেছিলেন তার চেয়ে আরো বেশি দূরে এবার খাতাখানি ছুঁড়ে ফেললেন বড়মামা—'পৃথিবী-ভ্রমণ করাচ্ছি। আজ অফিস থেকে আসি। তোমার ডায়েরি লেখা বার করব আমি। মারের চোটে ডায়েরিয়া বানাবো তোমার। আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।'

আর তারপরই, বলতে কি, আমার মনে বৈরাগ্য এসে গেল। দারুণ বৈরাগ্য তা বই-এর উপর রাগ ছাড়া আর কিছু নয়?

এমনিতেই আমার বৈরাগ্য ছিল। পড়ার বই দেখলেই রাগ হত। কিন্তু বড়মামার ঐ কথার পর ধুত্তোর বলে যেদিকে দু'চোখ যায় আমি বেরিয়ে পড়লাম। আর তারপর থেকেই আমার পৃথিবী-ভ্রমণ শুরু।

ডায়েরির গোড়াতেই লেখা:

'কান নিয়ে আমার বাড়ি থেকে পিট্টান মেরেছি। কান বাঁচানো দায় সেখানে। আর কান বাদ দিয়ে প্রাণে বেঁচে থাকার কি কোন মানে হয়? কান গেলে মানুষের কী থাকে আর?'

আর কান দিয়ে পড়াশুনা নয়, আমার চোখ দিয়ে পড়া এখন। যা দু'চোখ দিয়ে দেখব তাই আমি মন দিয়ে পাঠ করব। আর, দেখবার মতন কিছু দেখলে তা আমি ডায়েরির পাতায় টুকে রাখব। তাই আমার খাতাখানাও সঙ্গে নিলাম।

আর সত্যি বলতে, ভ্রমণ-কাহিনী লেখবার জন্যেই তো ভ্রমণ করা। তা নইলে ভ্রমণের কোন মানে হয় না, সে-ভ্রমণ নিতান্ত ভ্রম ব্যতীত কিছু নয়।

কিন্তু শ্যামবাজার থেকে শুরু করে গ্রে স্ট্রীট, হেদো, গোলদীঘি—অনেক দূর পেরিয়ে গেলাম, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা আমার চোখে পড়ল না। সেই ট্রাম যাচ্ছে, বাস যাচ্ছে,

রিকশা যাচ্ছে। সেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার যাতায়াত। চমকপ্রদ কিছুই নেই। ভারি বিরক্ত হ'তে হল আমায়।

আর সব ভ্রমণকারীর বেলায় কেমন চোর ডাকাতরা এসে দেখা দেয়! নৃমুণ্ডশিকারীর দল হানা দিতে আসে, বাঘ-ভালুক হালুম করে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে, আমার বেলায় সেসব কিছুই নেই। আর সব ভূপর্যটকের তুলনায় আমার বরাতটা খুবই খারাপ বলতে হবে। কি করি, দুঃখিত মনে পথ চলছি, পৃথিবী-ভ্রমণে বেরিয়ে তো ফিরে যেতে পারি না। পৃথিবী যদি আমার সঙ্গে এইভাবে ছলনা করে তো করুক, আমার প্রতিজ্ঞা আমি বজায় রেখে যাব।

অবশেষে বৌবাজার বরাবর এসে—আমার ডায়েরির পাতায় দেখা গেল :

'এতক্ষণে একটা ঘটনার মতো ঘটনা ঘটল। নিউটনের সেই বিখ্যাত আপেল পড়ার ঘটনার চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নয়। নিউটন একটি ফলকে গাছ থেকে টুপ্ করে পড়তে দেখেছিলেন, যার ফলে তিনি মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করলেন, আমিও সেই রকম দেখলাম! এবং বলতে পারি যে, তার ফলাফলে আমিও একটা মাধ্যাকর্ষণের মতোই বিরাট আবিষ্কার করতে পেরেছি।

'একটা খুব মোটাসোটা ভুঁড়িওয়ালা লোক রিক্শায় চেপেছিল। কিন্তু যেই না সে পিছনে ঠেস দিতে গেছে, রিক্শাটা অমনি কাত হয়ে উল্টে পড়েছে আর রিক্শাওয়ালাটাও অমনি হাতল ধরে আকাশে উঠে গেছে তৎক্ষণাৎ। যতক্ষণ ধরে লোকটা উল্টে পড়েছিল রিক্শাওয়ালাটাও আকাশে ঝুলছিল—এটাকে আমি শূন্যাকর্ষণ বলতে চাই। এটা আমার নিজের আবিষ্কার করা। এটা গাছ থেকে আপেল পড়ার চেয়ে কোন অংশে ফ্যালনা নয় এবং আপেল খাওয়ার চেয়ে বেশি মজার—দেখতে গেলে।

'চৌরঙ্গীতে এসে একটা চমৎকার কুকুর আমার চোখে পড়ল। কুকুরটা গ্রে হাউণ্ড। একটা সাহেববাড়ির গেটে চেনবাঁধা ছিল সেই কুকুরটা। আমি ওকে একমনে দেখছি, এমন সময়ে একটা বাচ্চা মেম, মেমের বাচ্চাও বলা যেতে পারে; সে এসে তাদের কুকুরের দিকে আমি নজর দিচ্ছি দেখে চটে গেল বেজায়। কুকুরটাকে সে আমার দিকে লেলিয়ে দিল।'

কুকুরটা যে আমায় অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে আসছে না, তা বুঝতে আমার মুহূর্তও দেরি হয়নি—সঙ্গে সঙ্গে আমিও ছুট মেরেছি। কুকুরটা আমাকে অনেক দূর তাড়িয়ে নিয়ে এসে অবশেষে ফিরে গেল। আমি অনেকক্ষণ হাঁপিয়ে জিরিয়ে নিয়ে আমার খাতায় লিখলাম :

'পৃথিবীর এই অংশটায় দৌড়বার আমার একটুও আগ্রহ ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, আমি কেবল পৃথিবী-ভ্রমণ করব—দৌড়িয়ে ভ্রমণ করব এমন প্রতিজ্ঞা

করিনি। কিন্তু কি করি, পাজি কুকুরটা এমন তাড়া করেছিল! না দৌড়লে সে আমায় কামড়ে দিত নির্ঘাত।

'প্রথমে ভেবেছিলাম এও বুঝি বরাবর আমার সঙ্গে পৃথিবী-ভ্রমণ করবে সেই মতলবেই বেরিয়েছে, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। পারবে কেন সে? তার তো আমার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, সামান্য একটা কুকুর মাত্র। তাই সে একটুখানি এসেই ফিরে গেছে। তাছাড়া, ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে পারত না সে। অনর্থক ভ্রমণ করে মরতে যাবে কেন? যাই হোক, কুকুরদের আমি খুব ভালবাসতাম, কিন্তু এখন আর বাসি না। ভারি দুষ্টু ওরা।'

জগুবাবুর বাজারের কাছে এসে দেখলাম একটা বছর ষোলোর পশ্চিমা ছেলে ভুট্টা সেঁকছে। ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে এসেছিল, খিদেও পাচ্ছিল বেশ এবং ভুট্টা সেঁকা দেখে পেটের ভেতরে কেমন যেন ভুটভাট করতে লাগল।

আমি একমনে ভুট্টা সেঁকা দেখতে লাগলাম। অনেকক্ষণ দেখে দেখে জিজ্ঞেস করলাম—দাম কত তোমার ভুট্টার?

ছেলেটা বলল—এক আনা। পয়সা হ্যায়?

আমি বললাম—না। পয়সা কোথায় পাব? আমি তো ভূপর্যটক।

শুনে সে কী ভাবল জানি না—একটা ছোট্ট মতন ভুট্টা সে আমায় অমনি খেতে দিল।

'এমন দিয়েই থাকে। ভূপর্যটকরা এমন ধারা, এমনকি, এর চেয়েও ঢের বেশি আতিথ্য-লাভ করে থাকে আমি জানি। কেউ কি হাঁড়িকুঁড়ি সঙ্গে নিয়ে পৃথিবী-ভ্রমণে বেরোয় নাকি? কোন ভূপর্যটককে কি কখনো রেঁধে-বেড়ে খেতে হয়? অতিথিবৎসল লোকেরা পৃথিবীর দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, ভূপর্যটক দেখতে পেলেই তারা ধরে-বেঁধে খাইয়ে দেয়। আমি এখন প্রায় তেমন একটিকে দেখলাম। এর পরে আরও দেখতে পাব। আরও এমনি অনেক সদাশয় সাধু লোককে দেখতে হবে আমায়।'

ভুট্টাটা নিয়ে একটা বাড়ির রোয়াকের ওপর আমি চিবুতে বসেছি। আপন মনে চিবুচ্ছি, এমন সময়ে আচমকা এক প্রশ্নবাণ!

চমকে উঠে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে নিকুঞ্জকাকু। বাজার সেরে ফিরছিলেন, আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছেন।

—কি রে, এখানে বসে কি করছিস্। এই জগুবাবুর বাজারে?

আমি আর কী জবাব দেব? চুপ করে রইলাম।

—তোর হাতে ওটা কিসের খাতা রে? দেখি তো।

ডায়েরিখানা আমার হাত থেকে নিয়ে পড়তে লাগলেন—'আমার পৃথিবী-ভ্রমণ। শ্রীমান শিবরামচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত—এর মানে?'

কাকার কথার কী জবাব দেব? পৃথিবী-ভ্রমণ হচ্ছে, পৃথিবী-ভ্রমণ। তার কি কোন মানে আছে? ঘুরে ঘুরে কি কোন কিছুর মানে বার করা যায় নাকি আবার?

—'এধারে 'শ্রীমান' ওধারে 'চন্দ্র'—বাহারের যে একেবারে ছড়াছড়ি! আয় আমার সঙ্গে। এখানে বসে বসে আর প্রণীত করতে হবে না। আর পৃথিবী-ভ্রমণে কাজ নেই তোর, আয়।'

সুড়সুড় করে কাকার পিছু পিছু গেলাম। যেতে হল বাধ্য হয়ে। কাকীমার রান্না খেয়ে বাঁচলাম তারপর।

দেখা গেল, আমার ডায়েরির শেষ পাতায় এই কথাগুলি লেখা :

'পৃথিবী-ভ্রমণে অনেক বাধা—কুকুর, খিদে এবং কাকা। যাহোক, বাহির হয়ে শ্যামবাজার থেকে জগুবাবুর বাজার, অনেকখানি পৃথিবী আজ ভ্রমণ করা গেল। বাকীটা পরে সুবিধামতো সারা যাবে একদিন।'

গোঁফ নিয়ে টানাটানি

* *

আমাদের লক্ষ্মণকে বাঙালীর দুর্লক্ষণ বলাই নাকি উচিত, কর্পোরেশনের বড় মেজ সেজ কর্তাদের মতে। কিন্তু, 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।' কর্পোরেশনের সামান্য বেয়ারা হলে কি হবে, নিজের শক্তিতেই লক্ষ্মণ নিজের সেই জয়ধ্বজা বহন করে…তার নিজস্ব সেই গোঁফ!

গোঁফ তো আধুনিকের চিহ্ন নয় তবু লক্ষ্মণ কেন এমন গোঁফ রাখে। একথা অনেকে ভেবেছে, বেশির ভাগ তার সহযোগী বেয়ারাদের মধ্যেই, তবে সেদিন সেই কথাটা এক ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

বাবুটি টানা বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন, সাপের মতো কি যেন একটা দেখে হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন।—'এই, এদিকে এসো। দেখি তো মুখখানা একবার। একি! এ কী দেখছি?'

'আজ্ঞে, কী দেখছেন?' নিরীহ স্বরে জিজ্ঞেস করেছে লক্ষ্মণ।

'গোঁফ! গোঁফ দেখি যে?'

লক্ষ্মণ লজ্জায় গুম্ফাবনত হয়ে রইল, কিছু বলল না। একবার মনে হল যে বলে, আজ্ঞে,
ঠিকই দেখছেন, কোন ভুল নেই, কিন্তু কথাটা বলা বাহুল্য বলে তার বোধ হতে লাগল!

'শোনো! বেয়ারার চাকরি নিয়ে এমন গোঁফ রাখা উচিত নয়। কাল যেন ফের
তোমাকে—মানে তোমার এই গোঁফকে আর না দেখতে হয়। সগুম্ফ না দেখতে পাই
তোমায়—মনে রেখো।'

যে গোঁফ আজকাল বাবুদের মুখেই বেমানান, বেয়ারার মধ্যে তার ঔদ্ধত্য একটু বেয়াড়া দৃশ্যই বই কি। নিছক আস্পর্ধা বলেই বাবুটির জ্ঞান হতে থাকে।

কিন্তু পর দিবসেই আবার সেই গোঁফ দেখা গেল।—'একি! আজো দেখছি তেমনি আছে—যথাস্থানে! কাল কী বললাম তোমায়?' গোঁফান্বিত লক্ষ্মণকে দেখে বাবুটি এবার রীতিমত কোপান্বিত।

লক্ষ্মণ কি জবাব দেবে? সযত্ন বর্ধিত এই গোঁফটিকে মানুষ করে তুলতে, মানুষের মতো করতে তার কত দিন, কত হপ্তা, কত মাস লেগেছে, এই কথা সে কি করে জানাবে—সে ভাষা কি তার ভাঁড়ারে আছে?

'তোমায় বল্লাম না ওটা লোপাট করে আসবে?…তুমি কোন্ ডিপার্টমেণ্টের বেয়ারা?'

লক্ষ্মণ তার ডিপার্টমেণ্ট জানালো।

'আচ্ছা, আমি দেখছি। এর কোন প্রতিকার হয় কি না দেখছি।'

বাবুটি সেই ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবুর কাছে গেলেন। 'দেখেছেন মশাই, আপনার বেয়ারার হিটলারী ছাঁটের গোঁফ দেখেছেন? আমি তো বারো বছর ধরে কর্পোরেশনের কাউন্সিলারি করছি, কত মেয়র, ডেপুটি মেয়রই দেখলাম, কিন্তু এরূপ বেয়াড়াপনা আর দেখিনি।'

না, বড়বাবুও দেখেননি! কাজকর্মের ঠেলায় অবসরের এতোই অভাব যে, সর্বদা সব দ্রষ্টব্য জিনিস তাঁর দেখা হয়ে ওঠে না। 'আচ্ছা দেখব! দেখব বই কি।' তিনি আশ্বাস দিলেন কাউন্সিলারটিকে।—'আপনি যখন বলছেন তখন আর দেখব না?'

'হ্যাঁ, দেখবেন। ভালো করে দেখবেন। দেখলে চমৎকৃত হবেন একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।'

বাবুটি চলে গেলে বড়বাবু বেয়ারাকে হাঁক দিলেন। 'কই দেখি গোঁফ'—একথা আর তাঁকে বলতে হল না, বেয়ারার সাথে সাথে আপনা থেকেই সেই গোঁফ এসে দেখা দিল।

বড়বাবু একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন—সহসা তাঁর কথা সরল না। জেগে তিনি দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন—সামনে—এবং স্বচক্ষে। কিছু না বলে গুম হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ—ঝড়ের আগে ঠিক যেরকম গুমোট দেখা যায়। তারপর তিনি ফেটে পড়লেন—ঝঞ্ঝাবাতে।

'কে তোমাকে গোঁফ রাখতে বলেছে?'

'আজ্ঞে, কেউ বলেনি।' লক্ষ্মণ আমতা আমতা করে।

'তবে? তবে রেখেছ কেন?'

একথার কি উত্তর আছে! যাকে রাখো সেই রাখে, একথা নিশ্চয় এই কথার উত্তর নয়। অথচ, লক্ষ্মণের বিবেচনায় চুপ করে থাকাই ভালো। 'সব্ সে চুপ্ ভালা।' 'বোবার কোন শত্রু নাই।'—এই সব বড় বড় কথা স্মরণ করে মৌনতায় সে সদুত্তর দিল।

'আজই ওকে বিদায় করে দেবে। ছুটির পর নাপিত ডাকিয়ে—বুঝেছ?' এই বলে বড়বাবু তাঁর সুমুখ থেকে এই অসহ্যতা বিদায় করে দিলেন।

গোঁফ নিয়ে তো ভারী মুশকিল বাধলো—সমস্যায় পড়ে গেল লক্ষ্মণ। এই গোঁফের জন্য নিজেকে সে গরীয়ান মনে করত। আর সব বেয়ারাদের থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র, শ্রেষ্ঠ এবং ঐ গোঁফধন্য জ্ঞান করত। এই গোঁফ নিয়ে আজ একি টানাটানি। প্রাণ দেওয়া সহজ কিন্তু গোঁফ দেওয়া কি এতোই সহজ? একটু চোখ বুজলেই সরকারি বাসের তলায় নিজেকে ফেলা যায়—কিন্তু সজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে নাপিতের ক্ষুরের তলায় প্রাণের চেয়ে প্রিয় নিজের এই গোঁফকে বিসর্জন দেয়া—নাঃ এ তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

অতএব তার পরদিনও তাকে গোঁফ নিয়ে হাজির দেখা গেল।

বড়বাবু চেয়ারে বসে প্রথমেই ডাক দিলেন বেয়ারাকে।

আজকের সর্বপ্রথম কাজ তাঁর মনে পড়ল বসতে না বসতেই। লক্ষ্মণ এল তার গোঁফ মুখে করে—লক্ষ্মণ এবং গোঁফ—দুজনের কেউই গরহাজির নয়—তিনি দেখলেন।

দেখলেন, কিন্তু কিছু বললেন না—'তোমার নামে আমি ওপরে রিপোর্ট করব।' শুধু এই কথা বললেন। আর বললেন—'ওই গোঁফ নিয়ে তুমি কদাচ আমার সামনে আসবে না। আমার ত্রিসীমানায় তুমি থেক না—এক্ষুনি দূর হও।'

লক্ষ্মণ দূরে দূরেই রইলো—গোঁফ বাঁচিয়ে। পরের দিন, বড়বাবুর রিপোর্টের ফলে এক নম্বর ডেপুটি চীফের সামনে তাকে দাঁড়াতে হল গোঁফ সমেত।

তিনি কিছুক্ষণ তাক করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—'তোমার নাকের তলায় জঙ্গলের মতো ওটা কি? কিসের ঝোপ?'

'আজ্ঞে হুজুর, ঝোপ নয়, আমার গোঁফ।' বলল লক্ষ্মণ। কর্তার এহেন কথায় হৃদয়ে আঘাত পেয়েছিল লক্ষ্মণ—তার গোঁফ অবধি বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তার মর্যাদা অক্ষুন্ন নেই, বিশ্বাস টলে গেছে। তবু সে মিনতিভরা মৌন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কর্তার দিকে।

কর্তা কিন্তু আবার আক্রমণ করলেন—'গোঁফ হোক, আর যাই হোক ওকে তাড়াতে হবে। ওতে আমাদের কোন কাজ নেই। তোমাকেই এখানে দরকার—তোমার গোঁফকে নয়।'

এ কেমন কথা? এতোদিনের লালিত পালিত—এমন সযত্ন বর্ধিত আদরের জিনিস—এক কথায় ঘাড় ধরে বিদায় করে দেওয়া? একটা বেড়াল পুষলেও লোকের মায়া হয়; আর এ তো নিজের গোঁফ! লক্ষ্মণ মনে মনে উদ্বেলিত হতে থাকে।

'আগুন লাগিয়ে হোক, কোদাল চালিয়ে হোক, যা করে হোক ওই জঙ্গল সাফ করা চাই। ছাগলে ও জিনিস খাবে কি? তাহলে ছাগলকে দিয়েও মুড়িয়ে নিতে পারো—

মোটের ওপর ওই বদখেয়াল ওখানে রাখা চলবে না—বুঝেছ ? যাও।' কর্তার পরিষ্কার উপদেশ। পরিষ্কার করার হুকুম।

ছাগলের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে গোঁফের নামোল্লেখ লক্ষ্মণের প্রাণে ব্যথা লেগেছিল। ছাগলে কী না খায় ; গোঁফও হয়ত তার অখাদ্য না হতে পারে—কিন্তু কথাটা বলা নেহাত পাগলের মতো বলৎশক্তির পরিচায়ক। তা ছাড়া কী ? গোঁফ ভেদ করে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল লক্ষ্মণের।

পরদিন ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবুকে আবার রিপোর্ট করতে হল ডেপুটী চীফের কাছে। গিয়ে নিজ মুখে তিনি প্রকাশ করলেন, 'আজ্ঞে স্যার—এখনো।'

'এখনো কী ? কী এখনো ?' তাঁর বুঝতে একটু দেরিই হয়।

'সেই গোঁফ ! এখনো হিটলার সেজে বসে আছে। সেই—সেই বাঁদরটা !'

'তা···তা আমি আর কী করতে পারি ! গোঁফ—গোঁফ তো ওপড়ানো যায় না ? দাড়ির মতো তা যায় কি ?'

'হ্যাঁ, স্যার যায়।···যদিও কখনো কাউকে ওপড়াতে দেখিনি, তবুও মনে হয় ওকাজ একেবারে অসাধ্য নয়।'

'না হোক। কিন্তু আমার কর্ম না। আমার কর্তব্যের মধ্যেও নয়। আমি সিনিয়র ডেপুটীর কাছে রিপোর্ট দিচ্ছি—ওপড়াতে হয়, যা করতে হয় তিনিই করবেন। কারো গোঁফে হস্তক্ষেপ করতে আমি ভালোবাসিনে। পরের গোঁফে পোদ্দারি করার আমার উৎসাহ নেই, বয়সও নেই আর।'

এদিকে সেই কাউন্সিলারটিও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবার ছেলে নন। পরের দিন ফের কি কাজে তিনি এসেছিলেন। গোঁফ দেখাটাই তাঁর কাজ হয়ে উঠেছিল কিনা কে জানে ! কিন্তু গোঁফ দেখে তো তিনি আগুন !

'একি !—এখনো—এখনো দেখছি যে ? য়্যা ?' সগোঁফ লক্ষ্মণকে সম্বোধন করে সকোপে তিনি বলেন।

'আজ্ঞে যদি কিছু না মনে করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি,' লক্ষ্মণ খুব কাচুমাচু হয়ে বলল : 'বেচারীর দোষটা কোথায় দেখলেন, বলবেন একবার ? একি কারো কোনো খেতি করেছে ?'

এই প্রশ্নের উত্তর আর ওকে না দিয়ে সটান তিনি চলে গেলেন ডেপুটীর কাছে। সমস্ত শুনে তিনি বললেন, 'শুনে সুখী হবেন ইতিমধ্যেই ওকে আমি আমার সিনিয়র ডেপুটীর দায়রার সোপর্দ করে দিয়েছি। তিনি ভারী কড়া লোক। একবার কোন কাজে হাত দিলে তার হেস্তনেস্ত না করে ছাড়েন না। গোঁফের বেলাও নিশ্চয় তার অন্যথা হবে না—তিনি হস্ত ন্যস্ত করবেন।'

শুনে সুখী এবং নিশ্চিন্ত হয়ে কাউন্সিলার বাবু বাড়ি ফিরলেন।

পরের দিনও গোঁফালো লক্ষ্মণকে দেখা গেল। ওর সহযোগী বেচারারা একদৃষ্টে দেখল তাকিয়ে। এতদিন যারা ওর গোঁফ বা ওকে লক্ষ্য করেনি বা লক্ষ্যবস্তু বলে মনে করেনি তারাও আজ ভালো করে ওকে দেখে নিল। সারা কর্পোরেশনের চোপদার থেকে, কেরানী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের কর্তারা অবধি কারো দেখার বাকী রইল না। এমনকি, সেদিন যারা ভুলক্রমে কর্পোরেশনের ট্যাক্সো জমা দিতে এসেছিল তারাও খবরটা শুনে গুম্ফদর্শনের পুণ্য অর্জন করে ধন্য হয়ে গেল।

নিজেও দেখল লক্ষ্মণ। ফাঁক পেলেই পকেট থেকে ছোট্ট একটা আর্সি বার করে নিজেও সে বারবার দেখছিল আর তার চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। আহা এমন জিনিস আর হয় না! মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে সস্নেহে সে গোঁফের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে।

'না! কক্ষনো না! জীবন থাকতে তোমাকে আমার কাছছাড়া হতে দেব না।' লক্ষ্মণ নিজের গোঁফকে সম্বোধন করে বলল, 'কে তোমাকে আমার সুমুখ থেকে কাড়ে দেখি, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে, তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। যতদিন চন্দ্র-সূর্য থাকবে, ততদিন তুমিও আছ, আমিও আছি।'

এইরূপ ঘোরতর শপথ করে গোঁফের সঙ্গে হরিহরাত্মা লক্ষ্মণ সিনিয়র ডেপুটীর ঘরে এত্তালা দিতে গেল।

তার ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু কর্তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, 'ওই দেখুন! এতবার বলা হয়েছে, এত করে বলা হচ্ছে তবু কিছুতে ছাড়ছে না কামাচ্ছেও না, কমাচ্ছেও না।'

'কমাচ্ছেও না?…কামাচ্ছেও না। ও! বুঝেছি।'

'সমস্ত আদেশ অমান্য করেছে, উপদেশ উপেক্ষা করেছে, কারো কথাতেই কোন কর্ণপাত করছে না। এমন কি স্বয়ং—'

'কেন হে, গোঁফ কামাচ্ছো না কেন?' সিনিয়র ডেপুটী শক্ত হয়ে বলেন, 'বাজারে নাপিত মিলছে না নাকি?'

'হজুর মা-বাপ। অপনি সব করতে পারেন। দয়া করে আমাকে মারবেন না, যদি মারতেই চান তো আমাকে প্রাণে মারুন।' লক্ষ্মণ কাঁদোকাঁদো হয়ে পড়ল, 'এই গোঁফ গেলে আমার আর কী থাকবে বলুন? কী নিয়ে আমি বেঁচে থাকব হজুর?'

চোখের জল দেখে একটু সদয় হয়ে তিনি বললেন, 'রাখতে পারো তোমার গোঁফ।

'কিন্তু ঐ ভাবে রাখা চলবে না। ঐ একটুখানি গোঁফ অসহ্য। রাখতে হলে ভালো করেই রাখো। সারা মুখময় ওদের গজাতে দাও চাপচাপ হয়ে…যেমন ঘাস গজায়। চারপাশে বাড়ুক চাপরাসীদের মতো। কিম্বা শিখরা যেমন রাখে।'

'তাহলে ওর আর থাকবে কী হুজুর? ওকে তো তখন আর আলাদা করে চেনা যাবে না? সে থাকা না থাকা সমান।'

'সে হয় না।...আপনি ওকে বোঝান।' বড়বাবুটির ঘাড়ে বেয়ারাকে ভালো করে বোঝানোর ভার চাপিয়ে ডেপুটী চীফ আসল চীফের ঘরে নিজের কাজ নিয়ে গেলেন।

আবার নতুন করে বোঝাপড়া শুরু হল। বড়বাবু কত করে বলেন, বাপু বাছা করেন—মিনতি করেন, ভয় দেখান; পরিশেষে তার গোঁফজোড়া ভিক্ষা চান—হাত জোড় করতেও রাকী রাখেন না। কিন্তু লক্ষ্মণ অবুঝ। তার অত সাধের গোঁফে কেমন করে সে সাবান লাগাবে। ক্ষুর লাগাবে—কোন প্রাণে কোপ বসাবে, ভাবতেই সে বারংবার শিউরাতে থাকে।

সিনিয়র ডেপুটী ফিরতেই বড়বাবু বললেন—'ও কিছুতেই শুনছে না স্যার, কী করব?'

'শুনবে না আমি জানি। কিছু করতে হবে না। আমি চীফের কাছে রিপোর্ট করে দিয়েছি, যা করবার তিনিই করবেন।' বললেন সিনিয়র ডেপুটী। তাঁর কর্তৃত্ব এখানে নিষ্ফল, তিনি বুঝেছিলেন। লক্ষ্মণ আরেক দিনের জন্য রেহাই পেল। সেদিন সারাক্ষণ সে আয়নার দিকে মুখ করে রইল। মুহুর্মুহু নিজের গোঁফসুধা পান করতে লাগল। রাত্রে স্বপ্ন দেখল শুধু গোঁফের।

গুম্ফবতী রাজকন্যার দেশে গিয়ে স্রেফ নিজের গোঁফে চাড়া দিয়ে তাকে রাজ্যছাড়া করে আনবার সুখস্বপ্ন!...

পরদিন তাকে চীফের কাছে হাজিরা দিতে হল।

চীফ লক্ষ্মণের বিদ্রোহ ঘোষণার কথা শুনেছিলেন—হাতের কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে তীব্র তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাতে একবার তিনি তাকে দেখলেন। আপাদমস্তক তাকালেন চকিতের জন্যই। তারপরে হুকুমের স্বরে বললেন—'গোঁফ উড়িয়ে দেবে।' আর কিছু তিনি বললেন না। যেন এক কথাতেই ঐ কথার নিষ্পত্তি হয়ে গেল। তাঁর হুকুমই চূড়ান্ত, অনেকটা এইরূপ ভাব দেখিয়ে ফের আবার নিজের কাগজপত্রে তিনি মনোযোগ দিলেন।

লক্ষ্মণের বুক কাঁপল কিন্তু গোঁফ কাঁপল না। সে এখন মরিয়া। ফাঁসিকাষ্ঠের সামনে এসে মানুষ যেমন মরিয়া হয়। দুর্গা বলে ঝুলে পড়তে দ্বিধা করে না আর। লক্ষ্মণও এখন তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চাকরি যায় যাক, কিন্তু গোঁফ তার যাবে না। গোঁফ থাকবে।

পরদিনও লক্ষ্মণ তার গোঁফ বজায় রেখেছে, চীফের কানে গেল। তিনি সোজা মেয়রের কাছে রিপোর্ট করে দিলেন।

মেয়র ডেকে পাঠালেন লক্ষ্মণকে।

মেয়রেরও গোঁফ আছে দেখে ভরসা পেয়ে সাহসী লক্ষ্মণ তাঁর পায়ের উপর কেঁদে পড়ল,

'প্রভু ! প্রাণের দায়ে টাকা কামাতে এসেছি, গরীবকে গোঁফ কামাতে আজ্ঞা করবেন না ।—আপনার নিজের গোঁফ আছে, নিজের গোঁফ নিয়ে ঘর করেন আপনি, গোঁফের দরদ বুঝবেন—আপনার কাছে যেমন আপনার গোঁফ—আমার কাছে তেমনি—'

মেয়র বললেন—'গোঁফ কামাতে হবে কে তোমায় বলেছে ? কর্পোরেশনের কোন আইনে একথা নেই তো । ছোটই হোক আর বড়ই হোক, এখানে কোন কর্মচারীর গোঁফ নিষিদ্ধ নয় । তুমি নির্ভয়ে তোমার গোঁফ রাখো । তবে যদি সেই কাউন্সিলারটি এরপর গোঁফের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব আনেন এবং সে প্রস্তাব কর্পোরেশনের সভায় অধিকাংশ সদস্যের ভোটের জোরে পাস হয়ে যায়, তখন—তখন তোমার গোঁফ ছাড়ার কথা কিংবা চাকরি ছাড়ার কথা । এখন কী ?' এই বলে নিজের গোঁফ আরো চুমরে তিনি বললেন—'আর তেমন প্রস্তাব এলেই হল ! এলেই আমিই কি তা উঠতে দেব মনে কর ? প্রথমেই আউট-অফ-অর্ডার করে দেব । কেবল তোমার খাতিরেই নয় ; আমার নিজেরও তো গোঁফ বলে একটা কিছু আছে । তার দিকে তাকিয়েই আমাকে তা করতে হবে । অতএব যাও, গোঁফ নিয়ে নির্ভয়ে কাজ করো গে । গোঁফের আমি গোঁফের তুমি···তোমার কোন ভাবনা নেই ।'

ভারতবর্ষের উত্তরে যেমন পাহাড়ে গোঁফের ঢেউ আর দক্ষিণে উত্তাল ঢেউয়ের গোঁফ তেমনি এই কর্পোরেশনও যদি ঊর্ধ্বে ও নিম্নে গোঁফের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে—থাক্ না, ক্ষতি কি ? মেয়র এই কথাই মনে মনে ভাবলেন বুঝি ।

সর্বোচ্চ আদালতে জয়লাভ এবং অভয়লাভ করে গোঁফ নাচাতে নাচাতে ফিরে এল লক্ষ্মণ । আর গোঁফ নিয়ে টিকে থাকতে কোন বাধা নেই । এতদিনে তার মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন উঠে গিয়ে আরামের লক্ষণ দেখা দিল । একসঙ্গে আরাম লক্ষ্মণকে দেখা গেল একাধারে ।

কিন্তু কী আশ্চর্য, পরদিন লক্ষ্মণকে আর চেনাই যায় না । লক্ষ্মণ এসেছে কিন্তু তার গোঁফ আসেনি ! গোঁফ নেই—নাকের তলা একেবারে চাঁচা-ছোলা এবং তার চেয়েও আশ্চর্য, লক্ষ্মণের আরামের কিছু কমতি নেই ।

আর সব বেয়ারা এসে ছেঁকে ধরল লক্ষ্মণকে, 'আরে, তোর গোঁফ গেল কোথায় রে ? অত সাধের গোঁফ ? বাড়িতে রেখে এসেছিস্ নাকি ? নাকি, কাউকে ধার দিলি আবার ? কী হল গোঁফের ?'

'কী আবার হবে, ফেলে দিলাম । গোঁফ আমাদের মানায় না ।' লক্ষ্মণ গর্বের সঙ্গে জানায় : 'আমাকেও না—অদ্ভুতকুমারকেও না ।'

'অদ্ভুতকুমার ? সে আবার কে রে ?' সবাই আরো অবাক্ ।

'অদ্ভুতকুমার কে !!!' লক্ষ্মণ তাজ্জব বনে যায়, 'অবাক করলি বটে, কেন, সিনেমায়

যাস্ না নাকি ? দেখিসনি অদ্ভুতকুমারকে ? ছবিতে নেমে নেমে ভূত হয়ে গেল অদ্ভুতকুমার ?'

এই বলে তক্ষুনি-তক্ষুনি অদ্ভুতকুমারকে দেখাবার জন্যই যেন নিজের পকেটে হাত দেয়, 'এই ছ্যাখ অদ্ভুতকুমার !'

একটা কাগজের টুকরো—কোন চলতি সাপ্তাহিক থেকে কেটে নেয়া জনৈক সিনেমা স্টারের ছবি—ছবির তলায় লেখা ঃ

'এই জনপ্রিয় অভিনেতাটি সম্প্রতি তাঁর বিখ্যাত গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন—তাঁর আগামী ছবিতে তাঁকে যেরূপে দেখা যাবে, এখানে তার প্রতিচ্ছবি দেওয়া হল। বলা বাহুল্য তাঁর অসংখ্য ভক্ত তাঁকে নবরূপে দেখার আগ্রহে অধীর হয়ে রয়েছেন।'

শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী

* *

দেশ-বিদেশ বেড়াতে সব ছেলেই ভালবাসে। কিন্তু আমাদের শ্রীকান্তর ভ্রমণে আনন্দ নেই, বরং বেশ ভয়ের ; তার কাছে ভ্রমণের মানে হচ্ছে দেড় মণ।

তার মামা ভারি কৃপণ—কোথাও যেতে হলে গোটা বাড়িখানাই সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। কি জানি, বিদেশে কোন জিনিসের দরকার পড়লে যদি সেটা আবার পয়সা খরচ করে কিনতে হয় ! কিন্তু শ্রীকান্তর এদিকে প্রাণ যায় ; সেই বিরাট লট্‌বহর তাকেই বইতে হয় কি না ! সে সব মালপত্র গাড়িতে তুলতেও শ্রীকান্ত, গাড়ি থেকে নামাতেও শ্রীকান্ত—স্টেশনে যে কুলি নামক একজাতীয় জীবের অস্তিত্ব আছে একথা শ্রীকান্তকে দেখলে তার মামা একদম ভুলে যান।

কেবল কুলির কাজ করেই কি নিষ্কৃতি আছে ? তাকে সমস্ত রাস্তা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গাড়ির দরজায় মুখ বাড়িয়ে। কেননা তার মামার ধারণা, ওই ভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলে সে-কামরার দিকে কেউ এগোয় না এবং যে-কামরার দিকে কেউ এগোয় সেদিকে কেবল একজন নয়, সেই স্টেশনের যত ভগ্নলদাস সবাই সেই কামবার দিকেই ঝুঁকে পড়ে—তার মধ্যে জায়গা থাক্ বা না থাক্। কিছুদূরে খালি কামরা থাকলেও তাদের যেন দৃষ্টি পড়ে না।

তার মামা আবার পারতপক্ষে মেলগাড়িতে যান না, প্যাসেঞ্জার গাড়ি পেলে। যা দু'চার পয়সা বাঁচে। সময়ের আর কি মূল্য আছে বলো ? দু'ঘণ্টা পরে পৌঁছলে যদি দুটো পয়সা বাঁচে তারই মূল্য। প্যাসেঞ্জার গাড়ি সমস্ত স্টেশন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়—দু'তিন মিনিট অন্তর স্টেশন—কাজেই একটুখানি বসতে না বসতে আবার গিয়ে দরজায় দাঁড়াতে

হয়। রাত্রেও ছাড়ান্ নেই—কেননা তখন যাতে কামরাতে স্থান-বাহুল্য না কমে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয় তাকে। তার মামা আয়েসী লোক, সারারাত তিনি গাড়িতেও বাড়ির আরাম চান—তখন যদি অনাহুত কেউ এসে তাঁর জায়গা জুড়ে বসবার জন্য তাঁর ঘুম ভাঙাতে চায় তাহলে যে কী দুর্ঘটনাই ঘটে তা শ্রীকান্ত ভেবে পায় না। কাজেই রিজার্ভ কামরার নোটিশের মতো তাকে গাড়ির দরজায় লট্‌কে থাকতে হয় সারাক্ষণ।

এইসব নানা কারণে ভ্রমণে শ্রীকান্তর সুখ নেই, সখও নেই।

কিন্তু না চাইলেও অনেক জিনিস আপনি আসে। হাম হোক্ তা কে আর চায়? কিন্তু হামেসাই তা হচ্ছে। ফেল্ হতে আর কোন্ ছেলের বাসনা, তবু কাউকে কাউকে ফেল্ হতে হয়। তেমনি শ্রীকান্তকেও মাঝে মাঝে দেশ-ভ্রমণে বেরুতে হয়।

যেমন আজ তাকে যেতে হচ্ছে। ছ্যাকরা গাড়ির ছাদে যা জিনিস ধরে তার দ্বিগুণ চাপানো হয়েছে, গাড়ির মধ্যে শ্রীকান্ত, তার মামা এবং মামী, আর মামাতো বোন টেঁপি। কিন্তু তাঁরই ফাঁকে ফাঁকে গাড়ির মধ্যেও জিনিসের কম্‌তি নেই,—জলের কুঁজো, হ্যারিকেন লণ্ঠন, হাতব্যাগ, ছাতা, পানের ডিবে, খাবারের চাঙারি, টুকরো-টাক্‌রা কত কি! কিন্তু এগুলোর জন্য শ্রীকান্তর ভাবনা নেই, কেননা এসব টেঁপির ভার—পানের ডিবে মামীমা সাম্‌লাবেন আর খাবারের চাঙারি মামা। কিন্তু গাড়ির ছাদে বাক্স-তোরঙ্গ, বিছানার লাগেজ আর কাপড়-চোপড়ের বিপুলকায় সুটকেস—ওসব এখন থেকেই যেন শ্রীকান্তর ঘাড়ে চেপে বসেছে।

শিয়ালদহ পৌঁছেই মামা সর্বাগ্রে নামলেন। নেমেই বললেন, ওগো, হাতপাখাটা দাও তো! শ্রীকান্ত, মোটঘাট সব নামা। বাপু কোচ্‌ম্যান, তুমি একটু ধরো বুঝলে? মালগুলো ধরে নামিয়ে দাও ওকে। আমি টিকিটগুলো কেটে আনি।

গাড়ি দাঁড়াতেই জনকতক কুলি এসে জুটেছিল, তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাল নামাতে গেল। মামা টিকিট করতে পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু কুলিদের অযাচিত কর্মস্পৃহা দেখে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন। বাধা দিয়ে বললেন—'কি, তোমরা মাল নামাবে নাকি? আব্দার পেয়েছ? আস্পর্ধা তো কম নয়? কেন আমাদের কি হাত নেই নাকি?'

একজন কুলি শ্রীকান্তর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বললে—'ওই ছোট ছেলে, ওকি পারবে বাবু?'

—'কেন পারবে না, শুনি? ওদের বয়সে আমরা লোহা হজম করেছি। শ্রীকান্ত, সব চট্‌পট্ নামিয়ে ফেল্, ও ব্যাটাদের ছুঁতে দিস্‌নে একদম্। যাও, যাও, তোমরা সব ভাগ্, যাও।'

বলে, যেভাবে মাছি তাড়ায় সেইভাবে কুলিদের তাড়াবার একটা চেষ্টা করলেন, কিন্তু

নড়ল না দেখে বললেন—'দেখ বাপু, মালে হাত দিয়ো না, পয়সা পাবে না বলে দিচ্ছি আগেই।'

এই কথা বলে, তিনি টিকিট কিনতে চলে গেলেন। শ্রীকান্তর ইচ্ছা হল একবার বলে যে, লোহা হজম করা যদিবা সম্ভব হয় সেই লোহা বহন করা ততটা সহজ নয়। কিন্তু বলেই বা কি লাভ, সমালোচনা করলে তো লোহার ওজন কমবে না—এই ভেবে সে আস্তে আস্তে বাক্স-পেঁটরা, বাসনের ছালা, বিছানার লাগেজ, সুট্‌কেস—মায় জলের কুঁজোটি পর্যন্ত গাড়ি থেকে নামিয়ে প্ল্যাটফর্মের একাংশে স্তূপাকার করতে লাগল।

টিকিট কিনে মামা ছুট্‌তে ছুট্‌তে ফিরলেন। বললেন, 'গাড়ি ছাড়তে আর দেরি নেই রে, সাত-আট মিনিট বাকী। শ্রীকান্ত, এই সামান্য ক'টা জিনিস প্ল্যাট্‌ফর্মে নিতে তোর ক'বার লাগবে? বার তিনেক বোধ হয়? বার তিনেক হলে ফি বারে দু'মিনিট—বাড়তি থাকে আরো দু'মিনিট, খুব গাড়ি ধরা যাবে। টেঁপি, তুই এখানে দাঁড়িয়ে মালপত্রগুলো আগ্‌লা, শেষবারে শ্রীকান্তর সঙ্গে আসবি। আমি আর তোর মা এগুলুম। একটা খালি দেখে কাম্‌রা দেখতে হবে তো। শ্রীকান্ত, তুই ট্রাঙ্কটা মাথায় নে, তার ওপরে ছোট সুট্‌কেসটা চাপিয়ে দিচ্ছি, পারবি তো? বিছানার লাগেজটা বাঁ হাতে নিয়ে লণ্ঠন দুটো ঝুলিয়ে নিস, তাহলেই হবে। দ্বিতীয় বারে বাসনকোসনের থলেটা আর তোর মামীর তোরঙ্গটা নিবি। দৌড়ে আসবি—নইলে গাড়ি ফেল হবে, বুঝেছিস? আমি এগুই ততক্ষণ।'

তিনি তো এগুলেন, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দেখেন শ্রীকান্তর দেখা নেই। তিনি আশা করেছিলেন, শ্রীকান্ত তাঁর পিছু পিছু দৌড়চ্ছে, তাকে দেখতে না পেয়ে তিনি ক্ষুণ্ণ হলেন। ফিরে এসে দেখেন শ্রীকান্ত মালপত্রের বোঝা নিয়ে একেবারে যেন চিত্র-পুত্তলিকা!

—'কিরে, এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে? গাড়ি ফেল করবি নাকি?'

—'কি করব আমি, এগুতে পাচ্ছি না যে। বড্ড ভারি হয়েছে মামা। টেঁপিকে বললাম তুই পেছন থেকে ঠেলে ঠেলে দে আমি চলতে থাকি, তা ও—'

—'বারে! বাবা আমায় এখানে জিনিস আগ্‌লাতে বলল না? আমি ওকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে যাই আর এদিকে সব চুরি হয়ে যাক্‌। তোমার আর কি, জিনিস কমে গেলে তোমাকে তো বইতে হবে না!'

মামা বললেন—'তাই তো, ভারি মুশকিল হল দেখচি।' একটা কুলি এবার সাহস-ভরে এগিয়ে এসে বলল—'খোকাবাবু সেক্‌বে কেন? সোব্‌ ফেলে ভেঙে চুরমার হোবে। আর টিরেন্‌ভি ছোড়ে দিবে।'

তাই তো! ভারি মুশকিল তো!

কুলি করলে তো নগদ লোকসান, এদিকে জিনিস ফেলে ভাঙলেও ক্ষতি, গাড়িরও সময় নেই—কিন্তু ভাববার আর সময় কই? কাজেই বাধ্য হয়ে মামাকে দুটো কুলি করতে হল।

আধঘণ্টা আগে বেরুলে এই অপব্যয়টা হত না, শ্রীকান্তই পাঁচ-ছ'বারে কম করে করে গাড়িতে মালগুলো তুলতে পারত ! যাক্‌গে, এখন আর উপায় কি ?

অতঃপর একটা দেখবার মতো দৃশ্য হল। দুটি কুলি আগে আগে, তাদের মাথায় দুটো বড় বড় তোরঙ্গ। একজনের বগলে বিছানার লাগেজ আরেক জনের বগলে বাসনের থলে। মামী নিয়েছেন জলের কুঁজো আর টে'পি নিয়েছে পানের বাটা। মামার একহাতে একটা ছোট হাতব্যাগ, অন্য হাতে তালপাখা—তারই ভারে মামা কাতর ; এতটা ঘেমে উঠেছেন যে, ওরই ফাঁকে তাল-পাতার হাওয়া খেতে হচ্ছে তাঁকে।

সবশেষে চলেছে শ্রীকান্ত—কুঁজো হয়ে। বাড়তি ট্রাঙ্কটা তারই ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। শোভাযাত্রাটা দেখবার মতো।

গাড়িতে উঠেই মামা লম্বা করে বিছানা পাড়লেন। এতক্ষণ গুরুতর পরিশ্রম গেছে, সেজন্য যথেষ্ট বিশ্রাম দরকার। চলন্ত গাড়ির ফাঁকা হাওয়া গায়ে লাগতেই তিনি আরামে চক্ষু বুজে বললেন—'আঃ, এতক্ষণে দেহটা জুড়োলো। সমস্ত গাড়ি ভর্তি, কিন্তু এ কাম্‌রাটা খুব খালি পাওয়া গেছে ; কারু চোখে পড়েনি বোধহয় !'

বিচিত্র লট্‌বহরে ওই ছোট কাম্‌রার প্রায় সমস্তটাই ভরে গেছল, তারই একধারে বসে শ্রীকান্ত তার পীড়িত ঘাড়ের শুশ্রূষা করছিল। তার অবস্থাটা বুঝে মামী বললেন—'বড্ড লেগেছে নাকি রে ?'

অপ্রতিভ হয়ে শ্রীকান্ত ঘাড়ে হাত বুলানো বন্ধ করল—'না, মামীমা।'

মামা বললেন—ওয়েট্ লিফ্‌টিং একটা ভালো এক্‌সারসাইজ। এতে ওর ঘাড় শক্ত হবে। ওটা দরকার।'

মামী বললেন—'তোমার যেমন ! যাচ্ছি তো ক'দিনের জন্য বেড়াতে, বিয়ের নেমন্তন্নে। এত মালপত্র নিয়ে বেরুনো কেন বাপু ? কি কাজে লাগবে এসব ?'

মামা বললেন—'যাকে রাখ সেই রাখে, কথাটা জানো তো ? সব জিনিসই কাজে লাগে. কাজের সময় তখন পাওয়া না গেলেই মুশকিল।'

মামী বললেন—'মদনপুরে গাড়ি তো দাঁড়ায় মোটে এক মিনিট। বোধহয় এক মিনিটও দাঁড়ায় না। তার মধ্যে কি এই লট্‌বহর নামানো যাবে ? দেখো তখন কি ফ্যাসাদে পড়ো। বাক্স-পেট্‌রা সব গাড়িতেই থেকে যাবে দেখছি।'

মামা বললেন—'কি জানো গিন্নী, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। কিচ্ছু ভেব না তুমি।'

মামার কথায় শ্রীকান্তর হৃৎকম্প হয়, কেননা মদনপুর স্টেশনে, যেখানে এক মিনিট মাত্র গাড়ি থামে কিংবা তাও থামে না, সেখানে ভগবানের জায়গায় একমাত্র নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই সে কল্পনা করতে পারল না। এই বিরাট এবং বিচিত্র লট্‌বহর তাকেই

গাড়ি থেকে নামাতে হবে! তাহলেই তো সে গেছে—তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—শ্রীকান্তর সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।

দমদমে গাড়ি দাঁড়াতেই জনকতক কৃষ্ণকায় ফিরিঙ্গি যুবক এসে সেই কামরায় উঠল। মামার এবং মালপত্রের বহর দেখে তারা একেবারে হতভম্ব। অবশেষে তাদের একজন ভাঙা বাংলায় মামাকে বলল—'টোমরা এ গাড়িতে কেন বাবু? এটা সাহেবদের জন্য—দরজায় নোটিশ দেখ নাই, "For Europeans only"। টোমাদের নামিটে হবে।'

সবেমাত্র আয়েস করছেন, নামার কথায় মামার মাথা গরম হয়ে উঠল। তিনি বললেন—'কেনো নাম্‌টে যাব? আমরাও টোমাডের মটই খাঁটি ইউরোপীয়ান্‌, চাহিয়া ডেখ, টোমাডের ও আমাডের কোনো ফারাক নেই, একপ্রকার গায়ের রঙ্‌।'

'অলরাইট্‌। ডেখি টোম্‌রা নামিবে কিনা।' বলে তারা নেমে গেল এবং পরবর্তী স্টেশনে একজন রেল-কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে এল।

কর্মচারীটিও এসে নামতে অনুরোধ করলেন মামাকে।

মামা বললেন—সমস্ত গাড়ি ভর্তি, কেবল এইটা খালি ছিল, কোথাও জায়গা না পেয়ে বাধ্য হয়ে আমরা এই কামরায় উঠেছি। অন্য কোথাও উঁচু ক্লাসে আমাদের জায়গা করে দিন, এখুনি আমরা নেমে যাচ্ছি।

'আচ্ছা দেখছি জায়গা' বলে কর্মচারীটি নেমে গেলেন, ফিরিঙ্গিরা গাড়িতেই রইল। শ্রীকান্তর ভয় হল, পাছে কর্মচারীটি অন্য কোথাও জায়গা খুঁজে পান, তাহলে তো এখুনি তাকে ভগবানের অবতার হয়ে এই লটবহর বওয়া-বওয়ি করতে হবে।

কিন্তু কর্মচারীটি আর ফিরলেন না, গাড়িও ছেড়ে দিল। কেবল ফিরিঙ্গিরা নিজেদের মধ্যে গজরাতে লাগল। মামা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কিন্তু মামী বললেন—'কাজ নেই বাপু, পরের স্টেশনে চল অন্য কাম্‌রায় যাই।'

—'হ্যাঃ, কোথাও খালি আছে নাকি তোমার জন্য?'

—'না থাকে, পরের গাড়িতে যাব না হয়।'

—'পাগল!'

—'যদি পুলিসে ধরে নিয়ে যায়। সাহেবদের গাড়ি যে।'

—'হ্যাঁ, ধরলেই হল! তুমি চুপ করে থাকো, ব্যাটারা বাংলা বোঝে—তুমি ঘাব্‌ড়ে গেছ জানলে আরো লাফাবে।'

অগত্যা মামী চুপ করলেন।

খানিক বাদেই ব্যারাকপুর এল। গাড়ি দাঁড়াতেই ফিরিঙ্গিগুলো একজন সাহেব কর্মচারীকে ডেকে আনল। তিনি এসে বললেন—'বাবু, টোমাডের নামিটে হইবে—যাহাডের সাহেবি ড্রেস, এ কাম্‌রা কেবল তাহাডের জন্য।'

মামা বললেন—'তা, একথা আগে বলনি কেন সাহেব ? আমাডেরো সাহেবি পোশাক আছে। আমাডের সময় ডাও আমরা এথুনি পরে নিচ্ছি। ওগো, ট্রাঙ্কের চাবিটা দাও তো—'

অগত্যা সাহেব কর্মচারীটি চলে গেল। মামার সত্যিই কিন্তু সাহেবি পোশাক ছিল না, একটা চাল মারলেন মাত্র, এদিকে গাড়িও ব্যারাকপুর ছাড়ল।

অতঃপর ফিরিঙ্গিরা আর কোন উপায় না দেখে এদের তাড়াবার ভার নিজের হাতে নিল। পরস্পর পরামর্শ করে এমন চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে, মামী দস্তুর মতো ঘাব্ড়ে গেলেন। মামারও যে একটু ভয় না হল এমন নয়। মামী বললেন—হ্যাঁ-গা, কামড়ে দেবে না তো ?

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে মাথা নেড়ে মামা বললেন—'কি জানি !'

কামড়াবার কথা শুনে টেঁপি একেবারে বাবার বিরাট পরিধির পেছনে এসে আশ্রয় নিল।

মামা বললেন—'ভালো ফন্দি মাথায় এসেছে। শ্রীকান্ত, তুই কুকুর ডাকতে পারিস ?'

—'বেড়ালের ডাক খুব ভালো পারি মামা ! ডাক্‌ব ? ম্যা—'

—'না, না, বেড়াল ডাকতে হবে না। মাঝে মাঝে তুই কুকুরের মতো ডাক্ দিথি।'

শ্রীকান্ত ডাক্‌ল—'ঘেউ ঘেউ।'

—'আরো একটু জোরে।'

—'ঘেউ ঘেউ ঘেউ।'

হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনে ফিরিঙ্গিরা চুপ করল। শ্রীকান্ত আবার ডাক্‌ল—'ঘেউ ঘেউ ঘেউ—'

একজন জিজ্ঞেস করল—'ও রোকম্ ডাক্‌ছে কেনো সে ? টার কি হয়েছে ?'

মামা গম্ভীরভাবে বললেন—'ও কিছু নয় সাহেব। দশ-বারোদিন হল ওকে পাগলা কুকুরে কাম্‌ড়িয়েছে। **Bitten by a mad dog**—বুঝলে ?'

ফিরিঙ্গিরা যেন লাফিয়ে উঠল।—'অ্যাঁ ? হাইড্রোফোবিয়া ! একথা আগে বল নাই কেন ? ওটো কাম্‌ড়াইটে পারে ?'

মামা বললেন—'না, না, কামড়াইবে না। ভয় নাই।'

বলতে বলতে নৈহাটি এসে পড়ল। ফিরিঙ্গিরা আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তপক্ষণাৎ হুড়মুড় করে সেই কাম্‌রা থেকে পিট্‌টান দিল।

'যাক্ বাঁচা গেল' বলে মামা যেই মাত্র না স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন অমনি আরেকজন ফিরিঙ্গি-যুবক এসে সেই কাম্‌রায় উঠল। সে কোন উচ্চবাচ্য না করে এককোণে গিয়ে

বসল, মামাদের দিকে তাকালও না। মামা বললেন—'দাঁড়াও তোমাকেও ভাগাচ্ছি পরের স্টেশনে। শ্রীকান্ত, গাড়ি ছাড়লেই—বুঝেছিস্ তো ?'

যুবকটি ডিটেক্‌টিভ নভেল বের করে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল, হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনে চমকে উঠে মামাকে জিজ্ঞাসা করল—'ব্যাপার কি, কি হয়েছে ওর ?'

সাহেবের মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে মামা বাংলাতেই জবাব দিলেন—'ও কিছু না, জলাতঙ্ক—যাকে তোমরা হাইড্রোফোবিয়া বল।'

—'ওঃ! তাই নাকি ? ওতে ওর উপকার করবে।'

বলে ছোকরা আবার বইয়ে মন দিল। তার নিশ্চিন্ত নির্বিকার ভাব দেখে মামার পিত্ত জ্বলে গেল। তবু তিনি বললেন—'তোমাকে সাবধান করা আমার কর্তব্য। কি জানি, যদি কামড়ে দেয়, বলা তো যায় না। তখন তোমাকেও ঐ রোগে—'

যুবকটি মৃদু হেসে বলল—'আহা, না না! যে কুকুর ডাকে সে কি কখনো কামড়ায় ?'

অগত্যা মামা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন এবং শ্রীকান্তও ডাক ছেড়ে দিল। তাকে কুকুর বলাতে সে মনে মনে এমনি চটেছিল যে, তার ইচ্ছা করছিল ফিরিঙ্গিটাকে এখনি গিয়ে ঘ্যাঁক করে কামড়ে দিয়ে আসে।

কাঁচড়াপাড়ায় গাড়ি থামতেই যুবকটি মুখ বাড়িয়ে বাইরে দেখছিল। তার পরিচিত বন্ধুদের দেখতে পেয়ে ডাকাডাকি শুরু করতেই সেই পুরাতন দল এসে উপস্থিত। তারা তাকে ঐ কামরায় দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল—তুমি নিরাপদে আছ তো ? ওখানে যে মারাত্মক হাইড্রোফোবিয়া!'

—'সে আমি সারিয়ে দিয়েছি।'

—'সারিয়ে দিয়েছ কি রকম ?'

তখন মামার চাল যুবকটি বন্ধুদের কাছে ফাঁস করে দিল। সে কামরায় ঢুকেই ছেলেটিকে জল খেতে দেখেছিল, জলাতঙ্ক রোগে যা কদাচই সম্ভব নয়। তখন শ্রীকান্তর ভারি রাগ হল তার মামার ওপর, জলাতঙ্ক রোগে জল খেতে নেই এ কথা তাকে তিনি আগে বলেননি কেন ? তাই তো তাকে এমন অপদস্থ হতে হল এখন!

এইবার ফিরিঙ্গিরা আবার সেই কামরায় জাঁকিয়ে বসল এবং স্পষ্ট ভাষায় মামাকে জানাল যে, এবার তাঁকে নামতেই হবে এবং এর পরের স্টেশনেই।

অসহায় ভাবে মামী বললেন—'ওগো, কী হবে তাহলে ?'

মামা বললেন—'কিছু ভেব না গিন্নী! ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।'

ভগবানের নাম শুনে শ্রীকান্তর নিজেকে মনে পড়ল এবং ঘাড়ের ব্যথাটা এতক্ষণে কতটা মরেছে জানবার জন্য সে একবার ঘাড়টাকে এধারে ওধারে খেলিয়ে নিল।

পরের স্টেশন আসতেই মামা বললেন—'এখানে তো হয় না, এখানে গাড়ি মিনিট খানেক দাঁড়ায়, পরের জংশনে বদলানো যাবে না হয়।'

'—না, টা হইবে না, এইখানেই টোমাদের নামিটে হইবে।'

তখন সবাই মিলে মামার বাক্স, তোরঙ্গ, বিছানা, সুটকেসে হাত লাগাল।

—'ডেখি কেমন টুমি না নামো।' এই বলে একজন বাসনের থলেটা নামিয়ে দিয়ে বলল—'**Here you are** !'

কুঁজোর জাত যাওয়ায় মামীমা হায় হায় করতে লাগলেন। ততক্ষণে দুজন মিলে ধরাধরি করে ভারী ট্রাঙ্কটা নামিয়ে ফেলেছে। মামা তখন বাঙ্কের ওপরের বড় সুটকেসটা ওদের দেখিয়ে দিলেন। একজন গিয়ে সেটা নামাল।

মামা বললেন—'বেঞ্চির তলায় ঐ তোরঙ্গটা—ওই যে !'

একজন সেটা নামিয়ে বলল—'এই টোমার টুরঙ্গ।'

মামা সংশোধন করে দিলেন—'তুরঙ্গ নয়, তোরঙ্গ—তুরঙ্গ মানে তো ঘোড়া।' সর্বশেষে বুদ্ধিমান যুবকটি ছোট হাতব্যাগটা মামাকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'গুড্-বাই, মিস্টার্ !'

মামা এতক্ষণ পুলকিত হয়ে ওদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এইবার বললেন —'এই মদনপুর—এখানেই আমরা নামতাম। অতএব গুড্-বাই এবং থ্যাঙ্কস্।'

পিয়ানো কেনার ফ্যাসাদ !

* *

বঙ্কা এসে বললে, পিয়ানো কিনবি? বেশ দাঁওয়ে পাওয়া যাচ্ছে। বেচে ফেলছে একটা সাহেব।'

'পিয়ানো !' আমি অবাক হয়ে যাই। 'পিয়ানো কেন রে? পিয়ানো কি একটা কেনবার জিনিস?'

'বাঃ, দাঁওয়ে পাওয়া যাচ্ছে যে ! বেচে ফেলছে—'

'হ্যাঁ, বুঝিচি। একটা সাহেব !' আমি বাধা দিয়ে বলি—'কিন্তু এত জিনিস থাকতে পিয়ানো? পিয়ানো কিনতে যাব কেন?'

'তাহলে কী কিনবি? আর তো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না দাঁওয়ে এখন। আজকের স্টেট্‌স্‌ম্যানে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, বিলেত চলে যাচ্ছে কি না, তাই বেচে ফেলছে—'

'শুনেছি শুনেছি। একটা সাহেব। সাহেবের তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, বেচতে গেছে। আমার কিন্তু বিস্তর কাজ।'

বন্ধু কিন্তু নাছোড়বান্দা। দাঁওয়ের জিনিস কেন হাতছাড়া করা অন্যায়, কত দামী দামী জিনিস, নামমাত্র মূল্যে মিলে যায় দাঁওয়ের মাথায়, একটা দাঁও নষ্ট হতে দেওয়া কতখানি বোকামি—ইত্যাদি—সব কিছু আমাকে বিশদ ভাবে বোঝাতে থাকে।

সমস্ত শুনে-টুনে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলি: 'কিন্তু ভাই, আমার তো কোন দরকার নেই পিয়ানোর! বাজাতেও জানি না তো আমি!'

'বাজাতে আর কি! এমনিতেই বাজে যে। চাবি টিপলেই হল। বেলো করতেও হয় না। কোন হাঙ্গাম নেই, ঢের ভালো তোর ঐ হারমোনিয়ামের চেয়ে। আর বাজনা? যা চাস্! বেহালার টুং টাং থেকে, গোরার ব্যাণ্ডের বাদ্যি—সব এক জায়গায় বসে শুনতে পাবি। কী মজা বল্ তো!'

'তা তো শুনলাম, কিন্তু—'

'আর 'কিন্তু' না। দাঁওয়ে পাওয়া যাচ্ছে, বুঝছিস নে বোকা? দেরি করলে শেষটায় ভিড় ঠেলে পিয়ানোর কাছে পৌঁছানোই যাবে না হয় তো! ফসকে যাবে এমন দাঁওটা।'

আমি আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠি: 'কত দাম একটা পিয়ানোর?'

'তা কে জানে! তোর কাছে যা আছে সব নে সঙ্গে, আমিও নিয়ে এসেছি কুড়ি টাকা। ওতেই কুলিয়ে যাবে মনে হয়।'

বন্ধুবরের কুড়ি টাকা এবং আমার বাক্স, বইয়ের মলাট; বালিশের ওয়াড় এবং বিছানার তলা সমস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আরো গোটা সাতাত্তর যোগাড় হল।

বন্ধু বললে: 'আর কিছু নেই? জুতোর সুখতলার মধ্যে? কি, আর কোথাও? ঐ আলোয়ানটা ঝেড়ে দেখব?'

'নাঃ! এমন কি, ঐ ছাতাটার ভেতরেও যদি খোঁজো, কিংবা, কামানোর বাক্সটাও হাতড়াও, একটা পাই পয়সারও সাক্ষাৎ পাবে না ভাই।'

'যাক্, ওতেই হয়ে যাবে। কতই বা দাম হবে একটা পিয়ানোর? হারমোনিয়ামের চেয়ে কতই বা বেশি হবে আর? তা ছাড়া যদি সস্তাতেই না পেলাম তবে আর দাঁও-টা কিসের!'

ইউরোপীয়ান্ য়্যাসাইলাম্ লেনে এক সাহেব,—বিজ্ঞাপনটা একেবারে বাজে নয়। ঠিকানাতে পৌঁছতেই সঠিক খবর পাওয়া গেল—বিলেত তিনি যাবেন কিনা বলা যায় না, তবে পিয়ানোটা তিনি বেচে ফেলছেন সত্যিই। এবং আরও আমাদের সৌভাগ্য যে, এখনো বিকিয়ে যায় নি, টিকিয়ে রেখেছেন জিনিসটা। জলজ্যান্তই টিকে আছে আমাদের জন্যে।

আমি বন্ধুর গা টিপি: 'তুই যে বললি ভারী খদ্দেরের ভিড় হবে? কিন্তু লোক কই রে? আমরা ছাড়া তো আর কাউকে দেখছিনে এখানে। একটা মাছিকেও না!'

'খোঁজই পায়নি। ক'জনই বা দাঁওয়ের খবর রাখে! খবরের কাগজই বা পড়ে ক'জন? আর আমার মতো অমন করে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কেই বা পড়ে?'

তা বটে! আমি মনে মনে ঘাড় নাড়ি।

সাহেব আমাদের সঙ্গে করে ড্রইংরুমে নিয়ে যান, পিয়ানোর সঙ্গে মুলাকাত করিয়ে দ্যান। বঙ্কু তো বেশ সাহসী হয়ে ওটার কাছ অবধি এগিয়ে যায়, এমন কি, ভরসা করে ওটার গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দ্যায় পর্যন্ত।

আমাদের দু'জনেরই পছন্দ হয়ে যায়, কিন্তু দাম শুনে তো চক্ষু চড়কগাছ! আড়াই হাজার টাকায় সাহেবের কেনা, এবং আনকোরাই বলতে হবে—এই কারণে আসল থেকে দুশো পঁচিশ মাত্র বাদ দিয়ে ছাড়তে তিনি রাজী আছেন। এমন কি, আর পাঁচটা টাকা কমিয়ে দু' হাজার দুশো কুড়ি করতে গেলেও কিছুতেই তিনি পেরে উঠবেন না, ঘোরতর-ভাবে ধরলেও, এ কথাও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানিয়ে দিলেন আমাদের।

বঙ্কু মুখ কাঁচু-মাচু করে বললে: 'তাহলে সেলাম্ সাহেব। পিয়ানো কেনা আমাদের হল না। কেবল পঁচিশ টাকা নিয়ে বেরিয়েছি আমরা। বাড়তি একটা পয়সাও নেই আমাদের সঙ্গে!'

'জুতোর সুখতলাও দেখতে পারো।' আমি যোগ দিই ওর কথায়। আমার জুতো তুলে দেখাই।

'হ্যাঁ, আরো ফারদার গেলেও একটা ফার্দিংও পাবে না আর।' বঙ্কু যোগ করে: 'অতএব তোমার পিয়ানোকেও সেলাম! য়্যাণ্ড অল্‌সো আই থ্যাঙ্ক্ ইউ—বোথ অফ ইউ!'

ধন্যবাদটা দিলে, পিয়ানোর গায়ে হাত বুলোতে দেবার জন্যেই বোধহয়।

'নো, নো, ডোণ্ট্ গো—মিস্টার্!' সাহেব এক লাফে আমাদের সামনে এসে পড়েন। 'গিভ মি দি এইট্টি ফাইভ্ য়্যাণ্ড টেক্ ইয়োর পিয়ানো! টেক্ ইট রাইট য়্যাওয়ে —জাস্ট নাউ!'

বঙ্কুর কানে ফিস্‌ফিস্ করি—'খ্যাপা নাকি সাহেবটা? কামড়ে দেবে না তো? পালাই চ' এখান থেকে।'

সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয়। দু'হাজার দু'শো পঁচিশ থেকে, অযাচিতভাবে এক ধাক্কায় ধপ্ করে কেবলমাত্র পঁচাশিতে নেমে আসা এবং তার সঙ্গে, এ-পাড়াটার নাম, ইয়োরোপীয়ান্ য়্যাসাইলাম্ লেন, যোগ করলে যা দাঁড়ায় তাতে সন্দেহ না হওয়াই অস্বাভাবিক।

বঙ্কা কিন্তু ঘাবড়ায় না: দাঁও কাকে বলে জানিস নে তো বোকা! সাহেবও একটা দাঁও পেয়েছে য়্যাদ্দিন পরে—ফস্‌কাতে রাজী হয় সহজে! দাঁওয়ের মাথায় কি লাভ-

লোকসানের খেয়াল থাকে রে ? কাণ্ডজ্ঞানই লোপ পেয়ে যায় তখন। কথায় বলে, দাঁওয়ে কাটে আর দা-য়ে কাটে। দাঁও আর বলেছে কেন তবে ?'

'কাজ নেই দাঁও-য়ে। কেটে পড়ি চল্।' আমি ওকে টানাটানি করি, 'ভারি ভয় করছে আমার !'

'তোর কথাতেই আর কি !' বঙ্কু বেজায় বেপরোয়া। 'এই মোক্ষম দাঁওটা—মারা যেতে দিই আর কি তোর কথায় !'

আমি কি বলব ভেবে পাই না।

'বের কর্ তোর্ টাকা !' বঙ্কু আর একদণ্ড নষ্ট করতে রাজী নয়—'যদি পালাতেই হয় পিয়ানোকে নিয়েই পালাবো।'

বঙ্কুর প্ররোচনায় পড়ে নগদ পঁচাশি মুদ্রা বার করে, সাহেবের সেই দুর্বল মুহূর্তেই, দাঁওটাকে আত্মসাৎ করলাম। এবং পাছে সাহেবের মতিগতি হঠাৎ বদলায় এই ভয়ে, কামড় খাবার আগেই, তক্ষুনি কুলী ডাকিয়ে পিয়ানোকে সঙ্গে নিয়ে সরে পড়লাম সটাং।

কিন্তু পিয়ানোকে নিয়ে তো আর মেসে ওঠা চলে না, রাখাও চলে না বাসাবাড়িতে, পাঁচজনের মধ্যে—কাজেই মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় কাছাকাছি পাড়ায় একটা কুঠরি নিয়ে ওকে প্রতিষ্ঠিত করা হল।

এবং তার পরেই আমরা সদ্য-পরিচিতের সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলাম। আমি একধারে বসলাম, বঙ্কা আর এক ধারে—দু'খানা টুল নিয়ে দুজনে—এবং দুজনেই বাজাতে লাগলাম পুরো দমে।

বাজনা না তো, বাজ পড়া ! সমস্ত পাড়া কাঁপিয়ে, দারুণ সোরগোল তুলে সে-একটা কিছু শুরু হল বটে ! সুরের জগঝম্প যাকে বলে !

বঙ্কা বাজাতে বাজাতেই বলে, গলা বাজিয়েই বলে : 'ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী আছে শুনেছিস্ তো ? পিয়ানোয় সব কটা বাজে এক সঙ্গে। ওর কাণ্ডই ওই !'

'কী বললি ? ছয় রাগ ?' আমাকেও চেঁচাতে হয় ওর কানের গোড়ায় যা হট্টগোলের আওয়াজ, কথা শুনবার যো কি ! 'একে আর রাগ বলে না, যাঃ ! বরং ক্রোধ বলাই ঠিক। কী ভয়ংকর রাগ রে বাবা !'

পুরাকালে সুরাসুরে মিলে সমুদ্রের সেই আদ্যশ্রাদ্ধ পুরাণে পড়া গেছে, আর এ-কালে, একটিমাত্র বাদ্যযন্ত্রকে ঘিরে, তাদের সেই পুরাতন দ্বন্দ্ব—সেই সাবেক যন্ত্রণা—পুনরায় যেন প্রত্যক্ষ করলাম ! স্বকর্ণেই প্রত্যক্ষ করা গেল।

বঙ্কা বললে : 'খাসাই আছে জিনিসটা ! একটা খদ্দের পেলে বেশ দাঁওয়ের মাথায় বেচা যায় আবার। তাড়াহুড়া না করে রয়ে বসে বেচতে পারলে দর উঠবে অনেক। হাজার টাকায় কিনতেও বেজার হবে না কেউ।'

হাজার টাকার কথায় আমার টনক্ নড়লো। বাস্তবিক, বোকা হলে কি হবে, বুদ্ধি আছে বক্কাটার। মাথা খাটিয়ে, দাঁওয়ের মাথায়, বেড়ে কিনেছে তো পিয়ানোটা! এখন বড়লোক বন্ধুদের একজনকে বেছে এটা গছাতে পারলেই হল। বেচে দিতে পারলেই বড়লোক!

ওই রকম একটা দুরভিসন্ধি স্কন্ধে নিয়ে, বড়লোক বলে নামডাকওয়ালা জনৈক বন্ধুর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

একেবারেই তো ফস্ করে বলে ফেলা যায় না, গরজ দেখালে দর পাবো কেন? ঘুরিয়ে ফিরিয়েই কথাটা পাড়তে হয়।

'একটা কথা বলছিলাম ভাই। বলছিলাম কি, একটা পিয়ানো—'

বলামাত্রই বন্ধুটি লাফিয়ে ওঠেন!

'পিয়ানো-কেনার কথা বলছ তো? বেশ তো বেশ তো ভালোই তো! বলো কি বলবে?' বন্ধুটির দারুণ আগ্রহ দেখা যায়।

আমি বিস্মিতই হই: 'পিয়ানো-কেনার কথাই যে, তুমি জানলে কি করে?'

'বাঃ এতে অবাক হবার কি আছে? পিয়ানোর নাম কে না জানে? কার না কেনবার সাধ? টাকায় পোষালেই তক্ষুনি কিনে ফেলে মানুষ! কেনই বা না কিনবে? প্রত্যেক বড়লোকের বাড়িই পিয়ানো আছে যে! মাঝারি লোকদের বাড়িতেও 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' পাবে তুমি। উপর-চালাক ফ্যাসান্-বাজ্‌রাও অন্ততঃ ওপরের ফ্রেমখানাও বাড়িতে রেখেছে! পিয়ানোয় কতখানি মানুষের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়, খবর রাখো তার?'

আমি ঘাড় নাড়ি। সত্যিই, এতখানি জানা ছিল না। গুণগরিমা জেনে ওকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে মায়াই করে।

অমন বনেদী জিনিসকে বেচে ফেলতে সত্যিই মন কেমন করতে থাকে। তবু, এর কাছে—এহেন সমঝদার সজ্জন গুণী ব্যক্তির কাছে—হতভাগ্য পিয়ানোটার ভালো দামই পাওয়া যাবে, আশা করে ঈষৎ উৎফুল্লই হই।

'যা বলেছ মিথ্যে না ভাই। দামটা তুমিই ঠিক করে ফ্যালো, তুমি যা বলবে তাই, তাতেই আমি রাজী। তুমি ওর দরও জানো, আদরও জানো।'

'না, না। সে কি হয়? তুমি একটি দাম বলো আগে, তারপর, আমার যদি না পোষায় আমি বলব তখন।'

'হাজার টাকা কি খুব বেশি হবে মনে করো?' অগত্যা আমিই বলি।

'বেশি? পাগল! একটা ভালো পিয়ানো কিনতে কত প'ড়ে জানো? তার পরে তার পেছনে আরও খরচা তো লেগেই আছে! আজ মেরামত, কাল পালিশ, পরশু আবার টিউনিং—পিয়ানো পোষা না হাতী পোষা। খরচা কত একটা পিয়ানোর!'

'কুলী খরচাই তো কুড়ি টাকা।' আমার অভিযোগ আমি যোগ করি : 'জানা আছে আমার ! দশজন কুলী লাগে—দু'টাকার কমে মাথা পাত্‌তেই রাজী হয় না কেউ।'

'ধুত্তোর কুলী-খরচা ! পিয়ানো সম্বন্ধে তোমার কোনো আইডিয়াই নেই। হাজার টাকা বলাতেই তা বুঝতে পেরেছি—আর বলতে হবে না।' বন্ধুটির আপাদমস্তক বিরক্তি প্রকাশ পায়।

'তা হলে—তা—হলে—'

আমি ইতস্ততঃ করি। কী যে বলব ভেবে ঠিক পাই না। দামটা কম ব'লে ফেলা হয়েছে যথার্থই ; দু'হাজার, এমন কি আড়াই হাজার বললেও খুব বেশি বলা হত না, তাও নিঃসন্দেহ, কিন্তু বেমক্কা একটা কম দর—নিতান্তই মাটির দাম দেয়ার জন্যেই কি বেটপ্‌কা এই পায়াভারী খদ্দেরটা হাত ফস্‌কে যাবে ? তবু, চারদিক খতিয়ে এবং অগ্রপশ্চাৎ বহুৎ বিবেচনা করে খুব বেশি উপরে উঠতে সাহস পাই না, আম্‌তা আম্‌তা করে বলি—'তা হলে—তুমি কি বলো তবে—দেড় হার্জার ?'

'হ্যাঁ, দেড় হাজার হলে, খানিকটা মানায় বটে। ওটা সতের শো করে ফ্যাল। তুমি নেহাত বন্ধু বলেই বলছি। কুলী খরচা-টরচা—যা বলছ ও-সব আমার, তোমাকে দিতে হবে না। আমারই লোক গিয়ে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আন্‌কোরা নতুন জিনিস ভাই—একেবারে খাস্ বিলিতি, খাসা পিয়ানো ! দেখলে চোখ জুড়োবে আর শুনলেই অজ্ঞান ! বুঝলে বন্ধু, সতেরো শো, এমন বেশি বলিনি, বাজারে ওর দাম ঢের বেশি—প্রায় ডবল্ বলতে গেলে। তা, টাকাটা কি সঙ্গে এনেছ ? ও ! কাছে নেই এখন ? তা, তা আর কি হয়েছে ? তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকে অবিশ্বাস করিনে। পিয়ানোটা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর তবে। হাঁ, এখনই—এখনই ভালো। শুভস্য শীঘ্রং, দেরি করে লাভ কি ? আমার সরকার যাচ্ছে তোমার সঙ্গে। তাকেই দিয়ে দেবে টাকাটা। না, না, ঘাবড়াচ্ছ কেন ? পুরো দেড় হাজারই যদি এখন না পারো, তাতেই বা কি হয়েছে ? তুমি বন্ধুমানুষ, তোমাকে কি অবিশ্বাস করি ? এখন যা পারো তাই দিয়ে দিয়ো—হাজার, কি, সাত শো, কি, পাঁচ শো ? তাও পারবে না এখন ? একটা কথাও বলছ না যে ! বেশ যা পারো দাও এখন—আর কি বলব ? চার শ' ? তিন শ' ? আড়াই শ' ? দেড় শ' ? পঁচাশি ? পঁচাত্তর ? তেপান্ন—বাহান্ন ?—যা পারো এখন দিয়ে দেবে, তার পরে তোমার সুবিধেমতো বাকীটা মাসিক কিস্তিতে যত মাসে পারো দিলেই চলবে। তুমি বন্ধু মানুষ, তোমাকে কি আর অবিশ্বাস ?'

তার কথা না শুনে আমি তো একেবারে আকাশ থেকে পড়ি। পড়বার পর আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াই না।

তারপর যে-বন্ধুর কাছেই যাই—কী বড়লোক, আর কী ছোটলোক—সেখানেই শুনি,

তার নিজেরই, বা, তার কোন এক বন্ধুর ভালো একটা পিয়ানো বিক্রি আছে। বেশ সস্তায় পাওয়া যাবে দাঁওয়ে। সবাই বেচতেই চায় পিয়ানো, কেনবার লোক কেউ নেই। প্রত্যেকের পিয়ানোই চমৎকার, চূড়ান্ত, আর উপাদেয়—কেউ বা সবে পয়সা খরচ করে আবার টিউনিং করিয়েছেন—বিক্রি করবার মতলবেই অবিশ্যি, কেউ বা বিক্রি করে সারানোর খরচা উঠবে কিনা সন্দেহ পোষণ করে তারপর আর সারাননি—তবে সামান্যই একটু খারাপ, সারিয়ে নিলেই নতুন হয়ে যাবে আবার।

এ-সব দেখে-শুনে পিয়ানো-বেচার আশায় ইস্তফাই দিতে হল। কিন্তু মাস মাস দশ টাকা করে পিয়ানোর ঘর-ভাড়া আর কাঁহাতক গোনা যায়? এ-পর্যন্ত প্রায় তিন শ' টাকা গুণোকার দিতে হয়েছে সেটাও তো কম কথা নয়। কোথাও ঝেড়ে ফেলবারও উপায় নেই, অমনি পেলেও নিতে রাজী নয় কেউ—পিয়ানোটা যেন বুকে চেপে বসেছে আমার। ঝক্‌মারি তো যথেষ্টই হয়েছে—কিন্তু মাসুলের হাত থেকেও পরিত্রাণ দেখছি না কোন-দিকে। সিন্ধুবাদের পিঠে হিন্দুবাদের ন্যায়—এই নাছোড়বান্দাকে নিয়ে কী যে করব ভেবেই পাইনে! ওর দিকে তাকালেই বুক কাঁপতে থাকে, ভাবতে গেলেই দম আটকে আসে। পিয়ানো, না, একটা বিভীষিকা! বাপ্‌!

এমন সময়ে পাড়াগাঁ থেকে আমার মামাতো ভাই এসে হাজির। কলকাতার কোন্‌ এক রেসিডেন্সিয়াল্‌ ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে, গোটা চারেক টাকা তার চাই। একটা চৌকি কেনার দরকার।

চার টাকা! কোথায় পাবো চার টাকা। মনের মধ্যেই হাতড়াই। চার চার টাকা। কম টাকা নয়। বালিশের ওয়াড়, পাপোষের তলা, স্যুটকেসের খাঁজখোঁজ হাতড়ানো বৃথা। যেদিন থেকে পিয়ানো কিনেছি, একসঙ্গে চার টাকার মুখ দেখিনি, দেখলেও অনেকক্ষণ ধরে দেখবার সুযোগ পাইনি। গল্প লিখে-টিখে যখন যা পেয়েছি, দেখতে না দেখতেই ফুট্‌ কড়াই! পিয়ানোর বাকী ঘর ভাড়া গুণতে আর ওর চিকিৎসা আর হেফাজতে যে-টাকাটা ধার করতে হয়েছে তারই মোটা হারের সুদ শুধতেই সব কাবার।

অতি কষ্টে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলে ফেলি: 'টাকা কি হবে? চৌকিই দেব তোকে। বাড়তি একটা চৌকিই রয়েছে আমার। দিব্যি তোফা চৌকি। তার রং আর পালিশ দেখলে তাক লেগে যাবে তোর। তোর হোস্টেলের বন্ধুদেরও। চৌকিই নিবি, চল্‌।'

নিয়ে গিয়ে পিয়ানোটা তাকে দেখাই। এতদিনে এটার একটা গতি-মুক্তি হল তাহলে। হনুমান লক্ষ্মণকে দেখে গন্ধমাদন নামাতে পেরেছিল, আমিও এতদিনে একটা সুলক্ষণ দেখি।

অনেকক্ষণ ধরে সে এই অদ্ভুত বস্তুটিকে ছ্যাখে, ভালো করেই ছ্যাখে। ছ্যাখেনি তো কখনো। কিন্তু দেখে-টেখে মুখখানা কি রকম যেন করে। ভাবে বোধহয়, এ আবার কি চৌকিরে বাবা! হয়তো মনে মনে ওর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনাই করে। একবার সাহস করে গায়ে হাতও ঠেকায়। কিন্তু কেমন যেন খুঁৎখুঁতুনি থেকে যায় ওর তবুও।

'দেখছিস, কেমন! চমৎকার!' আমি ওকে উৎসাহ দিই। 'খুব দামী জিনিস। জানিস্?'

ভায়া আমার নাক সিট্‌কোয়: 'এ চৌকিতে আমার কাজ নেই দাদা। যেটা তোমার মেসে আছে, তুমি যাতে শোও, সেইটাই আমায় দিয়ো বরং। ছেলেদের হোস্টেলে দামী জিনিস রাখা কি ভালো? আর, তা ছাড়া, তোমাকেই মানায় এই রকম জাঁদরেল চৌকি। তুমি হচ্ছ লেখক মানুষ!'

মামাতো ভাই যে খাস্ পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয়।

মামাতো ভাইকে তারপর থামানো যায় না। তক্ষুনি সে মুটে ডাকিয়ে, আমার বিছানা নামিয়ে রেখে, মেসের চৌকিটাকে নিয়ে উধাও হয়। এক মুহূর্ত আর দাঁড়ায় না, কি জানি সবল মুহূর্তে যদি আমি 'না' বলে ফেলি আবার।

আর আমি? আমার কথা বলাই বাহুল্য!

এতদিন পিয়ানো ছিল আমার আশ্রয়ে, তারপর থেকে, আমি—আমিই তার আশ্রয় নিয়েছি। ওটাকে তাড়াবার আর কোন রাস্তা না পেয়ে, আমরাই আস্তানা গেড়েছি তার ওপরে।

বাসার সবাই অবাক হয়ে তাকায় আমার আজগুবি চেহারার এই চৌকিটার দিকে। হ্যাঁ, চৌকি তো বটেই, বিলিতি চৌকি তার ওপর—যদিও কারো নিয়ে পালাবার সম্ভাবনা নেই, তবু চৌকি দিতে হয় আমায় দস্তুরমত। সব কাজ ফেলে রেখে দিনরাত এই চৌকিদারি করি—চৌকির উপর শুয়ে শুয়েই।

আর চৌকি তো নয়, রশুন চৌকি যার নাম! নেহাত আজে-বাজে জিনিস না, বরং বাজেই বলা যায়—একটু বসলে কি শুলে কি পাশ ফিরলেই বেজে ওঠে। বাজছেই টুং টাং!

অবশেষে একটা কথা আমার বলবার আছে, তা হচ্ছে একছত্রে এই:

আর যাই কেনো ভাই, কেনো চাই কি আনো। ভুলেও কখনো যেন কিনোনাকো পিয়ানো।

ফ্যাসাদ আর কিছু না, এককড়ি ঘোষ ধার দিয়েছিলেন পাঁচ শো টাকা দেড়কড়ি ঘোষালকে। গুনে গেঁথে মবলগ পাঁচশো নগদ।

দেড়কড়ি আশ্বাস দিয়েছিলেন: 'সুদের জন্যে ভাববেন না, এককড়ি বাবু! আপনি ঠিক-ঠিকই পেয়ে যাবেন মাস-কে-মাস। তার কোন ব্যত্যয় হবে না! ধার নিলেই সুদ দিতে হয়, ও আমার জানা আছে মশাই! রোগ হলেই ওষুধ, আর ঋণ করলেই সুদ—ইচ্ছে না থাকলেও টানতে হবে, উপায় কি?'

এককড়ি একগাল হেসেছিলেন। হাসবেন না কেন? ওষুধ কখনো-সখনো তেতো হলেও, সুদ তো আর কখনই তেতো নয়! এক গাল হাসবার পর একটা কথা তিনি বলতে গেছলেন: 'তা যা বলেছেন দেড়কড়ি বাবু! সুদ তো দেবেনই, নিয়মিতই দেবেন; কিন্তু ঐ সঙ্গে কিছু কিছু করে আসলটাও···!'

'বিলক্ষণ! ঠিক যে-টি আশংকা করেছেন,—' বাধা দিয়ে বলেছেন দেড়কড়ি: 'ঐ হাঙ্গাম যা-কিছু তা আসলেই! আসলেই যত গোল মশাই! কত জোড়া জুতোরই সোল ক্ষয়ে যায় হেঁটে-হেঁটে! আসল আদায় করতে দস্তরমতো সোল্‌-ফোর্স দরকার এককড়ি বাবু! হেঁ—হেঁ হেঁ—!'—ঈষৎ হাস্য দিয়েই দেড়কড়ি আসল কথাটার উপসংহার উহ্য রাখতে চান।

জবাব শুনে মুখ শুকিয়ে যায় এককড়ি বাবুর। এক পলকের মধ্যে তিনি সারা অন্তঃকরণ হাত্‌ড়ে ফ্যালেন, আপাদমস্তক অন্তরে-বাহিরে পই-পই করে খোঁজেন, কিন্তু না-তাঁর আত্মায়, না-তাঁর আত্মীয়ে, কোথাও এক কড়ার শক্তির সন্ধান তাঁর মেলে না। সোলফোর্সের কথাটায় ভারী তিনি বিমর্ষ হয়ে যান।

দেড়কড়ি অভয় দ্যান—'না—না, ঘাবড়াবেন না। আমি না মারা গেলে টাকা আপনার মরবে না। আর আমিই কি সহজে মারা যাবো আপনি সন্দেহ করেন? কেন, লাইফ ইনসিওর করিনি তো? এখনো করিনি। তবে? তবে মরব কেন? না না, সে-ভয় নেই আপনার। কাপুরুষের মতো আমি মরব না। মরতে হলে, বীরের মতোই, অনেককে মেরে তবেই আমি মারা যাবো। ভয় খাবেন না আপনি।'

এককড়ি আরো কতখানি ভরসা পান এককড়িই জানেন।

'দেখুন এককড়িবাবু, কন্যা আর অর্থ—সম্প্রদান করার পর আর ভাবতে নেই। তখন

সে যার হাতে গেল তার জিনিস। তারপর শুধু তত্ত্ব নেবেন খালি—আদতে বেঁচে আছে কিনা আসলে! তা হলেই হল! আজকের দিনে মারা না যাওয়াটাই কি যথেষ্ট নয়, মশাই? নিজের ঘরে পুনরায় তাদের ফিরে পাবার প্রত্যাশা কদাচই করবেন—কী বলেন? হেঁ—হেঁ—হেঁ—' আরেক দফা দেঁতো-হাসি দেড়কড়ির।

চূড়ান্ত একটা রসিকতা আন্দাজ করে এককড়িও উচ্চহাস্যে যোগ দিতে সচেষ্ট হন, কিন্তু ভালো পেরে ওঠেন না। তাঁর বদনমণ্ডলে অতি কষ্টে-সৃষ্টে, যা বহিষ্কৃত হয় তা হাসি তো নয়ই, কাষ্ঠহাসিও না; হাসির নামমাত্রও কিনা সন্দেহ! গালে উঠে গালেই পর্যবসিত হয়ে যায় পত্রপাঠ,—হাসির গালাগাল তাকে বলা যেতে পারে টেনে-হিঁচড়ে।

হাসির বাপান্ত করে এককড়িবাবু বলেন অবশেষে: 'বেশ বেশ! যেমন পারেন, সুদটাই দিয়ে যাবেন মাসকে-মাস। তারপর যখন সুবিধে হবে আসলের কথাটাও ভুলবেন না যেন! কিছু কিছু করে দিয়ে যেতে পারলে আপনারই তো ভালো মশাই! দেনাটা হাল্‌কা হয়ে যাবে কত! তাই না কি?'

'আরে মশাই, পাতলা হল কি, দেনার নামই গেল পালটে! শুধতে শুরু করলে কি তার নাম আর দেনা থাকে মশাই? তখন তো তার নাম হচ্ছে নে-না! বিলক্ষণ!'

আর একপ্রস্থ হাসি প্রকাশ পায় তাঁর মুখে। এককড়ির ইচ্ছে করে টাকা পাচশো কেড়ে নিয়ে, হাণ্ডনোটটা ছিঁড়ে ফ্যালেন তক্ষুনি। এবং নিজের হাতের বিরাশী সিকের একটা নোটিশ—ইহাকে কদাপি ধার দেওয়া কর্তব্য নয়—কিংবা এধার দিয়ে যাতায়াতই মারাত্মক—এই জাতীয় একটা ঘোষণা দেড়কড়ির অবারিত গণ্ডদেশে সশব্দে সেঁটে দ্যান সেই দণ্ডে। বিজাতীয় রাগে এই রকমই প্রচণ্ড একটা প্রেরণা হতে থাকে তাঁর।

প্রথম কয়েক কিস্তি সুদ রীতিমতোই দিয়ে যান দেড়কড়ি, যথা-নিয়মেই দ্যান, কিন্তু তার পরেই তাঁর চাল-চলন অনেকটা দাবাবোড়ের ধরন ধরে। তার মানে, একটা কিস্তি সামনে এলেই তিনি সামলে নেন, নড়বোড়ে কোন অজুহাত (অর্থাৎ কিনা, লেম এক্‌সকিউজ্‌) দিয়ে ঠেকান, কিংবা অন্য কোন দাবাই দিয়ে দ্যান। নিতান্ত না পারেন, পাশ কাটিয়ে কিস্তির মুখ থেকে সরে পড়েন!

এইভাবে ক'মাস ধরে কিস্তির সঙ্গে কেরামতির পর দেড়কড়ি একদিন আর পাশ কাটাতে পারেন না, পড়ে যান একেবারে এককড়ির সম্মুখেই।

'এই যে দেড়কড়িবাবু! পাত্তাই পাওয়া যায় না আপনার! ক'টা কিস্তি খেলাপ হল খেয়াল আছে কি?'

'আছে বই কি মশাই! আছে বলেই তো ছাতা আড়াল দিয়ে সরে পড়ছিলাম! আপনার না হয় চক্ষুলজ্জা বলে জিনিস নেই, কিন্তু আমাদের—এই অধমর্ণদের—'

'আরে, রেখে দিন আপনার রসিকতা! আসল না দিতে পারেন সুদটা তো মাসকে-মাস—'

'সুদের কথা আর তুলবেন না! শতকরা ছত্রিশ টাকা হার,—টাকার পাহাড় যে জমে গেল মশাই। এই আফগানী রেট কি কেউ শুধতে পারে কখনও? বলেন কি আপনি?'

'নেবার সময় ভাবা উচিত ছিল আপনার।' দৃষ্টিটাকে যারপরনাই রোষ-কষায়িত করবার চেষ্টা করেন এককড়ি।

'নেবার সময় তত ভাবিনি, তাহলে কি আর নিতে পারতুম? এখন দেবার সময় ভাবছি, ডবল করে ভেবে নিচ্ছি।' বলেন দেড়কড়ি: 'আর তাছাড়া হয়েছে কি, ক-মাসই বা বাকী পড়েছে বলুন? মাস পাঁচেক তো? মোটে পাঁচ মাস? তার কী হয়েছে আর? এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?'

'পাঁচ মাসের না দিতে পারেন একসঙ্গে, এক মাসেরটা তো দিন্ না হয়!' এককড়ি বহুৎ নরম হয়ে আসেন।

'এই তো বেশ কথা, ন্যায্য কথা, কথার মতো কথা! কত সুদ হয় এক মাসে? টাকা পনের? টাকা পনেরই তো? এমন আর বেশি কি? দিয়ে দিলেই হয়, দিয়ে দেওয়াই উচিত। দেয়াই তো যুক্তিসঙ্গত। নিন তবে—'

দেড়কড়ি পকেটে হাত দ্যান—নিজের পকেটে। দক্ষিণে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর বাঁ-পকেটে তাঁর হস্তক্ষেপ হয়, সেখানে ব্যর্থকাম হয়ে বুক পকেটে হাত ঢোকান, সেখানে খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে সোজা চলে যান ঘড়ির পকেটে। এককড়ির হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা—হাত বাড়িয়ে এবং দাঁত বাড়িয়ে।

অবশেষে বিস্তর অনুসন্ধানের পর একটি টাকা আবিষ্কৃত হয় ট্যাঁক থেকে। দেড়কড়ি সহাস্য হয়ে ওঠেন: 'বাজার করতে বেরিয়েছেন, এই তো? এই নিন টাকাটা, ভেট্‌কি মাছ কিনে বাড়ি চলে যান। এ-টাকাটা আর হিসাবের মধ্যে ধরবেন না, এ আপনাকে ভেট্ দিলাম মশাই, অমনিই দিলাম। নজরে পড়বার নজরানা। বাড়ি ফিরেই, বুঝেছেন কিনা, পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার পঞ্চদশ মুদ্রা, ছেলের হাত দিয়ে, কিছু ভাববেন না—হেঁ…হেঁ—!'

এককড়ি একমাত্র মুদ্রার দর্শনমাত্র দাঁত তো সংবরণ করেই ছিলেন, এবার টাকাটা হাতিয়ে অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করে চলে যান। বলে যান: 'হাঁ, পাঠিয়ে দেবেন এক্ষুনি, যেন আবার লোক পাঠাতে না হয় আমায়!'

তার পর, সেই যে দেড়কড়ি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন, আর দেখাই নেই তাঁর। লোক পাঠিয়ে, বালক পাঠিয়ে, নিতান্ত নাবালক-নিজেকে পাঠিয়ে, নাজেহাল্ হয়ে পড়লেন এককড়ি। এধারে তাঁর পাওনা সুদ জমে জমে ধারের আসলের সঙ্গে এক হয়ে পেল্লায় এক

পুঁজি হয়ে উঠল—হাজার টাকার কাছাকাছি প্রায়! হাত না ঝেড়েই পর্বত করে তুলল দেড়কড়ি।

এদিকে দেড়কড়ি কবিজনসুলভ উত্তরীয় নিলেন, শীতকালেও ছাতা মাথায় রাস্তায় বেরোন—এমনকি, দাড়ি-গোঁফ রাখবেন কিনা ভাবতে শুরু করেছেন—এর বেশি আর কী করতে পারেন তিনি? তবু চাদরে-ছাতায় না কুলোলে, ঝাঁকামুটের অন্তরাল নিয়েছেন, এককড়ি এ-ফুটপাথে এলে উনি নিঃশব্দে ও-ফুটপাথে চলে গেছেন, ট্রামের এক গাড়িতে টিকি দেখলে ঝাঁ করে গাড়ি বদলে ফেলেছেন, অবশেষে, তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে, একান্ত বাড়াবাড়ি দেখে বাড়িটাও বদলে ফেললেন! এর বেশি আর কতটা দাবি করা চলে তাঁর কাছে? এককড়িরই না হয় নেই, কিন্তু তাঁর তো চোখের চামড়া বলে যৎসামান্য কিছু আছে! তবু তিনি তো যৎপরোনাস্তি করলেন—আর কী করবেন?

তার পরে, তার বহুদিন বাদে, এককড়ি একা দেড়কড়িকে আবার পাকড়াও করলেন—পেল্লায় এক অদ্ভুত রকমে। প্রায় চূড়ামণি-যোগ আর কি! এককড়ি নামছেন ট্রাম থেকে, আর দেড়কড়ি উঠছেন সেই ট্রামেই। এককড়ির নামতে দ্বিধা হল, স্বভাবতঃই হল, নামতে-নামতে তিনি আর নামলেন না, অকস্মাৎ থামতে হল তাঁকে। এবং দেড়কড়ি ভাবলেন, তিনি উঠবেন কিনা, উঠবার কি বেশি তাড়া আছে—বিশেষ করে এই গাড়িতেই? এবম্বিধ অনিবার্য প্রশ্ন জাগল তাঁর মনে অকস্মাৎ।

তেমন কিছু জরুরী তাঁর বোধ হল না, উঠবার উৎসাহও দেখা গেল না বিশেষ, তিনি আত্মসম্বরণ করে নিলেন। অগত্যা এককড়িকেই নামতে হল এবং হঠাৎ কী একটা দারুণ প্রয়োজন মনে পড়ে যাওয়ায়, দেড়কড়ি উঠে পড়লেন সেই ট্রামেই। এককড়িকেও উঠতে হল ফের। অনিবার্যভাবেই, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

তারপর কিছুক্ষণ ধ'রে এককড়ি নামেন আর দেড়কড়ি ওঠেন, এবং এককড়ি ওঠেন আর দেড়কড়ি নামেন। অবশেষে গাড়িসুদ্ধ যাত্রী, মায় কণ্ডাক্টার সবাই মিলে ধরাধরি করে ওঁদের দুজনকেই একসঙ্গে নামিয়ে দিয়ে গেল রাস্তায়।

চোখ পাকিয়ে আর কতক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায়? এককড়িকেই কথা বলতে হয়: 'শেষটা কি আদালতেই যেতে হবে, এই চান?'

'আদালত!'

মজ্জমান ব্যক্তি কুটোর বদলে হঠাৎ গাধাবোট পেয়ে গেলে যেমন খুশী হয় তেমনি বিকশিত হয়ে ওঠেন দেড়কড়ি: 'ঠিক বলেছেন মশাই! আমিও ক'দিন থেকে ঐ কথাটাই ভাবছিলাম। আদালত ছাড়া আর গতি নেই আমাদের! হ্যাঁ!'

'বোধহয় ভুল করলাম জানিয়ে। ইন্সল্ভেন্সি নেবার মতলব ফেঁদেছেন বুঝি?' এককড়ি আশংকান্বিত।

'হাজার টাকার জন্যে দেউলে হব? কী যে বলেন আপনি।' একগাল হাসি দেড়কড়ির। 'হ্যাঁ, লাখ কি দেড় লাখ মারতে পারলে আমাদের পাড়ার বক্কেশ্বর বাবুর মত, সেরকম কিছু লক্ষ্যভেদ করতে পারলে তাহলে, হ্যাঁ, একটা কথা ছিল বটে! মানাত তাহলে।'

এককড়ি আশ্বস্ত হন যৎকিঞ্চিৎ: 'তেমন কোন দুরভিসন্ধি নেই তো তাহলে? জানেন ঠিক?'

'রামোঃ! আপনি নির্ঘাৎ নালিশ রুজু করতে পারেন, কালই করে দিন না!' বলেন দেড়কড়ি—'আদালতেই আমার সুবিধা।'

'ইন্স্টল্‌মেণ্ট পাবেন ভেবেছেন? পুরো টাকাটার ডিক্রি নেব মশাই, সুদে আসলে, পুরো হাজার টাকাই আদায় করব একসঙ্গে, তবে ছাড়ব আমি। আপনি বড্ড ভুগিয়েছেন আমায়!'

এই প্রথম, বহুদিন পরে, দেড়কড়ি চলে যান এককড়ির পাশ কাটিয়ে ছাতার আড়াল না দিয়ে এবং ছুতো না করে—অসংকোচে আর অকুতোভয়ে, বিনা-তীরবেগে এবং বীরদর্পে।

তার পর, আদালতেই দেখা হল দুজনের।

এককড়ি 'মরিয়া' হয়েই এসেছেন, কিস্তির কড়ারে কিছুতেই তিনি রাজী হবেন না, হাকিমের কাছে সেই রকমই তাঁর আর্জি। কিস্তি দিয়েই মাসের পর মাস ফের কুস্তি করবে কে? কড়ায়-গণ্ডায় পুরো পাওনাটি একসঙ্গে তাঁর বুঝে পাওয়া চাই; একেবারে তিনি নাছোড়বান্দা। এর জন্য যতটা কড়া হতে হয় যতখানি কড়াকড়ি করতে হয় এবং যতদূর লড়তে হয় তিনি প্রস্তুত।

দেখা গেল, দেড়কড়িও এ-বিষয়ে একমত, হুবহুব্। কিস্তির কড়ারে তিনিও ভীষণ গর্‌রাজি। দস্তুরমতোই নারাজ। হাকিমের বরাবর স্পষ্টই তিনি জানিয়ে দিলেন: 'সহজ কিস্তির আবেদন আমার একেবারেই নয় হুজুর!'

তাঁর সাফ্ কবুল।

'তা হলে কি একসঙ্গেই দিতে চান টাকাটা?' হাকিমের জিজ্ঞাস্য।

এককড়ির পুলকিত প্রতীক্ষা।

'আজ্ঞে, টাকা পরিশোধ আমার দ্বারা হবার নয়। আপনি ধরে বেঁধে জেলেই পাঠিয়ে দিন আমায়। এই আমার বিনীত অনুরোধ হুজুর।'

এককড়ির দাঁত কিড়মিড় করে। জেলে যাবে না হাতী! কেবল লেজে খেলছে দেড়কড়েটা!

দেড়কড়ির পুনশ্চ নিবেদন: 'হুজুর, জেলেই আমি যেতে চাই। জেলে পাঠিয়ে এইসব

বাঘা পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচান আপনি আমায়। কেবল দেখবেন, আমার বিহনে আমার কাচ্চাবাচ্চারা যেন না খেতে পেয়ে মারা না যায়। দয়া করে তার একটা ব্যবস্থা করবার হুকুম হোক হুজুরের।'

হাকিম বলেন: 'সেজন্যে তুমি ভেব না। সিভিল্ জেলে খোরপোষ এবং মাসহারা তুমি পাবে বই কি। ফরিয়াদীর কাছ থেকেই পাবে। মাসিক একশ' টাকা হলে কি চলবে তোমার?'

'কায়ক্লেশে।'

মুখ কাঁচুমাচু করে বলেন দেড়কড়ি: 'কষ্টে-স্বষ্টে চলতে পারে কোন রকমে। তবে এর বেশি আমার চাই নে হুজুর। এককড়ি বাবু আমার জন্যে অনেক স্বার্থত্যাগ করেছেন, আর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তাঁকে আমি করতে চাইনে।'

এককড়ি যখন নিজের উকিলের কাছ থেকে জানলেন যে, দেড়কড়িকে জেলে ঠেল্‌লে এই টাকার বরাদ্দটা তাঁকেই পোহাতে হবে, তখন প্রথম চোটে বেজায় রাগ হয়ে গেল তাঁর। চটেমটে বলেই ফেললেন তিনি: 'হাজার টাকা তো গেছেই, আরও দু'শ' যাক্, তবু ব্যাটাকে ঘানি টানিয়ে আমি ছাড়ব। দেড়কড়ের তেল বের করে তবে আমার শান্তি। ওকে যদি জব্দ না করতে পারি তো আমি সাতকড়ি দত্তর ছেলেই না।'

কিন্তু উকিল যখন জানালেন যে, ঘানি তো নয়ই, বরং তাঁরই টাকায় তোফা আরামে বাহাল-তবিয়তেই থাকবে দেড়কড়ি, তখন ভারী দমে গেলেন তিনি। কী যে করবেন ভেবেই পেলেন না! দারুণ একটা বৈরাগ্য, বীভৎস এক বিতৃষ্ণা ধাক্কা মারতে লাগল তাঁর বুকে। মানুষের মতিগতি, সংসারের গতিক-সতিক, বিচারকের নির্বিচার, সর্বোপরি নিজের জীবনের ওপর নিদারুণ এক ধিক্কার এসে গেল তাঁর। এই যদি লোকালয় হয় এর চেয়ে জঙ্গলই ভালো তবে। বাঘ-ভালুকরাই বেশি আপনার লোক। হ্যাঁ।

দেড়কড়ি বলেন: 'অগাধ দয়া হুজুরের, যদি অধীনের সামান্য আর একটা অনুরোধ রাখেন ঐ সঙ্গে! যদি জেলেরই হুকুম দ্যান—'

আদালতের সবাই উৎকর্ণ, এককড়িও উৎকণ্ঠ—আরও কী জেরবার আছে বরাতে কে জানে।

'যদি জেলেই পাঠান তবে ন'মাস ছ'মাস নয়, পাক্কা পাঁচ বছরের জন্যেই আমায় পাঠাবেন। তার কমে আমার পোষাবে না হুজুর!' দেড়কড়ি বলেন: 'ছাপোষা মানুষ আমি।'

শুনে আদালতের মাটিতেই বসে পড়েন এককড়ি, মাথায় হাত দিয়ে। এক-আধ টাকা নয়, হাজার-হাজার টাকা—নিজের এবং পরের রক্তজল-করা যত টাকা! অর্থ-বিয়োগের ধাক্কা প্রাণ-বিয়োগের মতোই মনে হয় তাঁর কাছে। নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়।

হাকিমের প্রশ্নের জবাব দিতে কোন রকমে তিনি দু'পায়ে দাঁড়ান: 'আসামীকে হুজুর, সহজ কিস্তির সুবিধা দিতে রাজী আছি আমি। মাসিক পঞ্চাশ টাকা হলে আমার আপত্তি নেই।'

দেড়কড়ি ঘাড় নাড়েন—'উঁহু। আমার আপত্তি আছে হুজুর। এক্কেবারে আমি তা পারব না।'

এককড়ি আরও কিছু নামেন: 'পঁচিশ টাকা?'

আধা-আধি নেমেও সাধাসাধি করতে নারাজ নন তিনি এখন।

'পেরে উঠব না হুজুর।' দেড়কড়ি বলেন: 'পারতে গেলে মারা পড়ব।' দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে দেড়কড়ির।

'পনের টাকা?'

'উঁহু। একদম্ না।'

'দশ টাকা? পাঁচ টাকা? মাসিক আড়াই টাকা, দেড় টাকা?'

দেড়কড়ির সেই 'উঁহু।' ভদ্রলোকের এক কথা যাকে বলে।

হাকিম তখন মাঝামাঝি পড়ে বলেন: 'আপসের মধ্যে মিটিয়ে ফ্যালো তোমরা। তুমিও কিছু ছেড়ে দাও এবং তুমিও কিছু ছাড়—দুজনকেই আমি তাই বলি।'

'হুজুরের কথায় আমি রাজী—এক্ষুনি রাজী—' বলেন এককড়ি, 'পাঁচ শ' টাকা আমি ছেড়ে দিচ্ছি, সুদের পাঁচ শ', এই দণ্ডে।'

খোদ্ আসলের পাঁচ শ' ফিরে পেলেই খোদা বলে তিনি বাড়ি চলে যান খুশী মনেই।

এককড়ির মহানুভবতায় দেড়কড়ির হৃদয়ে আঘাত লাগে, তাঁর চিত্ত বিগলিত হয়, নেত্র সজল হয়ে আসে। অশ্রুপ্লুতলোচনে তিনি অগ্রসর হন; আদালতের মধ্যেই জড়িয়ে ধরেন এককড়িকে। ভগ্নকণ্ঠে বলেন: 'এককড়িবাবু, আপনি এত উদার? এতই মহৎ আপনি? সত্যিই আপনি ছেড়ে দিলেন, অর্ধেকই ছেড়ে দিলেন? তবে আমিও অভদ্র নই, আপনার সদাশয়তার মর্যাদা আমি রাখব। হাকিমের হুকুমও অমান্য করব না। আমিও—বাকী অর্ধেক ছেড়ে দিলাম। আমিও পিছু-পা নই। আমিও দিলাম ছেড়ে আসলের পাঁচ শো।'

তার পরে ওঁরা দুজনেই জড়াজড়ি করে গড়াগড়ি যেতে লাগলেন—সেই আদালতেই।

গোবর্ধন। তাহলে খুরি করতে তুমি খুরাই করেছ যে।

হর্ষবর্ধন। তাই নাকি? তাই তো! নো স্যার 'নট্ আই', বাট্ 'ই'—ওনলি 'ই', স্যার।

সাহেব সেল্স্ম্যান। ব্রিং দি চেম্বার্স।

বাঙালী বাবু। (বেয়ারাকে ডাক দেন) বেয়ারা, চেম্বার্স লে আও।

বেয়ারা। জী হুজুর। (চেম্বার্স ডিক্সনারি লইয়া আসে)

গোবর্ধন। বাবা, কী মোটা বই একখান। ইংরেজি মহাভারত নাকি? তাই বোধহয়।

বাঙালী বাবু। মহাভারত নয়, অভিধান। ইংরেজি অভিধান, মশাই।

সাহেব সেল্স্ম্যান। (খস-খস করে পাতা ওলটান) কে-এইচ্-ইউ—কে-এইচ্-ইউ—ড্যাম্ ইওর খুরি! নাথিং অব্ দি কাইণ্ড ইজ হিয়ার! বাবু, টেক দেম টু মিঃ ম্যাকফারসন্। হি মাইট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।

[সেল্স্ম্যান সাহেবের প্রস্থান]

বাঙালী বাবু। এই বেয়ারা! বাবুলাগ্‌কো বড়া সাব্‌কো চেম্বারমে লে যাও।

[বাঙালী বাবুর প্রস্থান]

হর্ষবর্ধন। দু-জনেই চলে গেল দেখছি!

গোবর্ধন। বাবা, সাহেবটার কী আওয়াজ গো!

হর্ষবর্ধন। হবে না কেন? গরু খায় যে! গরুর আওয়াজটা কি কম? ডেকে দেখাব একবার? হা-হাম্—

গোবর্ধন। (দাদার মুখ চেপে ধরে) চুপ্, চুপ!

হর্ষবর্ধন। ব্-ব্-ব্-ব্-ব্!

গোবর্ধন। করছ কী? ধরে নিয়ে যাবে যে!

হর্ষবর্ধন। হুঁ, নিয়ে গেলেই হল! মাইরি আর কি!

গোবর্ধন। ভুল করে গরু মনে করে ধরতে পারে তো? তখন খেয়ে ফেলতে কতক্ষণ!

বেয়ারা। চলিয়ে, চেম্বারমে চলিয়ে।

হর্ষবর্ধন। চেম্বারমে? কেয়া বোল্তা হ্যায়?

গোবর্ধন। অ্যাঁ! কী বলছে, দাদা? অভিধানের মধ্যে যেতে বলছে নাকি আমাদের?

হর্ষবর্ধন। চেম্বারমে জানে হোগা?

বেয়ারা। জী হুজুর।

গোবর্ধন। (ভীত কণ্ঠে) আমাদের অভিধানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে নাকি দাদা!

হর্ষবর্ধন। হ্যাঃ! ঢোকালেই হল! কেমন করে ঢোকায় দেখাই যাক না একবার! এত বড় মানুষটাকে চেম্বারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে—অত সোজা না! আমরা কি জলছবি, যে লাগিয়ে দিলেই অভিধানের গায়ে গিয়ে সেঁটে যাব অমনি?

বেয়ারা। জারাসে ঠাহরিয়ে। মেমসাব আব্‌ ভিতর গিয়া। হিঁয়া বৈঠিয়ে আপলোগ। কল্‌ আনে সে হাম তুরন্ত লে-জায়ঙ্গে।

গোবর্ধন। (আরো সন্ত্রস্ত হয়) কলের মধ্যে নিয়ে পিষে ফেলবে না তো দাদা? অভিধানের কলের মধ্যে ফেল—?

হর্ষবর্ধন। হ্যাঁ! ফেললেই হল! পিষে দিলেই হল আর কী? ভারি পিসেমশাই এসেছেন। আমরা ঢুকতে যাব কেন কলে! আমরা কি ইঁদুর? ইঁদুররাই কেবল বোকার মতন কলের মধ্যে ঢোকে।

গোবর্ধন। দরোয়ানটার গোঁফজোড়া দেখেছ?

হর্ষবর্ধন। দেখেছি। কেন বল্‌ তো?

গোবর্ধন। যাকে বলে শিকারী বেড়াল! আর খুরি কিনে কাজ নেই দাদা, পালাই চল এখান থেকে! গতিক বড় সুবিধের নয়!

হর্ষবর্ধন। তুই ভারি ভীতু গোবরা! সবতাতেই তুই ভয় খাস। দরোয়ান—অভিধান—মেম, যা দেখিস তাতেই। ঐ সেই মেমটা আমাদের এদিকেই আবার আসছে যেন। আয়, আমার আড়ালে দাঁড়া।

গোবর্ধন। এলই বা! মেমকে আবার ভয় কিসের?

হর্ষবর্ধন। তাই তো কে বলে! মেমদের তো গোঁফও নেই দরোয়ানের মত, তবে আর ভয় কী? কিন্তু তুই যা ভয়-কাতুরে—তাই বলে কে?

(মেমের আগমন)

মেম সেলস্‌ম্যান। হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার বাবু?

হর্ষবর্ধন। (তটস্থ হয়ে) ইয়েস স্যার।

মেম। ডোণ্ট স্যার মি! সে—ম্যাডাম!

হর্ষবর্ধন। (আরো ঘাবড়ে গিয়ে) ইয়েস স্যার!

মেম। (দাবাড়ি দেয় এবার) সে—ম্যাডাম!

হর্ষবর্ধন। ইয়েস্‌ ড্যাম।

মেম। হু দি ডেভিল আর হউ? (বিরক্ত হয়ে মেমের প্রস্থান)

হর্ষবর্ধন। উঃ! মেম না একটা জগঝম্প! দোকানখানা যেন কাঁপিয়ে চলে গেল! বাঁচা গেল বাবা!

গোবর্ধন। তুমি ড্যাম বললে কিনা, মেমটা রাগ করে চলে গেল তাইতে। ড্যাম একটা গালাগালি যে! জান না?

হর্ষবর্ধন। আমাকে ম্যা-ড্যাম বলতে বলেছিল।

গোবর্ধন। বললেই পারতে!

হর্ষবর্ধন। হ্যাঁ, আমি ওকে মা বলতে যাই আর কি! খেয়ে দেয়ে কাজ নেই আমার! কেন! বলব কেন? আমার বাবা কি ওকে বিয়ে করতে গেছে সাতপুরুষে?

গোবর্ধন। মা কেন? ম্যা তো। ম্যা বলতে কী হয়েছে? তা বললে এমন কিছু ক্ষতি হত না।

হর্ষবর্ধন। মা-ও যা ম্যা-ও তাই—একই মানে। আমাদের ভাষায় যাকে মা বলি, ওদের ভাষায় তাকেই বলে ম্যা।

গোবর্ধন। না দাদা—তা নয়।

হর্ষবর্ধন। (খাপ্পা হন) ইংরিজির তুই কী জানিস? আমার চেয়ে বেশি জানিস তুই? তুই শেখাবি আমাকে? আমাকে আর শেখাতে হয় না ইংরিজি!

গোবর্ধন। কিন্তু চটে গেল তো মেমটা?

হর্ষবর্ধন। বয়েই গেল আমার! মেমসাহেব দেখে মোটেই ভয় খাইনে আমি! আমি কি তোর মতন কাপুরুষ? তোর মত মুখ্যুও নই!

গোবর্ধন। ছাগলরাও তো ম্যা বলে! তুমি কি বলতে চাও যে ছাগলও তাহলে সাহেব?

হর্ষবর্ধন। বেড়ালেও তো ম্যাও বলে, তবে কি তুই বলছিস বেড়ালরা সব ছাগল? তা নয় রে হাঁদা, তা নয়। যদি আমার মত অনেক ভাষা তুই জানতিস তাহলে আর ও কথা বলতিস না। ইতর প্রাণীদের ভাষার মধ্যে ও রকম মিল প্রায়ই থাকে। থেকেই যায়। না থেকে পারে না।

গোবর্ধন। ছাগলের ভাষায় আর সাহেবদের ভাষায় তোমার কিন্তু মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি দাদা!

হর্ষবর্ধন। কেন, গরমিলটা কী দেখলি?

গোবর্ধন। ছাগলের ভাষা শিখতে দেরি লাগে না; ইস্কুলে না গিয়ে, ঘরে বসেই শেখা যায়; কিন্তু সাহেবদের ভাষা কত শক্ত!

হর্ষবর্ধন। শক্ত না ছাই। তোর মত ছাগলের কাছেই শক্ত। আমার কাছে জল।

গোবর্ধন। (চটে যায় এবার) জল তো বলছ' তাহলে বল তো খুরির ইংরিজি।

হর্ষবর্ধন। কেন, বানান তো করেছি। কে-এচ্-ইউ—

গোবর্ধন। বানান করা আর ইংরিজি করা এক হল?

হর্ষবর্ধন। পারব না বুঝি ইংরিজি করতে? পারব না নাকি? এমন কী শক্ত করা শুনি? এক্ষুনি করে দিচ্ছি!

গোবর্ধন। কর আগে, দেখি তোমার বাহাদুরি!

হর্ষবর্ধন। (ভাবতে ভাবতে চিৎকার করে ওঠেন) পেয়েছি! পেয়েছি ইংরিজি!

গোবর্ধন। কী শুনি? (তার মুখে সন্দেহের হাসি)

হর্ষবর্ধন। পেয়েছি! মানে আরেকটু হলেই পেয়ে যাই! কথাটা পেটে এসেছে, মুখে এলেই হয়! মানুষের পিঠে সেই যে কি হয় বল্ তো, তাহলে এক্ষুনি আমি বলে দিচ্ছি।

গোবর্ধন। মানুষের পিঠে? কোন পিঠে?

হর্ষবর্ধন। কটা করে পিঠ মানুষের শুনি? আচ্ছা হাঁদা এক জুটেছে আমার কপালে!

গোবর্ধন। ও তাই বল, মানুষের অপর পিঠে। তাই বল!

হর্ষবর্ধন। বল্ না কী হয় পিঠে? সেই অপর পিঠে—তাই বল্ না।

গোবর্ধন। পিঠে তো চুল হয় না। কারু-কারু বুকে হাতে দেখেছি অবশ্যি।

হর্ষবর্ধন। যা হয় না তা কি আমি জিজ্ঞেস করেছি?

গোবর্ধন। পিঠে তবে কী হয়? শিরদাঁড়া?

হর্ষবর্ধন। শিরদাঁড়া! সে তো হয়েই আছে। নতুন করে আবার কী হবে? আচ্ছা, সেই যে, যা হলে পিঠ কেটে কেটে বাদ দিতে হয়, তবেই বাঁচে মানুষ, আবার প্রায়ই বাঁচে না?

গোবর্ধন। কুঁজ নাকি দাদা?

হর্ষবর্ধন। তোর মাথা! বাপ কি আর সাধে নাম দিয়েছিল গোবর্ধন! গোবরের খনি মাথায়!

গোবর্ধন। কেন, কুঁজই তো হয় পিঠে। কুঁজ ছাড়া আর কী হবে? তুমি কি বলতে চাও গোদ হবে পিঠে? না, তোমার গলগণ্ড হবে?

হর্ষবর্ধন। আহা, সেই যে সনাতন খুড়োর যা হয়েছিল একবার। জেলার ডাক্তার এসে অপারেশন করল শেষে?

গোবর্ধন। ও। সেই কার্বাঙ্কল?

হর্ষবর্ধন। হ্যাঁ—হ্যাঁ! কার্বাঙ্কল! এইবার পাওয়া গেছে! এইবার!—এবার কার্বাঙ্কল থেকে এল আঙ্কল। আঙ্কল মানে খুড়ো—তাহলে খুড়ি মানে কী? বল্ তো দেখি?

গোবর্ধন। আমি কী জানি? তুমিই তো বলবে।

হর্ষবর্ধন। আহা, আমিই তো বলব! তুই বলবি কোত্থেকে? তোর কি বিদ্যে আছে অত? তাহলে তো আমি তোর দাদা না হয়ে তুই-ই আমার দাদা হয়ে যেতিস! খুরির ইংরিজি হল আণ্ট। আণ্ট মানে—খুরি।

গোবর্ধন। জানতাম। তোমার আগেই জানতাম। অনেক আগেই—হুঁ। আণ্ট মানে পিঁপড়েও হয় আবার।

হর্ষবর্ধন। হয়ই তো। আণ্ট দু-রকমের—এক, পিঁপড়েরা, আর এক খুড়ি-জ্যেঠি। আমি বললুম বলেই জানলি, নইলে আর জানতে হত না। আমার জানা আছে খুব!

গোবর্ধন। আচ্ছা, বেশ। আণ্ট বানান কর তো দেখি!

হর্ষবর্ধন। কেন? সোজাই তো বানান! এ-এন্-টি আণ্ট। 'এ'-তে 'অ'-ও হয়, 'আ'-ও হয়। ইংরিজির মজাই তো ঐ।

গোবর্ধন। 'এ'-কারও হয় আবার।

হর্ষবর্ধন। আচ্ছা, সে না-হয় হল। খুরি তো পাওয়া গেল। এখন মাখন কলের ইংরিজি পেলেই হয়ে যায়—সাহেবকে বুঝিয়ে খুঁজে বার করাই জিনিসটা। জানিস ইংরিজি?

গোবর্ধন। মাখন কল? কলের ইংরিজি তো মিল্। যেমন, পেপার মিল্—

হর্ষবর্ধন। যা যাঃ, তোকে আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না! কলের ইংরিজি যে মিল্ সবাই তা জানে। যেমন, ফ্লাওয়ার মিল্—তার মানে ফুলের কল। এন্তার দেখাতে পারি পথে-ঘাটে। যেখানে-সেখানে—এই কলকাতারই, রাস্তাতেই কল টেপ্ আর জল খা। এইজন্যে ট্যাপ্,—কলও বলে কেউ-কেউ। কিন্তু, তা তো না, মাখনের ইংরিজি হল গিয়ে আসল! সেই মাখন আসছে কোত্থেকে?

গোবর্ধন। মাখন? মাখন—মাখন—মাখন···কী বলে গিয়ে—বাটার নয় তো দাদা?

হর্ষবর্ধন। বাটার? বাটার কেন হবে? বাট্—বাটার—বাটেস্ট। বাট্ মানে কিন্তু তাহলে বাটার মানে হওয়া উচিত কিন্তু-কিন্তু। অর্থাৎ, আরো বেশি কিন্তু। আমরা যেমন বলি না, যে লোকটা কিন্তু হয়ে গেল? তার ইংরিজি হবে, যে লোকটা বাটার মেরে গেল। তা ছাড়া আর কী?

গোবর্ধন। (ঘাড় নেড়ে) উঁহু! আমার বেশ মনে পড়ছে, বাটার মানেই মাখন। আর মাখন মানেই বাটার।

হর্ষবর্ধন। (সন্দিগ্ধ নেত্রে) জানিস ঠিক? ঠিক মনে আছে তোর?

গোবর্ধন। হুবহু।

হর্ষবর্ধন। বাট্—বাটার—বাটেস্ট। তাহলে বাট্ মানে হল কিন্তু, কিন্তু বাটার মানে মাখন—আর বাটেস্ট? বাটেস্ট মানে?

গোবর্ধন। কে জানে দাদা! তবে টেস্ট মানে তো চেখে দেখা, বাটেস্ট মানে মাখন চাখা নয় তো?

হর্ষবর্ধন। যাকগে, যেতে দে! বাটেস্টে কাজ কী আমাদের! বাটারই যথেষ্ট। মাখন চেখে আর কাজ নেই এখন। আর এই কি তোর মাখন চাখবার সময়? কোনরকমে এখন জিনিসটা কিনে নিয়ে ভালোয় ভালোয় ফিরে যেতে পারলেই বাঁচা যায়।

তারপর খুড়োর ঘাড় ভেঙে ঢের ঢের মাখন চাখা যাবে। তাহলে তুই বলছিস, মাখন কল মানে হল, বাটার মিল্। তাই তো?

গোবর্ধন। মিল্ আবার কবিতারও হয় দাদা! তবে কবিতার কলকারখানা হল গে আলাদা।

হর্ষবর্ধন। (ঈষৎ বিরক্ত হয়ে) তুই বড় বাজে বকিস গোবরা! কী মিল্ আনতে কী মিল আনছিস—কী সব এনে ফেলছিস্ বল্ তো? সব গুলিয়ে দিচ্ছিস একেবারে। তাহলে—তাহলে—কী দাঁড়াল আসলে? 'মাখন কলের খুরি' সটাং, 'আণ্ট অব এ বাটার মিল্—এই হয় না? তাহলে সাহেবকে গিয়ে এই কথাই বলা যাক—কেমন?

বেয়ারা। (এসে বললে) বড় সাব্ চেম্বারসে বাহার আতে হেঁ, সাহাব্‌নে যো কুছ্ পুছনা হ্যায় আভি পুছ্‌লিয়ে—ওহি আতে হেঁ— (বড় সাহেবের আগমন)

বড় সাহেব। হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট বাবু?

হর্ষবর্ধন। ইয়েস স্যার, উই ওয়াণ্ট সাম বাটার —নো নো, বাটার নট্—বাট্ বাটার অব্ মিল্—মিল্ অব্ আণ্ট—অ্যাণ্ড—আর কী বলা যায় রে গোবরা?

গোবর্ধন। অ্যাণ্ড—আণ্ট অব্ বাটার! ইট ইজ দ্যাট উই ওয়াণ্ট।

বড় সাহেব। হোয়াট—হোয়াট!

হর্ষবর্ধন। উঁহু! ঘুরিয়ে বললে হবে—বুঝতে পারছে না সাহেব। নো স্যার, উই ওয়াণ্ট —উই ওয়াণ্ট টু বাই—অব্ কোর্স,—দি থিং ইজ—বাটার অব্ আণ্ট, আণ্ট অব্ মিল—মিল অব্ বাটার—বাট্ উই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু রাটেস্ট ইট হিয়ার।

বড় সাহেব। কাণ্ট ফলো হোয়াট ইউ ফেলাজ ডু ওয়াণ্ট। চাপরাশি, সম্‌ঝো, বাবুলোগ্ কেয়া মাংতা। (সাহেব চলে গেলেন)

হর্ষবর্ধন। ইস্! দেখেছিস! কী হাঙ্গাম! ইংরিজি কী বিচ্ছিরি ভাষা, আর জিনিস কেনার কত ল্যাটা?

গোবর্ধন। বাজার করা সোজা নয় রে দাদা! বোঝানোই দায়! বোঝা আরো মুস্কিল! বোঝাতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়!

বেয়ারা। আপলোগ্ বাটার-কাপ মাংতে হেঁ কেয়া, নেই আউর দোসরা কুছ্? আপলোগ্ যিস্‌কো খুরি বোলতে হেঁ উসকোই কাপ বলতেঁ হেঁ সাহাব্ লোগ।

হর্ষবর্ধন। কাপ? কাপ কাহে? মাথামে জো পর্‌তা হায় উস্‌কোই তো কাপ বোলা যাতা। টুপি আউর কাপ এক্‌হি চিজ হায়—হায় কিনা?

বেয়ারা। ও ভি হো সক্‌তা—লেকিন—

মিহির। (শুনিয়াই লাফাইয়া উঠিল) কাদের এই করুণ আবেদন ? এই তিরিশ টাকার ? ঠিকানাটা বল তো ?

সুনীল। কাছেই তো রে ! এমন বেশি দূর নয়। এই শ্যামবাজারেই। পোস্ট-বক্সের নম্বর নয়, বাড়ির ঠিকানাটাই দিয়েছে কাগজে। এই ছাখ। (কাগজখানা দিল)

মিহির। (পড়িয়া তখনই উঠিয়া দাঁড়াইল) আমি চললাম এখুনি !

সুনীল। এমন ব্যস্ত কেন ? এত তাড়াতাড়ি কিসের ?

মিহির। না ভাই চট করে যাই। বাগিয়ে ফেলি গে আগে। কী জানি, এতক্ষণে হয়ত দেড় হাজার টিউটর গিয়ে ভিড়ে গেছে। ভিড় ঠেলে ঢুকতেই পারব কি না কে জানে !

সুনীল। তাহলে যা, আর দেরি করিস নে।

মিহির। এইরকমেরই একটা সুযোগ খুঁজছিলাম ভাই ! আপাতত এরকম একটা জুটলেও বেঁচে যাই ! খাওয়া-থাকাটা অমনিই হবে। তাছাড়া মাস-মাস ত্রিশ টাকা— কিছু কিছু বাড়িতেও পাঠাতে পারব। এম. এ.-টাও পড়া হবে। সেইসঙ্গে সিনেমা ফুটবল-ম্যাচ দেখার মত পকেট খরচারও অভাব হবে না।

সুনীল। তা, মন্দ কী নেহাত ?

মিহির। (ট্রাঙ্ক, খুলিয়া বি. এ. পাশের সার্টিফিকেটখানা বাহির করিল) এটাও নিয়ে যাই, কী বলিস ? এটা আমার বি. এ. পাশের সার্টিফিকেট—দেখতে চায় যদি !

সুনীল। না দেখতে চাইলেও গায়ে পড়ে দেখিয়ে দিবি, ছাড়িস নে। কিন্তু আমার একটা খটকা লাগছে মিহির। এই বিজ্ঞাপনটা এর আগেও যেন আমি দেখেছি। এই আনন্দবাজারেই দেখেছি। প্রায়ই যেন আমি দেখি এই বিজ্ঞাপনটা—বেশ মনে পড়ছে আমার।

মিহির। খুব সম্ভব ছেলেটি—ছাত্রটি একটি গবেট। প্রাইভেট টিউটর টিকতে পারে না তাই। বেতন ভারি দেখে এগোয় বটে, কিন্তু ছেলে আবার তার চেয়েও ভারি দেখে পিছিয়ে আসে।

সুনীল। তাই হবে হয়ত।

মিহির। আমি কিন্তু পেছোচ্ছি না বাবা ! প্রাণপণে ছেলেটিকে পড়াবো ; পড়াতে গিয়ে যদি পাগল হয়ে যেতে হয় তবুও। ত্রিশ টাকা কম টাকা নয় ! তার জন্যে গাধা পিটিয়ে মানুষ করা আর বেশী কী ! মানুষ পিটিয়েও গাধা বানানো যায়। ভদ্রলোক অতগুলো টাকা কি মাগনা দিচ্ছেন ?

(সুনীল এবং মিহির বাহির হইয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বাহিরের ঘরে বসিয়া মণ্টুর বাবা দৈনিক আনন্দবাজার দেখিতেছেন। মণ্টু প্রবেশ করিল)।

মণ্টু। বাবা, আমার নতুন মাস্টারমশায়...

মণ্টুর বাবা। এসেছেন? এসেছেন? যা নিয়ায় এখানে।

(মণ্টুর প্রস্থান ও মিহিরকে লইয়া পুনঃ-প্রবেশ)

মিহির। আজকের আনন্দবাজারে আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখেই আমি আসছি।

মণ্টুর বাবা। তা বেশ! বেশ তো! এসেছ ভালই করেছ।

মিহির। বছর-তিনেক হল আমি বি. এ. পাশ করেছি। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাটা দেখবেন একবার?

(সার্টিফিকেটখানা পকেট হইতে বাহির করিতে গেল)

মণ্টুর বাবা। থাক্ থাক্—সার্টিফিকেট দেখে কী হবে? ওসব তো মামুলি ব্যাপার। তার চেয়ে তোমার শরীরটা দেখি আগে। স্বাস্থ্যই হল গিয়ে আসল। স্বাস্থ্যই যার নেই সে আবার ছেলে কী পড়াবে? তোমাকেই দেখা আগে দরকার—তুমিই হচ্ছ তোমার সার্টিফিকেট।

মিহির। (আপ্যায়িত হইয়া) আজ্ঞে, যা বলেন আপনি—তা, আজ্ঞে, আমার স্বাস্থ্য নেহাত খারাপ নয়।

মণ্টুর বাবা। তোমার জামাটা একবার খোল তাহলে।

মিহির। (একটু ইতস্তত করে) জামাটা—খুলতে বলছেন?

মণ্টুর বাবা। দাঁড়াও, আমার চশমাটা নিয়ে আসি ও-ঘর থেকে। (প্রস্থান)

মিহির। তোমার বাবার খবর-কাগজ পড়তে চশমার দরকার হয় না, মাস্টার দেখবার বেলায়—

মণ্টু। আপনি জামা খুলতে ভয় পাচ্ছেন নাকি স্যার?

মিহির। না না, ভয় কিসের? ত্রিশ টাকার জন্যে জামা খোলা কেন, যদি জামাই হতে হয় তাতেও আমি রাজী।

(চশমা চোখে দিয়া মণ্টুর বাবার প্রবেশ—তিনি গম্ভীর মুখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিহিরকে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।)

মণ্টুর বাবা। তুমি একসারসাইজ কর?

মিহির। তা, করি একটু-আধটু।

মণ্টুর বাবা। বেশ বেশ। কিন্তু তাহলে তো (বেশ একটু যেন ভাবিতেই দেখা যায় তাঁকে)

মিহির। (ব্যায়ামের কথায় কর্তাকে ভাবিতে দেখিয়া) করতাম এক কালে, এখন আর করি না।

মণ্টুর বাবা। আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমায়—

মিহির। (উৎসুক আগ্রহে) আমার সার্টিফিকেট দেখতে চাইছেন তো? দেখুন না! (নিজের পকেটে হাত পুরিয়া) বি.এ.-তে আমি ডিস্টিংশন পেয়েছি। এই দেখুন—

মণ্টুর বাবা। না না, সার্টিফিকেট থাক।—তোমার ওজন কত?

মিহির। (আকাশ হইতে পড়িয়া) তা প্রায় দু-মণের কাছাকাছি।

মণ্টুর বাবা। বেশ বেশ, কিছুদিন তুমি টিকতে পারবে আশা হয়। কী বলিস মণ্টু, তোর এ মাস্টারমশাই কিছুদিন টিকে যাবেন, কী মনে হয় তোর?

মণ্টু। হ্যাঁ বাবা। এ মাস্টারমশায়ের গায়ে অনেক রক্ত।

মণ্টুর বাবা। কিছুদিন টেকা ভাল। খুবই ভাল। বেশ সুখের কথাই। কিন্তু বেশ কিছুদিন টেকাটাই হল খারাপ। সেইটাই আশঙ্কার। যাক, সবই তো ভগবানের হাত—

মণ্টু। (বাধা দিয়া) ভগবানের নয় বাবা, ছারপোকার—

মণ্টু বাবা। চুপ্! কথার ওপর কথা কস্ কেন? এত বয়স হল, কিচ্ছু বুদ্ধিসুদ্ধি হল না তোর! হ্যাঁ, দেখ বাপু, পড়াশুনোর সঙ্গে একটু এটিকেটও শেখাতে হবে ওকে। পিতামাতা গুরুজনদের উপর কথা বলা, অতিরিক্ত হাসা—এইসব মহৎ দোষ সারাতে হবে ওর। বেশ, আজ থেকেই তাহলে তুমি ভর্তি হলে। ত্রিশ টাকাই বেতন হল, মাসের পয়লা তারিখেই বেতন পাবে; কিন্তু একটা শর্ত আছে। পুরো এক মাস না পড়ালে, এমনকি এক দিন কম হলেও একটা টাকাও তুমি পাবে না।

মিহির। যে আজ্ঞে।

মণ্টুর বাবা। পাঁচ দশদিন পড়িয়ে অনেক প্রাইভেট টিউটর চলে গেছে। সেরকম হলে আমি বেতন দিতে পারি না, সে কথা কিন্তু আমি আগেই বলে রাখছি।

মণ্টু। কেবল একজন, বাবা, ঊনত্রিশ দিন পর্যন্ত ছিলেন। না বাবা? আরেকটা দিন কোনরকমে যদি থাকতে পারতেন, তাহলে…কিন্তু কিছুতেই পারলেন না।

মণ্টুর বাবা। থাম! থাম তুই! সবই ভগবানের লীলা!

মণ্টু। ভগবানের নয় বাবা—ছার—

মণ্টুর বাবা। চুপ কর্ !—তা তোমার জিনিসপত্র সব নিয়ে এস গে। আজ সন্ধে থেকেই ওকে পড়াবে। মণ্টু ছোট্টুলালকে ডাক্ !

মণ্টু। ছোট্টুলাল ! ও ছোট্টুলাল ! ওহে বাবু ছোট্টুলাল !

ছোট্টুলাল। (আসিয়া) হামাকে বোলাচ্ছেন মালিক ?

মণ্টুর বাবা। তা একটু বোলাচ্ছি বই কি ! তুমি এতক্ষণ কী করছিলে ? বাজারের পয়সা ফাঁক করে আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছিলে বুঝি ?

ছোট্টুলাল। হামি কেন বোলাতে যাব হুজুর ? হামি কি হাপনাকে বোলাতে পারি ?

মণ্টুর বাবা। তা কেন বোলাবে ? তা না-হয় না বোলাবে। এখন যাও তো, মণ্টুর এই নতুন মাস্টারবাবুকে তার ঘরটা দেখিয়ে দাওগে। শোবার ঘরটা। বুঝেছ, বেতন-নিবারকে—বেতন নিবারকে, বুঝেছ তো ?

ছোট্টুলাল। বেতন নিবার্ক্ ? বুঝেছি হুজুর আর বলতে হোবে না।

মণ্টুর বাবা। যাও, বেতন-নিবারকে মাস্টারমশায়ের বিছানাটা পেতে দাও গে।

তৃতীয় দৃশ্য

মণ্টুদের বাড়িতে মিহিরের শোবার ঘর

(ঘরের একধারে একখানা খাট, তাতেই মিহিরের শোবার বিছানা। চমৎকার গদি দেওয়া, তার উপর তোশক, তার উপরে ধবধবে সদ্য-পাট-ভাঙা বোম্বাই চাদর। ঘরের একধারে একটা ড্রেসিং টেবিল—পুরনো, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। একটা বুক-কেসও আছে এই কোণে,—তার উপর বই-টই সাজানো। আরেক ধারে পড়াশোনার টেবিল, তার দু-পাশে দুটো চেয়ার। ঘরের মধ্যে মিহির একা। দেয়াল-ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে আটটা।)

মিহির। অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! সত্যি ভারি অদ্ভুত ! এই ত্রিশটি টাকা। মাস গেলেই এই ত্রিশ টাকা পাওয়া ! মাসের পয়লা তারিখেই পেয়ে যাওয়া ! সত্যি ভারি বিস্ময়কর ! অ্যাদ্দিন তো মাস গেলে টাকা দিয়ে এসেছি, দিয়েই এসেছি চিরকাল—একগোছা করে টাকা—মাস কাবার মানে আমি সাবাড় ! কিন্তু এবার, এই প্রথম, জীবনে এই প্রথম আমি নিজে টাকা পাব ! মাস গেলেই পেয়ে যাব ! মাসের ঠিক পয়লা তারিখেই—বাঃ ! বাহোবা !

(জিনিসপত্রের টুকিটাকি সাজাইতে গোছাইতে লাগিল)

ঘরখানিও দিয়েছে বেশ ! কেমন সাজানো গোছানো পরিপাটি ঘর একখান ? চমৎকার ! ড্রেসিং টেবিলটা পুরনো বটে কিন্তু পরিষ্কার। একটা বুক-কেসও দিয়েছে আবার—এতেই আমার বই-টই সব থাকবে।

(সেই বুক-কেসে নিজের বইগুলি সাজাইতে লাগিল)

আর টেবিলের ধারে, এই চেয়ারটিতে বসে, হেলান দিয়ে দিব্যি আরামে আমি পড়াবো। বাঃ! বা রে!

(টেবিলে পা তুলিয়া দিয়া চেয়ারটায় একবার বসিয়া লইল)

আর ঐ খাটখানাই কী খাসা! কী চমৎকার গদি! তার উপরে তোশক—তার উপরে ধবধবে বোম্বাই চাদর বিছানো! কী তোফা বিছানা একখান। সোনায় সোহাগা—গোদের উপর বিষফোড় যেন রে! সত্যি ভারি ভদ্রলোক এরা—অতিশয় ভদ্রলোক! না, ভদ্রলোক নয়, কেবল ভদ্র বললে এদের অপমান করা হয়, এদের মানহানি হয়ে যায়—মহৎ—অত্যন্ত মহৎ—অতীধ সদাশয়!

জীবনে কখনো গদিমোড়া খাটে গড়াই নি! এই ফাঁকে একটু শুয়ে নেয়া যাক। সাড়ে আটটা বাজতে চলল, মণ্টু পড়তে আসছে না কেন? এখনও কি খেলা-ধূলো করে ফেরে নি নাকি? না আজ প্রথম দিনটায় পড়তে বসবে না? যাক, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার কী—এখন খাটটায় একটু গড়িয়ে নি—গড়াগড়ি দিয়ে নি খানিক! একটু লম্বা হয়ে নি আগে!

(বিছানায় গিয়া শুইয়া—এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল)

আঃ, কী নরম! কী উপাদেয়! আজ খুব আরামে ঘুমোনো যাবে! খেয়ে দেয়ে, আহারাদির হাঙ্গাম চুকিয়েই এসেছি—এখন মণ্টুটা এলে হয়। আজ আর বেশি পড়ানো নয়, একটু নমো নমো পড়িয়েই ভাগিয়ে দেব—তারপর ঘুম! তোফা একখানা ঘুম! সেই কাল সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত!

(মণ্টু বই-পত্র নিয়া ঢুকিল)

মিহির। এস, এই খাটে বসেই পড়াই তোমায়।

মণ্টু। না স্যার, আমি ও-খাটে বসব না!

মিহির। (বিস্মিত হইয়া) কেন, এমন খাট! এমন—

মণ্টু। (আমতা আমতা করিয়া) না, সেজন্যে নয়—আপনি মাস্টারমশাই, গুরুজন, আপনার বিছানায় কি পা ঠেকাতে আছে আমার? বাবা বারণ করেছেন।

মিহির। ওঃ, তাই? তাই বুঝি? তাহলে চল চেয়ারেই বসি গে।

(ক্ষুণ্ণমনে খাট ছাড়িয়া চেয়ারে গিয়া বসিল)

কিন্তু যাই বল, বেশ বিছানাটি কিন্তু তোমাদের! ভারি নরম! বেশ

আরাম হবে ঘুমিয়ে। কই, দেখি তোমার বই। (বই লইয়া) Beans মানে জান ?

মণ্টু। (ঘাড় নাড়িয়া) না।

মিহির। Beans মানে বরবটি। বরবটি একরকমের সব্জি—তার তরকারি হয়। আমরা খাই। Beans দিয়ে সেনটেন্স কর দেখি ! পারবে ?

মণ্টু। (ঘাড় নাড়িয়া জানাইল) হ্যাঁ। (তারপর অনেক ভাবিয়া এবং আপন মনে অনেক ঘাড় নাড়িয়া) I had been there.

মিহির। (অত্যন্ত অবাক) সেকি ? সে আবার কী ? উঃ, এতক্ষণে বুঝতে পারছি, কেন তোমার মাস্টার টিকতে পারে না ! কেন সবাই দুদ্দাড় করে পালিয়ে যায় ! আচ্ছা, এই যে সেনটেন্সটা করলে, এর মানে কী হল ?

মণ্টু। (সেও কম বিস্মিত নয়) মানে ? কেন, এর মানে তো খুব সোজা ! আপনি বুঝতে পারছেন না ? এর মানে হচ্ছে, সেখানে আমার বরবটি ছিল। আই হ্যাড বীন দেয়ার—আমার ছিল বরবটি সেখানে—সেইটাই ঘুরিয়ে ভাল বাংলায় হল—সেখানে আমার—

মিহির। থাম থাম, আর ভাল করে বোঝাতে হবে না তোমায় ! আই হ্যাড বীন দেয়ার মানে আমি সেখানে ছিলাম। বুঝেছ ?

মণ্টু। (আকাশ হইতে পড়িয়া) তবে যে আপনি বললেন বীন মানে বরবটি ? তাহলে আমি সেখানে বরবটি ? তাহলে আমি সেখানে বরবটি ছিলাম বলুন !

মিহির। (সন্দিগ্ধভাবে) খুব সম্ভব তা-ই ছিলে তুমি। Been আর beans কি এক হল ? একটা বি, ডবল্-ই, এন—আরেকটা বি. ই. এ. এন। বানানের তফাতটা দেখছ না ? এ been হল be ধাতুর form—

মণ্টু। (বাধা দিয়া) হ্যাঁ বুঝেছি বুঝেছি স্যার—আর বলতে হবে না আমাকে ! অর্থাৎ কি না, এ beens হল মৌমাছির চেহারা। বী মানে মৌমাছি, আর ফর্ম মানে চেহারা। আমি জানি।

মিহির। জান তুমি ? (বিস্ময়ে হতবাক)।

মণ্টু। এই আজ সকালেই জেনেছি। আপনি তখন চলে গেলে বাবা বললেন কিনা, তোর নতুন মাস্টারমশায়ের বেশ ফর্ম—তখনই জেনে নিলাম।

মিহির। আমার চেহারা মৌমাছির মত ? জানতাম না তো ? কিন্তু সে কথা যাক। যে beans মানে বরবটি তা দিয়ে সেনটেন্স হবে এই রকম—Peasants grow beans, অর্থাৎ চাষীরা বরবটি ফলায়। অর্থাৎ, চাষীরা বরবটি উৎপন্ন করে, বরবটির চাষ করে। বুঝলে ?

মণ্টু। (ভয়ানকভাবে ঘাড় নাড়ে) বুঝেছি!

মিহির। অমন করে ঘাড় নেড়ো না, ভেঙে যেতে পারে। তোমার তো আর মৌমাছির চেহারা নয় আমার মত! বুঝেছ যদি, এইরকম আর-একটা সেনটেন্স বল তো দেখি beans দিয়ে?

(মণ্টুর অনেকক্ষণ ধরিয়া মুখ নড়ে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বিশেষ কিছুই বার হয় না)

মিহির। (হতাশ হইয়া) পারলে না? এই ধর যেমন, Our cook cooks beans, আমাদের ঠাকুর বরবটি রাঁধে। এখানে তুমি cook কথাটার দু-রকম ইউজ পাচ্ছ, একটা নাউন, আরেকটা ভার্ব। আরেকটা সেনটেন্স কর দেখি!

মণ্টু। By hook or crook.

মিহির। তার মানে?

মণ্টু। তার মানে? (একটু ভেবে) তার মানে আমি বলতে পারব না—আপনি cook দিয়ে একটা সেনটেন্স করতে বললেন যে! তাই তো করলাম! করে দিলাম তাই তো!

মিহির। করে দিলে By hook or crook?

মণ্টু। যদি আপনি মানে জানতে চান তো বাবাকে জিজ্ঞাসা করে আসতে পারি। বাবা প্রায়ই বলেন কথাটা। জেনে আসব?

মিহির। আমি তোমাকে beans দিয়ে সেনটেন্স করতে বললাম না?

মণ্টু। ও! বীন্স্ দিয়ে? বীন্স্! তা বললেই হয়! এ তো খুব সোজা,—কত সোজা আরো। বীন্স্ দিয়ে? তাই বলছেন? বীন্স্—বীন্স্—এই যে! বলে দিচ্ছি! দাঁড়ান! We are all human beans.

মিহির। অ্যাঁ, বল কী! আমরা সবাই মানুষ-বরবটি! তাই নাকি হে?

মণ্টু। কেন, বাবাকে যে অনেকবার বলতে শুনেছি যে আমরা হিউম্যান বীন্স্!

মিহির। ওঃ এখন বুঝতে পারছি—

মণ্টু। কী বুঝতে পারছেন স্যার?

মিহির। বুঝতে পারছি কেন তোমার মাস্টাররা টেকে না। কেন তারা ফাঁক পেলেই পালিয়ে যায়!

মণ্টু। কেন স্যার? বলুন না স্যার?

মিহির। কেন আর! দিনের পর দিন—মাসের পর মাস তোমাকেই এই পড়াতে হবে তো? কী করে তাহলে টিকবে? পড়াতে আসা—কুস্তি করতে তো আসা নয়!

মণ্টু। উঁহু, সেজন্যে নয়—সেজন্যে তারা পালায় না।

মিহির। রোজ দু-বেলা যদি এরকম ধস্তাধস্তি করে পড়াতে হয় তাহলেই তো আমি গেছি! তাহলে আমাকেও পালাতে হবে দেখছি।

মণ্টু। আপনি—আপনিও পালাবেন?

মিহির। পালাব না তো কী করব? পড়ে পড়ে তোমার মার খাব নাকি? তাহলে আমিও টিউশানির মায়া ছেড়ে, মাসের পয়লা তারিখের প্রলোভন ত্যাগ করে, এমনকি, তোমাদের অমন নরম গদির মায়া কাটিয়ে—

মণ্টু। নরম গদি! যা বলেছেন স্যার! মারাত্মক গদি! গদাও বলতে পারেন! বাবা তো গদা-ই বলেন!

মিহির। নাঃ, সেটি হচ্ছে না! কিছুতেই পালাচ্ছি নে! সে তুমি দেখে নিয়ো! একজন অবশ্যি ঊনত্রিশ দিন পর্যন্ত টিকেছিল—আর একদিন টিকতে পারলেই ত্রিশ টাকা পেয়ে যেত। ত্রিশ-ত্রিশটা টাকা পেত, কিন্তু একটি দিনের জন্যে এক টাকাও পেল না। বেচারি! বোধহয় তার পাগল হতেই বাকি ছিল কেবল—

মণ্টু। হ্যাঁ স্যার, পাগল হয়ে যাবার ভয়েই পালিয়েছে।

মিহির। আর একটা দিন পড়াতে হলেই পাগল হয়ে যেত! কিংবা পাগল হয়েই পালিয়ে গেছে কি না তাই বা কে জানে!

মণ্টু। তাও হতে পারে।

মিহির। তাই সম্ভব। নইলে ত্রিশ-ত্রিশটা টাকা কোন সুস্থ মানুষ ছেড়ে যায় কখনো?

মণ্টু। ছাড়তে পারে? আপনিই বলুন না।

মিহির। বলব কী! ভাবতেও আমার বুক কাঁপছে! হৃৎকম্প হচ্ছে আমার··· কী সর্বনাশ!···

মণ্টু। কিন্তু কেন পালায় জানেন? বলব? আমাকে পড়াবার জন্যে নয়; সেজন্যে নয় মোটেই। গদাঘাত সহ্য করতে পারে না বলেই পালায়!

মিহির। গদাঘাতই বটে! একখানি গদা-ই বটে তুমি। পড়াশুনোর গদাই লস্কর! আমি কিন্তু বাপু চাকরিও ছাড়ব না, পাগলও হব না, সে তুমি ঠিক জেনে রেখো। সে তুমি যাই বল, পালাচ্ছিনে আমি। আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যা খুশি পড়ো, পড়ো চাই নাই পড়ো—বোঝ ভাল, বা না-ই বোঝ—আমি কেবল বই খুলে পড়িয়ে যাব—এইমাত্র। তোমায় নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবো না। আর মাথাই যদি না ঘামাই, পাগল হব কী করে?

মণ্টু। হবেন, হবেন, ভয় নেই। হতেই হবে। পাগল না হয়ে আপনি পারবেন না। যা একখানা বেতন-নিবারক রয়েছে! না, আমি বলব না! বললে বাবা আমায় মারবে!

(মণ্টুর রহস্যময় হাসি)

মিহির। নাঃ, আমার কোন ভয় নেই। নির্বিকারভাবে আমি পড়িয়ে যাব।

মণ্টু। (হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে) আচ্ছা, বলুন তো স্যার,—বলব? একটা কথা জিগ্যেস করব আপনাকে?

মিহির। কর, আমি তো নির্বিকার—নিরাসক্ত—নিস্পৃহ!

মণ্টু। বেতন-নিবারক বিছানা। এর ইংরিজি কী হবে স্যার—জানেন?

মিহির। বেতন-নিবারক বিছানা! সে আবার কী?

মণ্টু। সে একটা জিনিস। বলুন না স্যার, ইংরিজিটা জেনে রাখা দরকার।

মিহির। ওরবম কোন জিনিস হতেই পারে না।

মণ্টু। হতে পারে না কি, হয়ে রয়েছে! আপনি জানেন না তাহলে ওর ইংরিজি! সে কথা বলুন!

মিহির। ওর ইংরিজি হবে 'পে-সেভিং বেড্' (pay-saving bed)।

মণ্টু। (সন্দিগ্ধভাবে) উঁহু, হল না। হল না বোধহয়। সেভিং মানে তো কামানো। ছোট্টুলাল আমাদের চাকর, সে রোজ কামায়। বেতন-নিবারকে শোয় না তো সে! তাকে অনেকবার বলা হয়েছে—কিন্তু কিছুতেই সে শোয় না। এইজন্যেই তো এ-চাকরটা টিকে গেল আমাদের। বাবা ভারি দুঃখ করেন তাই।

মিহির। কী সব হেঁয়ালি বকছ? তোমারও মাথা খারাপ নাকি? কেন, তোমাকে তো কাউকে পড়াতে হয় না—তোমার নিজেকে তো না-ই; তবে? তবে কেন?

মণ্টু। আমার মাথা খারাপ? হাঃ হাঃ হাঃ! আমি কি বেতন-নিবারকে শুই? বেতন-নিবারকে! হাঃ হাঃ হাঃ!

মিহির। নাঃ কিছু ভাবব না। তোমার মাথা খারাপ হোক চাই না-ই হোক, প্রতিজ্ঞাই করেছি, মোটেই আর মাথা ঘামাব না তোমার ব্যাপারে। একবার ঘামাতে আরম্ভ করলে তখন আর থামাতে পারব না—পাগল হয়ে যাব নির্ঘাত! একজন উনত্রিশ দিন পর্যন্ত টিকে ছিল—আর একদিন টিকলেই—উঃ করকরে ত্রিশ টাকা—

মণ্টু। ঠন্ঠনে তিরিশ!—মানে, ঠনাঠ্ঠন বাজিয়ে নিন!

মিহির। যাও, শুতে যাও। আর পড়ানো নয়। অনেক পড়ানো গেল আজ। মাথা ঘেমে গেল। মাথা কেন সারা গা-ই ঘেমে গেছে! আজ এই অব্দি থাক। যাও ঘুমোও গে।

মণ্টু। আপনিও ঘুমোন স্যার তাহলে। (বইপত্র লইয়া প্রস্থান)

মিহির। হ্যাঁ, ঘুমোব বই কি! ঘুমোতেই তো হবে! তোফা একখানা ঘুম দিতে হবে ওখন—চমৎকার এই নরম গদির বিছানায়। দু-দু-বার আজ বৌবাজার আর বাগবাজার—কালীঘাট আর শ্যামবাজার করতে হয়েছে—অনেক হাঁটা-চলা গেছে—ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে! শুইগে!

(আলো নিভাইয়া বিছানায় গিয়া আশ্রয় লইল)

আঃ কী নরম!

(মিনিটখানেক চুপচাপ—তারপরেই ভয়ঙ্কর এক আর্তনাদ শোনা গেল মিহিরের—মিহির তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া ঝটপট আলো জ্বালিল)

অ্যাঁ, কিসে কামড়ালো আমায়? সারা গায়ে হাজার হাজার ছুঁচ ফুটিয়ে দিল একসঙ্গে! কী ব্যাপার?

(আলো লইয়া বিছানার নিকটে গেল)

ও-বাবা! ছারপোকা! সর্বনাশ! এ যে কাতারে কাতারে ছারপোকা—সারা বিছানাতেই! হাজার হাজার লাখ লাখ—গুনে শেষ করা যায় না! ছারপোকাই কেবল! (বিছানা তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল।)

অ্যাঁ, ধবধবে চাদরের তলায় এ কী ভয়াবহ আদর! নরম গদির ছলনায় এ কী নিষ্ঠুর গদাঘাত! বাঃ, আলো দেখে পালাতে শুরু করেছে। কুচকাওয়াজ করে চলে যাচ্ছে সব—আধুনিক সৈন্যবাহিনীর মতই মার্চ করে যাচ্ছে! যুদ্ধের কায়দাকানুন সব এদের জানা দেখছি! (দু-একটা মারিল)

কী হবে? এ কি আর মেরে শেষ করা যাবে? সমস্ত রাত ধরে যদি ছারপোকাই মারব তাহলে আর ঘুমোব কখন? নাঃ, চেয়ারে বসেই কাটাতে হল আজ রাতটা। আর আলো? না, আলো জ্বালিয়েই রাখতে হবে। নিভোলে, কী জানি, যদি চেয়ারে এসে আমাকে আক্রমণ করে? যে-রকম এরা লড়ুয়ে, বলা তো যায় না। (চেয়ারে গিয়া বসিয়া ভীতিবিহ্বল মুখে বিছানার দিকে চাহিয়া রহিল)

উঃ, এতক্ষণে বেতন-নিবারক বিছানার মানে বুঝলাম। বুঝতে পারছি কেন মাস্টারেরা টেঁকে না। ও বাবা, কেবল ছাত্রই নয়, ছারপোকাও রয়েছে তার ওপর! ঘরে বাইরে যুদ্ধ করে একটা লোক

পারবে কেন? সামান্য একজন গ্রাজুয়েট বই তো নয়। তবু সে ভদ্রলোক উনত্রিশ দিন যুঝেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও পারলেন না—পাততাড়ি গুটিয়ে পালাতে হল তাঁকে। অ্যানিমিয়া নিয়ে নিমতলার দিকেই কেটে পড়েছেন কি না কে জানে! ত্রিশ টাকা মাইনের মাস্টার রেখে বেতন না দিয়েই ছেলে পড়ানো—মাসের পর মাস মাস্টার বদলে—ইস্, আবদার কম নয়! নাঃ, ভদ্রলোক কেবল উদার আর মহৎ নন, বেশ রসিকও দেখছি! দারুণ রসিক!

চতুর্থ দৃশ্য

পরদিন সকাল। মণ্টুদের বৈঠকখানা। মণ্টু বসিয়া আছে

(মিহির প্রবেশ করিল)

মণ্টুর বাবা। এই যে বাপু, কেমন ঘুম হল কাল রাত্রে?

মিহির। তোফা! অমন বিছানায় ঘুম হবে না, বলেন কী আপনি?

মণ্টুর বাবা। (অবাক হইয়া) বেশ বেশ, ঘুম হলেই ভাল! জীবনের বিশ্রামই হল গিয়ে ঘুম। তা, তোমার ঘুম বোধহয় একটু বেশি জমাট? বেশ একটু জমাট?

মিহির। আজ্ঞে, সে-কথা আর বলবেন না। একবার আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাশের বাড়ি চলে গেছলাম—কিন্তু টের পাইনি একদম।

মণ্টুর বাবা। বল কী হে?

মিহির। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের বাড়ি বর্ধমান কিনা! শুনেছেন বোধহয় সেখানে বেজায় মশা—মশারি না খাটিয়ে শোবার জো নেই। একদিন পাশের বাড়িতে কি যেন দরকারে ডেকেছিল আমায়, কিন্তু ভুলে গেছলাম কথাটা। যখন শুতে যাচ্ছি তখন মনে পড়ল, কিন্তু তখন রাত হয়ে গেছে অনেক, অত রাত্রে কে যায়, আর দরজা-টরজা বন্ধ করে তারা সব শুয়ে পড়েছে তখন। আমি করলুম কি সেদিন আর মশারি খাটালুম না। পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল তখন দেখি পাশের বাড়িতেই আমি শুয়ে।

মণ্টুর বাবা। (দারুণ বিস্মিত) কী রকম? সে আবার কী রকম?

মিহির। মশায় টেনে নিয়ে গেছল মশাই! সেইজন্যেই তো রাত্রে মশারি খাটাই নি! অনায়াসে পাশের বাড়ি যাবার ঐটেই সহজ উপায় কিনা সেখানে!

মণ্টুর বাবা। (শুনে মুষড়ে পড়লেন) মশাতেই যখন কিছু করতে পারে নি তখন আর কিসে কী করবে তোমায়! তুমি দেখছি টিকেই গেলে।

মিহির। আমার কিন্তু একটা নিবেদন আছে মশাই! কয়েকটা টাকা আমার বেতনের থেকে আগাম দিতে হবে আমাকে! ছারপোকার অর্ডার দেব!

মণ্টু। ছারপোকা ?

মণ্টুর বাবা। ছারপোকার অর্ডার ? কেন ? সে আবার কী জন্যে ?

মিহির। ও, আপনি জানেন না বুঝি ? ছারপোকার মত এমন মস্তিষ্কের উপকারী, মেমারি বাড়ানোর মহৌষধ আর দুটি নেই। বিলেতে, ইয়ে রীতিমত ছারপোকার চাষ হয় এইজন্যে গাধা ছেলে সব দেশেই তো আছে, কাজে লাগে তাদের।

মণ্টুর বাবা। (সাগ্রহে) কী রকম ? কী রকম ? বিলেতে ছারপোকার চাষ হয় ? দাম দিয়ে কেনে লোক ? আমদানি রপ্তানি হয়, তুমি জানো ? আমি বেচতে পারি, হুম্—হাজার হাজার, লাখ লাখ—যত চাও !

মিহির। বেচুন না! আমিই কিনে নেব। আমার নিজের কাজে লাগবে। ছারপোকার রক্ত ব্রেনের পক্ষে ভারি উপকারী। এক একটা ছারপোকা ধরে নিয়ে এমনি করে মাথায় টিপে মারতে হয়। এইরকম হাজার হাজার …লাখ-লাখ ছারপোকার রক্তে এক ছটাক ব্রেন। বি. এ. পাশের সময়ে আমি নিজেই পরীক্ষা করে দেখেছি। সারা বছর ফাঁকি দিয়েছি, ফেল না হয়ে আর যাইনে। এমন সময়ে বিলিতি এক কাগজে ছারপোকার উপকারিতা পড়া গেল—

মণ্টুর বাবা। বিলিতি কাগজে ?

মিহির। বিলিতি কাগজেই তো। অমনি সমস্ত মেস খুঁজে সবার বিছানা তন্ন-তন্ন করে যেখানে যা ছারপোকা ছিল সব সদ্ব্যবহার করলুম ! পরীক্ষা দেবার তখন মাত্র তিন দিন বাকি, তারপর ফল যা পেলুম নিজের চোখেই দেখুন না ! আমার কাছেই আছে—বি. এ, পাশ করলুম উইথ্ ডিসটিংশন (বুক-পকেট হইতে সার্টিফিকেটখানা বাহির করিয়া মণ্টুর বাবার মুখের উপর মেলিয়া ধরিল)।

মণ্টুর বাবা। (বিস্ময়ে মুহ্যমান) তাই তো ! সত্যিই তো ! একটা কথাও মিথ্যে নয়—এই তো লেখাই রয়েছে এখানে—passed with distinction লেখাই রয়েছে বটে। এমন বস্তু ছারপোকা ! কে জানত !

মিহির। সব্বাই জানে ! বড়-বড় ডাক্তাররা পর্যন্ত ! কে না জানে ? যারাই বিলিতি কাগজ পড়ে তারাই জানে।

মণ্টুর বাবা। যাক, পয়সা খরচ করে তোমাকে আর ছারপোকা কিনতে হবে না। তোমার বিছানাতেই রয়েছে হাজার হাজার, লাখ লাখ—যত চাও ! তোমার ভয়ানক ঘুম বলে তাই জানতে পারো না।

মিহির। বলেন কী! এতক্ষণ তবে বলেন নি কেন আমায়? অনেকখানি ব্রেন করে ফেলতুম তাহলে! কিন্তু এবেলা—এবেলা যে আমার নেমন্তন্ন রয়েছে ভবানীপুরে! এখনই বেরুতে হবে যে! আচ্ছা থাক, সন্ধের মুখে ফিরে সব-আগে এগুলোর সদ্ব্যবহার করব, তারপর পড়াব মণ্টুকে। (মিহির বাহির হইয়া গেল। মিহির চলিয়া গেলে, পিতাপুত্র মুখ-চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিলেন)।

মণ্টুর বাবা। মণ্টু!

মণ্টু। কী বাবা?

মণ্টুর বাবা। ছারপোকার সঙ্গে যে ব্রেনের একটা সম্পর্ক আছে, খুব নিকট সম্পর্কই রয়েছে, অনেক দিন ধরেই কথাটা আমার মনে হয়েছে। ছারপোকার ব্রেনটাই একবার ভাব্ দেখি, সেটাই কিছু কম নাকি? ভাবলে অবাক হয়ে যাবি তুই।

মণ্টু। হ্যাঁ, বাবা।

মণ্টুর বাবা। ছাখ না, খুচ্ করে এসে তোকে কামড়েছে, তখুনি উঠে দেশলাই জেলে ছাখ্, আর তাকে দেখতে পাবি নে—কোথায় যে পালিয়েছে পাত্তা নেই আর। ধর, মানুষরা যে দেশলাই আবিষ্কার করেছে, এই বৈজ্ঞানিক খবর অবধি ওদের জানা। ভেবে ছাখ্ তো একবার।

মণ্টু। হ্যাঁ, বাবা।

মণ্টুর বাবা। এটা কি কম ব্রেন হল! তু-ই বল? আর এ ব্রেন তো ওদের রক্তেই—কেননা ওদের তো মাথা নেই—মাথা আর কট্টুকু?—ওদের গায়েই ব্রেন। হাড়ে হাড়ে, উঁহু—হাড়ও নেই ওদের—রক্তে রক্তে ওদের বুদ্ধি। ঠিক বলেছে মিহির। তুই কী বলিস মণ্টু?

মণ্টু। হ্যাঁ, বাবা।

মণ্টুর বাবা। তারপর ছারপোকার সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধও বড় কম নয়। ছারপোকা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিস্তার বাড়ে। ট্রামে বাসে সিনেমায় যেমন ছারপোকা বেড়েছে, তেমনি হু-হু করে খবরের কাগজের কাটতিও বেড়ে গেছে। যায়নি কি? এই আনন্দবাজারই ছাখ্ না। আজকের নীট বিক্রয়সংখ্যা এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি।

মণ্টু। হ্যাঁ, বাবা।

মণ্টুর বাবা। কেন, সেদিন দেখলি নে? বায়স্কোপে আমাদের চোখের সামনেই দশ আনার সীটে একটা কুলি বসেছিল তোর মনে নেই?

মণ্টু। হ্যাঁ বাবা!

মণ্টুর বাবা। সে তো লেখাপড়া কিছুই জানে না। দু'মিনিট না-বসতেই দশ পয়সা খরচ করে একখানা আনন্দবাজার কিনে বসল। দিব্যি বিস্তার করেই। এতে শিক্ষার বিস্তার হবে না কি? মণ্টু, তুই কী বলিস?

মণ্টু। হ্যাঁ, বাবা।

মণ্টুর বাবা। চল্ তবে এক কাজ করি গে। তোর মাস্টারমশাই ফেরবার আগে আমরাই ছারপোকাগুলোর সদ্ব্যবহার করে ফেলি গে। ব্রেন তো তোরও দরকার—আর আমারও। আমার মেমারিটাও দিনকতক থেকে যেন কমে আসছে। সেদিন শ্যামবাবুকে দেখে মনে হল গোবর্ধনবাবু আর গোবর্ধনবাবুকে দেখে মনে হল শ্যামবাবু। এ তো খুব ভাল কথা নয়, কী বলিস মণ্টু? শ্যামবাবুর কাছে আমি টাকা পাই, আর এদিকে গোবর্ধন-বাবু হল গে আমার পাওনাদার। কী ভয়ঙ্কর গোলমাল ভেবে ছাখ্।

মণ্টু। হ্যাঁ, বাবা।

পঞ্চম দৃশ্য

(মণ্টুর পড়বার ঘর। সেইদিনেরই সন্ধ্যা। দেয়াল-ঘড়িতে আটটা। মণ্টু একা-একা বসিয়া পড়াশোনা করিতেছে। মিহির প্রবেশ করিল)

মণ্টু। আপনার এত দেরি হল যে স্যার?

মিহির। বন্ধুর বাড়িতে আটকে গেছলাম। সমস্ত দুপুরটা ঘুমিয়ে—কী বলে গিয়ে, যা খাটনি হয়ে গেছে আজ—(জামা-কাপড় বদলাইল)

মণ্টু। সারা দুপুরটা ঘুমিয়েছেন বুঝি?

মিহির। না না, ঘুমুব কেন? কাল সমস্ত রাত অমন জেগে—ঘুমোবার পর আবার কারু ঘুম পায় নাকি? কী যে বল! বললুম না, ভারি খাটনি গেছে—বন্ধুর বাড়ি পেল্লায় এক ভোজ ছিল কিনা—(চেয়ারে গিয়া বসিল)

মণ্টু। ও, তাই বলুন!

মিহির। বিশ্রী একটা গন্ধ পাচ্ছি যেন! (মুখ বিকৃত করিয়া শুঁকিতে লাগিল) কোত্থেকে একটা কেমন যেন বীভৎস ভারি একটা দুর্গন্ধ আসছে না? মনে মনে হচ্ছে খুব কাছেই যেন পাচ্ছি গন্ধটা—অ্যাঁ! এই যে, তোমার কাছ থেকেই না? নতুন ধরনের এসেন্স-টেসেন্স মেখেছ নাকি কিছু? তোমার গা থেকেই আসছে যেন গন্ধটা!

মণ্টু। গা নয়, মাথা থেকে স্যার!

মিহির। কিসের গন্ধ ?

মণ্টু। ছারপোকার।

মিহির। ছারপোকার ? সেকি ?

মণ্টু। আপনি চলে যাবার পর বাবা আর আমি দু-জনে মিলে বেতন-নিবারকের সমস্ত ছারপোকা শেষ করেছি। মেরে মেরে শেষ করেছি, আমাদের মাথাতেই টিপে টিপে মেরেছি !

মিহির। বল কী ? অ্যাঁ ?

মণ্টু। হ্যাঁ স্যার ! ছোট্টুলালকেও বলেছিলাম, কিন্তু সে ব্যাটা মোটেই ব্রেন চায় না। বলে যে বরেন-সে হামার কী হোবে ? কিন্তু স্যার, আর একটাও ছারপোকা নেই আপনার বিছানায় ! হি হি হি—! (হাসিতে লাগিল)

মিহির। অ্যাঁ—? (সিংহনাদ করিয়া মিহির চেয়ার ছাড়িয়া এক লাফে বিছানায় গিয়া সটান হইল)

মণ্টু। অ্যাঁ ! (হতভম্ব হইয়া) এ কী হল ? (মিহিরের চিৎকারে মণ্টুর বাবা ছুটিয়া আসিলেন। ছোটুলালও)

মণ্টুর বাবা। কী হয়েছে রে মণ্টু, কী হল ?

মণ্টু। ছারপোকা নেই শুনেই মাস্টারমশাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

মণ্টুর বাবা। তা তুই বলতে গেলি কেন ? শোকের প্রথম ধাক্কায় ওরকম হয়। ওরকমটা হয়েই থাকে। বারণ করলুম না তোকে ? অতগুলো ছারপোকার মৃত্যুশোক—পুত্রশোকের চেয়ে কম কী ? কম কথা নয় তো !

মণ্টু। আমি কী করে জানব যে উনি অমন করবেন ?

ছোট্টুলাল। মুখে জল ছিট্‌টাইলে উন্‌কোর গেয়ান হোতে পারে আভি—এখনোই গেয়ান হোয়ে যাবে।

মণ্টু। জল ছিটোব বাবা ? আনব এক বালতি জল ?

মিহির। (অজ্ঞান অবস্থাতেই) উঁহু।

মণ্টুর বাবা। কাজ নেই বাপু। জ্ঞান হলে যদি কামড়ে দ্যায় রাগের মাথায় ? প্রথম শোকের ধাক্কাটা কেটে যাক আগে। এক-আধদিন অজ্ঞান হয়ে থাকলেই কেটে যাবে ওটা। সময়ই হচ্ছে শোকের একমাত্র ওষুধ। কথায় বলে—'টাইম ইজ দি বেস্ট হীলার'—শুনিস নি মণ্টু ?

মণ্টু। হ্যাঁ, বাবা।

যবনিকা

issuing authorities have the power to modify, change these or make, what is dubiously termed as 'deal' 'adjustment','mutual understanding,'etc.

While for effective functioning of an institution like the SCERT strictness or regidity of rules and procedures in certain in alters are least desirable, and some relaxation can be made or sought in consideration of personal limitations or predicaments. But these are and can only be accommodated by the contolling authority if these are placed in the right spirit and proper manner. Taking things, even those going by convention of years as granted and demanding these as accrued 'rights' creates a make-believe situation like that happened on several occasions in the past and on yesterday morning. It is a fundamental lesson of ethics that one who insists on strictly following laid down rules or procedures should also follow all other rules strictly. Those desirous of establishing rights should also fulfil their obligations. What goes on in the neighbouring offices or the epicentre of state administration has little relevance to the SCERT. Posts being interchangable with identical service conditions one has the right to choose.

tennure(to me it seems so)
I have, during the long ... keep it functional inspite of ... interference


শিবরাম চক্রবর্তী
১৬.৪.৭৮